৯ মে ১৯৯২ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

আনন্দলোক



১৮ বৈশাখ ১৩২৮
১০ বৈশাখ ১৩৯৯



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - ঋদ্ধি গোস্বামী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com


Spark through him tonight !
CHANDRA & SONS
PRIVATE LIMITED (Jewellers)
116/1,117, B. B. Ganguly Street Calcutta-700012 Phone–27-4494
Where 150 'Years' Tradion is a Treasure
PRASA/91



এ বা রে

আনন্দলোক

বর্ষ ১৮ ❑ সংখ্যা ৯ ❑ ৯ মে ১৯৯২



নিমাই ঘোষ

সত্যজিৎ রায় নেই। এই শোক শুধু কলকাতার নয়, এই শোক সারা বিশ্বের। বঙ্গ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের একজন চিরতরে আমাদের ছেড়ে গেলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত এই সংখ্যায় রয়েছে তাঁর অনন্য প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক লেখা। নানা রচনায় রচিত এই মালাটি তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রচ্ছদ : শম্ভু সাহা
রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

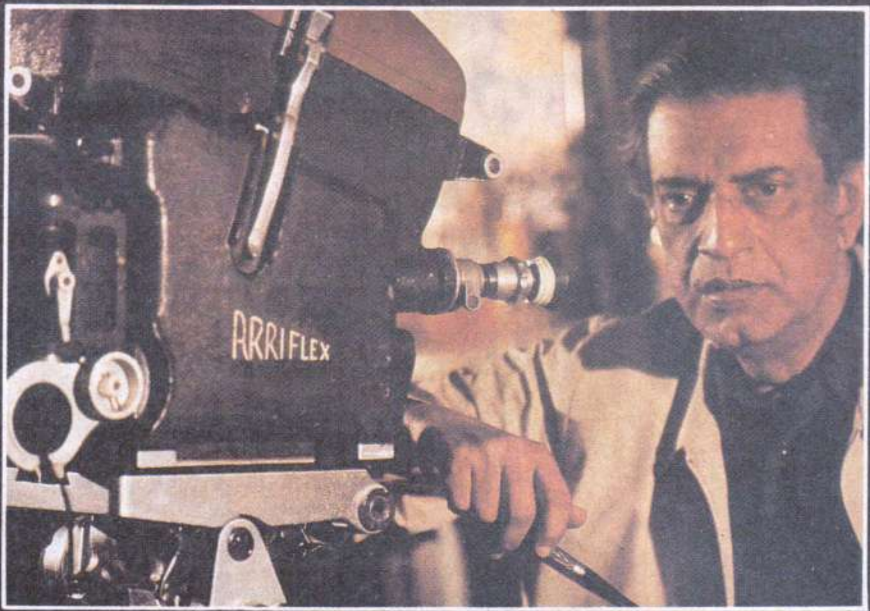
সম্পাদক
দুলেন্দ্র ভৌমিক

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক
৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দশ টাকা

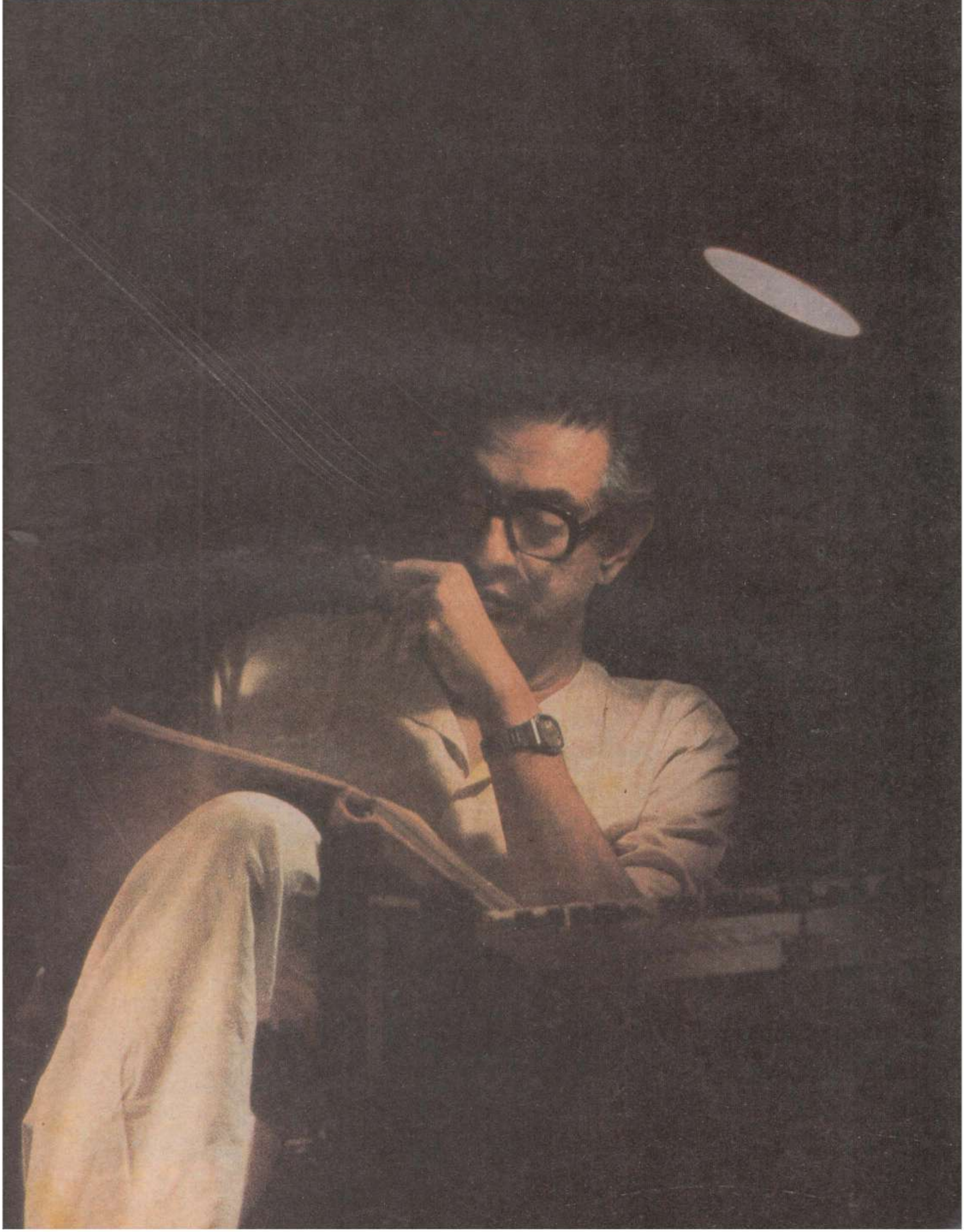
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা, উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা





সত্যজিৎ স্মরণ

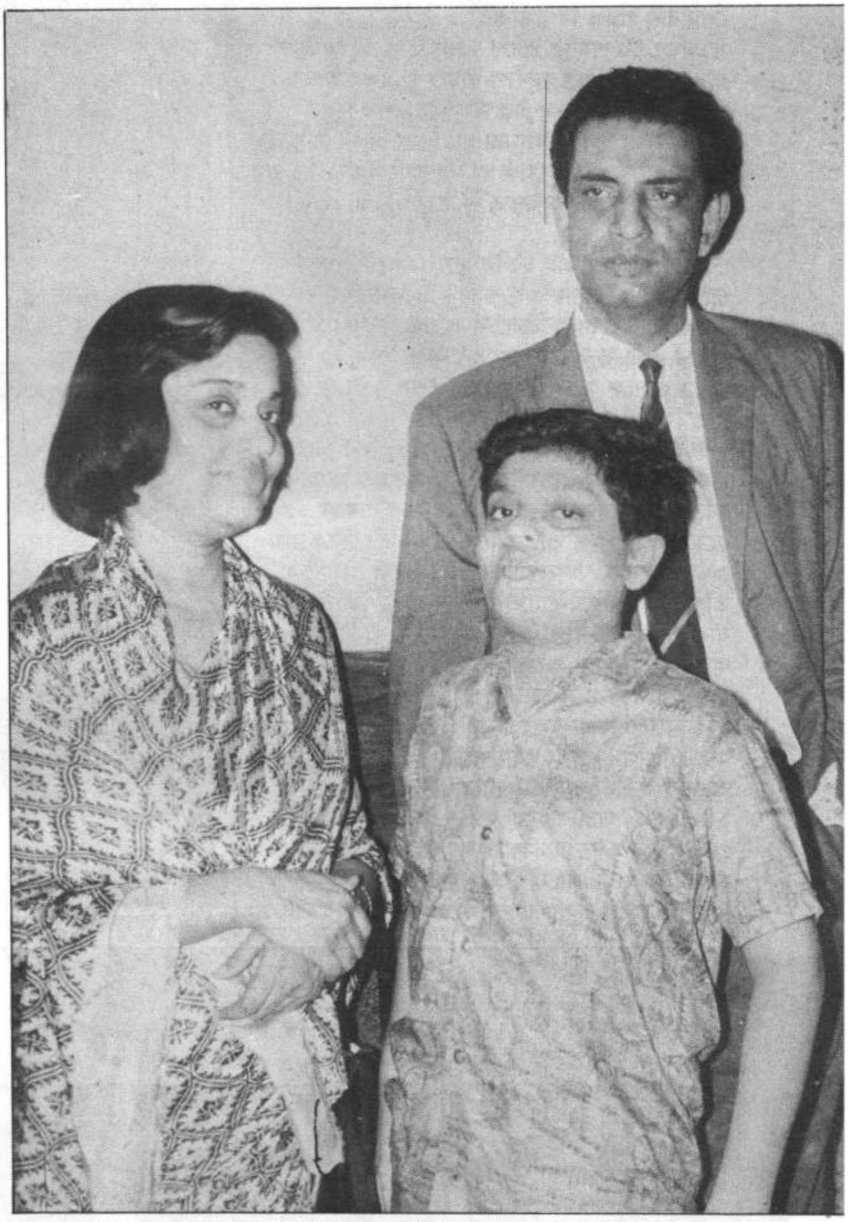
১৯৯২ এর ২৩ এপ্রিল সত্যজিৎ রায় চলে গেলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার পর তাঁর জীবনাবসান ঘটল কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিকে। বর্তমান প্রজন্মে তিনিই সম্ভবত একমাত্র বিরল প্রতিভাধর মানুষ। যাঁর প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে আমাদের চলচ্চিত্র, সাহিত্য এবং বঙ্গ সংস্কৃতির নানা দিক। আলোকিত হয়েছে আমাদের মন ও মনন। সেই মহান স্রষ্টার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদিত হল। এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটিও নিবেদিত হল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে।




এ হোলো আপনার ত্বক যা আপনি দেখছেন
সেই একই ত্বক যা ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার দেখছে
সত্যি বলতে কি ত্বকের লোমকূপের গভীরে ঢুকে থাকা ময়লা বা বাসি মেকআপ সাবান আর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়না. উল্টে সাবান আপনার ত্বকের দরকারি তেল ধুয়ে ফেলে আপনার ত্বককে শুকনো ও খসখসে করে তোলে।
আসলে আপনার দরকার ল্যাকমের তৈরী ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার্স। এগুলি মৃদু অথচ নিশ্চিতরূপে, আপনার ত্বকের লোমকূপের গভীরে ঢুকে থাকা ময়লা আর মেকআপ বের করে দিতে পারে, যে গভীরতায় সাবান কখনও পৌঁছাতে পারেনা।
ম্যাক্সিমাম ডীপ পোর ক্লেনজীং মিল্ক সাধারণ বা শুষ্ক ত্বকের পক্ষে আদর্শ ক্লেনজার। শুধু পরিষ্কার করাই নয়, এটি আপনার ত্বককে পুষ্টিও জোগায়, যাতে আপনার ত্বক হয়ে ওঠে পরিষ্কার, মোলায়েম ও উজ্জ্বল।
ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার ফর অয়েলী স্কিন, তৈলাক্ত ত্বকের অতিরিক্ত তেল আর মৃত কোষের আবরণকেও সরিয়ে দেয়। এর মৃদু, অ্যালকোহল-মুক্ত ফর্মুলা আপনার ত্বককে করে তোলে নির্মল ও ঝরঝরে তরতাজা।
ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার্স
MAXIMUM
CLEANSERS
MAXIMUM CLEANSER FOR OILY SKIN
Lakmé
MAXIMUM DEEP PORE CLEANSING MILK
Lakmé

বৈশাখের কাছে আমাদের ঋণ বড় কম নয়। ঝড়-জলের মাস হিসাবে বিখ্যাত হলেও এই বৈশাখেই জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে নিয়ে আজও আমাদের গগনস্পর্শী অহঙ্কার। আবার এই বৈশাখেই আমরা পেয়েছিলাম আরও একজনকে, স্বাধীনতা-উত্তর এই দেশের মানুষ যাঁকে নিয়ে বার বার আত্মগর্বী হতে পেরেছে এবং আমাদের সীমাবদ্ধ জীবন আর নানা সমস্যা সংকটে আশ্লিষ্ট থেকেও যিনি নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছিলেন বিশ্বমানে তিনি সত্যজিৎ রায়। বৈশাখ যাঁকে বাঙালি জীবন, সমাজ আর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল হিসাবে সাত দশক আগে উপহার দিয়েছিল, সাত দশক পরে সেই বৈশাখেই তিনি চলে গেলেন। ১৩৯৯ এর বৈশাখ তাই বড় বেদনার। এই বৈশাখ যেন আড়াই মাস টানাপোড়েনের পর হঠাৎ এক সায়াহ্নে আমাদের এক মুহূর্তে রিক্ত করে দিল। যে আলোকবর্তিকা ছিল আমাদের আশা এবং আশ্বাস, আমাদের গর্ব আর গৌরব, আমাদের যাবতীয় সৃষ্টিশীল কর্মের নিরন্তর প্রেরণা সেই আলো চিরতরে নির্বাপিত হল দশ বৈশাখ ১৩৯৯, ইংরাজি মতে ২৩ এপ্রিল ১৯৯২।

সত্যজিৎ রায় তাঁর শরীরের রুটিন চেক আপের জন্য বেলভিউতে ভর্তি হন ২৭ জানুয়ারী সোমবার। ভেবেছিলেন দু'দিন পরেই ফিরে আসতে পারবেন নিজের বাড়িতে। এসেই শুরু করবেন নতুন ছবির কাজ। যে ছবির চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শুটিঙের জন্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোরও ভাড়া করা ছিল। কিন্তু ফেরা হল না। শরীরে রোগের প্রকোপ বেড়েই চলতে লাগল। তাঁর চিকিৎসকরা দিবারাত্র চেষ্টা চালিয়েও শেষ পর্যন্ত হার মানলেন মৃত্যুর কাছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকেই তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। সেই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছিল মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। কখনও-কখনও সামান্য ভাল হয়েছেন আবার একদিন পরেই শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। বিদেশী চিকিৎসকদের পরামর্শ, বিদেশ থেকে ওষুধ আনানো কোন চেষ্টারই কণামাত্র ত্রুটি ঘটেনি। অমোঘ নিয়তি যেন মৃত্যুর রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়াল। নার্সিং হোমের আটতলার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সত্যজিতের শয্যার চারপাশে যে মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে অদৃশ্যে ঘুরছিল তাকে শেষপর্যন্ত আটকানো গেল না। ২৩ এপ্রিলের কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলা। রৌদ্রের খরতাপ অনেকটা স্তিমিত। ওইদিন বেলা ১২টা থেকেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। কোন ওষুধই তাঁর শরীর গ্রহণ করছে না। নার্সিং হোমের বাইরের প্রকৃতিতে যখন বৈশাখী হাওয়ার মাতামাতি, মেঘলা আকাশ থেকে যখন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দিনের নিস্তেজ আলো ঠিক তখনই, পাঁচটা বত্রিশ মিনিটে তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসকের দল শেষ চেষ্টা করবার জন্যে মরীয়া হয়ে ওঠেন। শুরু হয় 'হার্ট



• ১৯৬৩ সাল, সত্যজিৎ রায় বার্লিনের পথে। সঙ্গে স্ত্রী বিজয়া রায় এবং পুত্র সন্দীপ রায়

ম্যাসাজ।' এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট— ম্যাসাজ চলতে থাকে। সত্যজিৎ রায়কে ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসকরা তখনও ম্যাসাজ করে যাচ্ছেন যদি আবার কোনমতে থেমে যাওয়া হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনা যায়। ঠাণ্ডা ঘরেও ঘেমে উঠেছেন ডাক্তাররা। কিন্তু শত চেষ্টাতেও হৃদস্পন্দন ফিরে এল না, ফিরলেন না সত্যজিৎ রায়। মৃত্যু নামক যে অদৃশ্য নিয়তিকে এতদিন কাচের দরজার বাইরে আটকে রাখা গিয়েছিল এই বার সে ঢুকে পড়েছে ঘরে, গ্রাস করেছে বাঙালির শেষ সম্বল সত্যজিৎ রায়কে, নিঃস্ব করে দিয়েছে আমাদের অহঙ্কারকে। আমরা রিক্ত হলাম পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। তখনই ঘোষিত হল তাঁর মৃত্যু সংবাদ। যে সংবাদ আমরা শুনতে চাইনি।

মৃত্যু নামক যে অদৃশ্য নিয়তিকে এতদিন কাচের দরজার বাইরে আটকে রাখা গিয়েছিল এইবার সে ঢুকে পড়েছে ঘরে, গ্রাস করেছে বাঙালির শেষ সম্বল সত্যজিৎ রায়কে।

রঙিন ছবিগুলি তুলেছেন—নিমাই ঘোষ

শোনবার পরও বিশ্বাস করতে চাইনি। সত্যজিতের শয্যার পাশে তখন তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায়, একমাত্র পুত্র সন্দীপ এবং পুত্রবধূ ললিতা। ৮৮ দিনের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই জয়ী হল। আমরা হারালাম এমন এক রত্ন যা শতাব্দীব্যাপী অপেক্ষার পর পেতে হয়, যে রত্ন গোটা জাতিকেই অলঙ্কৃত করে, গৌরবান্বিত করে।

কেমন কেটেছে এই ৮৮টা দিন? বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলায় এই ক'দিন উদ্বেগ যেন জমাট বেঁধে ছিল। রাত তিনটের আগে কেউ ঘুমোতে যাবার কথা ভাবতে পারতেন না। কেন না, নার্সিং হোমের সঙ্গে প্রতিদিন রাতেই শেষ কথা হতো রাত তিনটে নাগাদ। আবার সকাল ছ'টা থেকে শুরু হতো যাতায়াত। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই সত্যজিৎ রায় 'কোমায়' আচ্ছন্ন ছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তার আগে, যখন সত্যজিৎ রায় কথা বলতেন, তখন বাড়ির লোকদের বলতেন, তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে। দিনের অধিকাংশ সময় যাঁর কাটে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে সেই মানুষ কতদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন? তিনি বোধহয় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। নতুন ছবি নিয়েও কথা বলতেন। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করার তাগিদ নার্সিং হোমের শয্যাতে শুয়েও তিনি অনুভব করছিলেন তীব্রভাবে।

১৯৮৪তে 'ঘরে বাইরে' ছবির কাজ শেষ করার পরই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বাইপাস সার্জারীর জন্য আমেরিকার হিউস্টনে যান। বাইপাস করে কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁকে



• ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়ি, সেই ঘর। সবকিছুই রয়েছে, নেই শুধু একজন।

আমার আর কিছুই রইল না : বিজয়া রায়



• সত্যজিৎ রায় বিজয়া রায়

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরই নার্সিং হোম থেকে বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে ফিরে আসেন বিজয়া রায়। সঙ্গে ছিলেন পুত্রবধূ ললিতা এবং রুমা গুহঠাকুরতা। বুধবার অর্থাৎ ২২ এপ্রিল পর্যন্ত খবর ছিল সত্যজিৎবাবুর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। আচ্ছন্নভাব কেটে গিয়ে জ্ঞানও ফিরে আসছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুরে খবর আসে, অবস্থা খুব খারাপ।

খবর পেয়েই বাড়ির সবাই চলে যান নার্সিং হোমে। ফিরে আসেন স্বামীর মৃত্যুর পর। কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না। বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি সত্যজিৎবাবুর বসবার ঘরের দিকে তাকান। তিনি সেই বিহ্বল অবস্থায় বার বার বলতে থাকেন 'বড় একলা হয়ে গেলাম। খোকনের (সন্দীপের ডাকনাম) অনেক কিছু আছে। আমার আর কিছুই রইল না।' কথা বলতে বলতেই ভেঙে পড়েন। কিছুটা অসুস্থও হয়ে পড়েন এক সময়। চিকিৎসকরা এসে তাঁকে দেখে যান।



বাড়ির লোকদের বলতেন, তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে। দিনের অধিকাংশ সময় যাঁর কাটে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে সেই মানুষ কতদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন ? তিনি বোধহয় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। নার্সিংহোমের শয্যাতে শুয়েও তিনি অনুভব করছিলেন তীব্রভাবে।

দেখেছিলাম তাঁর বসবার ঘরে। খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তিন বছর পর '৮৮তে 'গণশত্রু' শুরু করলেন। তারপর 'শাখা প্রশাখা' এবং 'আগন্তুক।' পরের ছবির জন্যই প্রস্তুত হয়েছিলেন। গত ডিসেম্বরে ঘোষিত হয় বিশেষ অস্কার দেওয়ার কথা। এক সন্ধ্যায় দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। হাতে ছিল ফুলের তোড়া আর নলেন গুড়ের নরম পাকের সন্দেশ। যা খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

আমি প্রণাম করার পর বললেন, 'বসো। কেমন আছো ?'
আমি বললাম, ভাল। আপনার শরীর...
কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, ভাল। বেশ ভাল আছি। কাজের মধ্যে থাকলে ভালই থাকি। আগন্তুকের পর আরও একটা ছবি করছি।
প্রশ্ন করলাম, আপনার গল্প ?
উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই বলে গল্পটা শুনতে চেও না। তোমাকে বললেই তুমি তোমাদের আনন্দলোকে লিখে দেবে।' অস্কার প্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন, ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে এটা খুবই বড় সম্মান। খুশি, আমি খুবই খুশি।'
সেদিন জেনেছিলাম, তিনি যাবেন লস

• 'শাখা প্রশাখা' ছবির শুটিঙের অবসরে সত্যজিৎ রায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন ডাঃ কে বি বক্সি



তারাপদ ব্যানার্জি

বিদ্যাসাগর যেমন 'বর্ণ পরিচয়' লিখে এই অন্ধকার-অশিক্ষার দেশে সাক্ষরতার প্রথম সোপান তৈরি করেছিলেন, সত্যজিৎ রায়ও তেমনি 'পথের পাঁচালি' তৈরি করে বাংলা চলচ্চিত্রে বর্ণ পরিচয় সৃষ্টি করলেন ।



• 'পথের পাঁচালী' ছবির জন্য সংবর্ধনা জানান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় । সত্যজিৎ রায় এবং তাঁর ইউনিটের কলাকুশলী ও শিল্পীরা

• 'নায়ক' ছবির শুটিঙে দৃশ্যগ্রহণের আগে শট বুঝিয়ে দিচ্ছেন উত্তমকুমারকে পরিচালক সত্যজিৎ রায়



মোনা চৌধুরী



উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে

● আই অ্যাম ও কে— হিউস্টন থেকে বাইপাস সার্জারি করে ফিরে এই কথাটি বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়



ভাষা নেই : সুচিত্রা সেন

২৩ এপ্রিল, ১৯৯২। 'অপরাজিত' সত্যজিৎ রায় মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের মর্মান্তিক বার্তা সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু নির্জন "দ্বীপের" অধিবাসিনী সুচিত্রা সেনের কানে খবর পৌঁছয়নি।

ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় টেলিফোন করলাম। অনেকক্ষণ বেজে গেল। টেলিফোন ধরবেন না বলেই হয়ত ঠিক করেছিলেন। অবশেষে ধরলেন। গলার স্বর পরিবর্তন করেও ধরা পড়ে গেলেন।

কোন সুযোগ না দিয়েই একদমে বললাম, রমা, সত্যজিৎবাবু মারা গেছেন।

টেলিফোনে একটি শব্দ ভেসে এল, এ্যাঁ। ওহ্ গড।

এবার তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণতর হল। অনেক দূর থেকে শোনা গেল মাত্র গোটা চারেক কথা।" অ্যা গ্রেট ফিল্ম মেকার ইজ নো মোর।

: তোমার কিছু বলা উচিত।

টেলিফোন হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কোন এক সময়ের গ্ল্যামার হিরোইন সুচিত্রা সেন।

: কিছুই কি বলবে না ?

আবার টেলিফোনের তার বেয়ে ক্ষীণ কণ্ঠের কয়েকটি শব্দ ভেসে এল। "এই শোক ভাষায় প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই।"

ভেসে এল আরও কয়েকটি অবোধ্য শব্দ। সুচিত্রা সেন কি কাঁদছিলেন ?

এঞ্জেলেসের অস্কার অনুষ্ঠানে। কিন্তু শরীর তাঁকে যেতে দিল না। অস্কার কমিটির লোকেরাই ছুটে এলেন কলকাতায়। হাতে তুলে দিলেন বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতের সেরা সম্মান বিশেষ অস্কার। ১৯৫৫-তে 'পথের পাঁচালি' তৈরি করার পর থেকে সত্যজিৎ রায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বার্থেই প্রতিভাবান। ছবি করা, ছবি আঁকা, গল্প লেখা, গান লেখা এবং সুর করা, বর্ণমালা সৃষ্টি করা এর যে কোনও একটা নিয়ে থাকলেও উনি নিজেকে বিশ্বমানে নিয়ে যেতে পারতেন। বিদ্যাসাগর যেমন 'বর্ণ পরিচয়' লিখে এই অন্ধকার-অশিক্ষার দেশে সাক্ষরতার প্রথম সোপান তৈরি করেছিলেন, সত্যজিৎ রায়ও তেমনি 'পথের পাঁচালি' তৈরি করে বাংলা চলচ্চিত্রে বর্ণ পরিচয় সৃষ্টি করলেন। শুরু হল ফিল্মকে বোঝা, তাকে নিয়ে ভাবনার কাজ। চলচ্চিত্র নিছক সোয়া দু' ঘণ্টার তাৎক্ষণিক বিনোদনকে ছাপিয়ে উঠে এল জীবনের কাছে। চলচ্চিত্রে মূর্ত হল জীবন আর জীবনের জটিলতা, ব্যাখ্যা, তার রহস্যময়তা, তার নিবিড় নির্যাস এবং মূর্চ্ছনা।



'কাপুরুষ' ছবির সেটে মাধবী মুখোপাধ্যায়-কে শুটিঙের অবসরে পেশেন্স খেলা শেখাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়

• নন্দন চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন সত্যজিৎ রায়। বাঁ-পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী প্রভাস ফদিকার



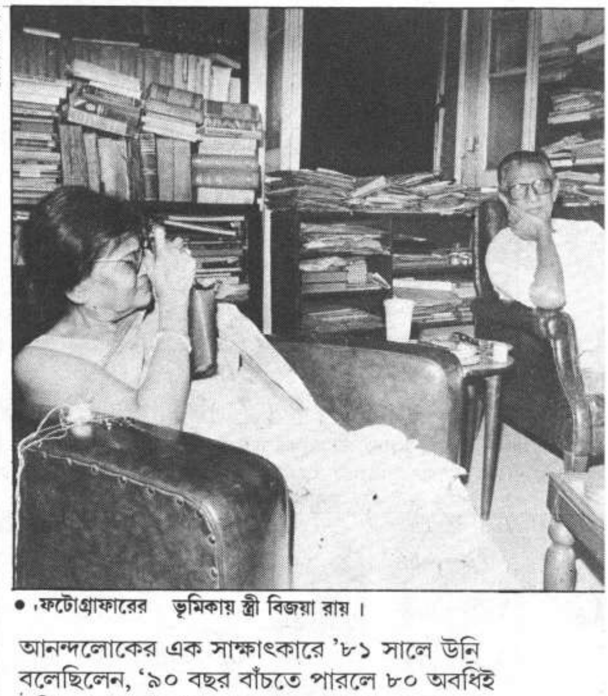


• পাতাল রেলে সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের পিসিমা স্বনামধন্যা লেখিকা লীলা মজুমদার স্মৃতিচারণ করতে করতে বলেছেন, 'মানিক লেখাপড়ায় খুব ভাল না হলেও ভাল ছিল। মানিক বলত, সবাইকেই যে ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে হবে তার কোনও মানে নেই।'

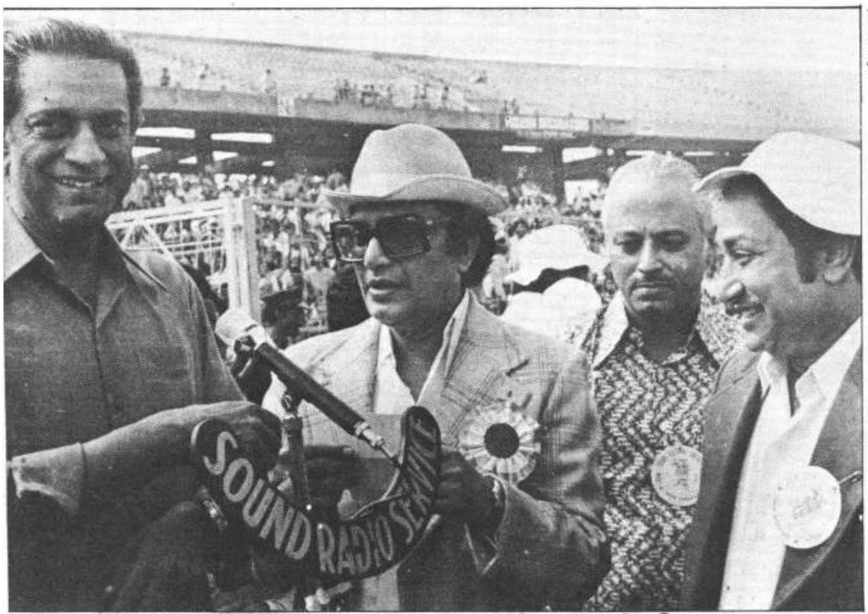
যিনি সৃষ্টিশীল কর্মের জগতে সর্বদাই প্রথম, অগ্রগণ্য এবং পথ প্রদর্শক, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় প্রথম হওয়া তো তাঁর কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। যে অসামান্য প্রতিভা নিয়ে তিনি এসেছিলেন সেটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই বিস্ময়কর ছিল তাঁর জানবার আগ্রহ, নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা, যে কাজে তিনি নিয়োজিত হবেন তার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ আর ধৈর্য। সত্যজিৎ সম্পর্কে তাই আজ আর কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয়। শব্দের সমস্ত ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও তাঁকে যথার্থ বোঝবার মতো কোনও একটি শব্দ পাওয়া কঠিন হবে। এই প্রসঙ্গেই তাঁর 'হীরক রাজার দেশে' নয়, 'তৈরি গুগাবাবা' ছবির একটি সংলাপ মনে পড়ে। বাঘা বর পাওয়ার পর বাসস্থানের সমস্যায় বিচলিত হয়ে ক্ষোভে বলেছিল, 'আমার আগেই মনে হয়েছিল তিনটি বরই যথেষ্ট নয়।'

আমাদের ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের জন্য একাত্তর বছরের পরমায়ু যথেষ্ট নয়।



• ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় স্ত্রী বিজয়া রায়।

আনন্দলোকের এক সাক্ষাৎকারে '৮১ সালে উনি বলেছিলেন, '৯০ বছর বাঁচতে পারলে ৮০ অবধিই ছবি করতে চাই।' আমাদের আক্ষেপ এখন অন্ধ আক্রোশে পরিণত হয়। আমরা বুঝতে পারি, আরও আট বছরে অন্তত ছ'টি ছবি আমরা পেতাম। শুধু কি ছবি ? আরও কত কিছু। এমন এক মহাপ্রাণ প্রয়াত হলে শোক কোনও সান্ত্বনা মানে না। তাই নার্সিংহোমে এবং বিশপ লেফ্রয় রোডে, নন্দনে আর কেওড়াতলায়



• খেলার মাঠে সত্যজিৎ রায় ও উত্তমকুমার, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শিবাজী গণেশন



• ২৫ জুলাই, ১৯৮০ উত্তমকুমারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সত্যজিৎ রায়, ডান পাশে অপর্ণা সেন

• টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে 'ওগো বধূ সুন্দরী'-র সেটে উত্তমকুমারের স্মরণ সভায় সত্যজিৎ রায়। বাঁ-পাশে কানন দেবী এবং ডান দিকে সুশীল মজুমদার



লক্ষ-লক্ষ মানুষের চোখে জল, হৃদয়ে নীরব কান্না। শোকযাত্রার সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে চলেন অগণিত মানুষের সঙ্গে অনেক বিখ্যাত মানুষও। ২৩ এপ্রিল রাতে বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িটি যেন একটা জমাট কান্নার মতো থমকে থাকে। স্তব্ধতাও যে কত করুণ সেটা ও বাড়িতে পা দিয়েই বোঝা যায়। গোটা কলকাতাই তখন শোকে মূহ্যমান। বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে তাঁর ইউনিটের সামান্যতম মানুষটিও সেদিন শোকে বিমূঢ় হয়ে গেছেন। তাঁর কাজের ঘরটি শূন্য। ঘরময় ছড়ানো কাগজপত্র, আলমারি ঠাসা বই, তাঁর প্রিয় চেয়ার আর টেবিল। ঘরটি বন্ধ। সত্যজিৎ রায় শুয়ে আছেন তাঁর শোবার ঘরে। চোখের পাতা বোজা। রোগ তাঁর শরীরকে অনেকখানি শীর্ণ করে দিয়েছে। ওই মুখের দিকে তাকানো যায় না। বুকের মধ্যে থামিয়ে রাখা কান্না হঠাৎ করে উঠে আসে কণ্ঠনালীতে। যুদ্ধে হেরে গেলে পরাজিত যোদ্ধারা ঘন বিষাদে যেমন করে মাথা নুইয়ে বসে থাকেন তেমন করেই সেদিন সন্দীপের বসবার ঘরে বসেছিলেন অনেকে। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কোনও না কোনও সূত্রে রায়বাড়ির ঘনিষ্ঠ।

অনেক রাত্রে ফিরে আসবার সময় দেখি মধ্য রাতের নিঝুম কলকাতা এবং বি. টি. রোডের ধারে দেওয়াল লিখন চলছে, 'সত্যজিৎ রায় অমর রহে'। 'সত্যজিৎ রায় লহ প্রণাম'। এক জায়গায় গাড়ি থেকে নামি। সবাই জানতে চায়, নন্দনে 'সত্যজিৎবাবুকে কখন আনা হবে ?' শিয়ালদা এবং হাওড়ায় যে লোকাল ট্রেনগুলো সকালে এসে পৌঁছয় ২৪ এপ্রিল সেই সব ট্রেনযাত্রীদের অধিকাংশেরই গন্তব্যস্থল ছিল নন্দন। নন্দনে অথবা বিশপ লেফ্রয় রোডে আসার জন্য ভোর রাত থেকেই শোকার্ত মানুষরা জমা হয়েছিল স্টেশনে।

রাত বারোটা নাগাদ সব কাজ শেষ করে সন্দীপ, ললিতা আর অন্যান্যরা বাড়ি ফিরে এল। সত্যজিৎ রায় তখন চিরতরে চলে গেছেন আমাদের চোখের আড়ালে। এখন তাঁকে দেখব মনের চোখ দিয়ে। বিশাল শূন্যতা তার দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে মহানগরীর বুকে।

সত্যজিৎ রায় যেদিন জন্মেছিলেন সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষ। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে জন্মেও তিনি আমাদের এবং তাঁর দেশকে পূর্ণিমার পূর্ণতায় নিয়ে গিয়েছিলেন—যেন অফুরন্ত আলোর এক উদ্ভাসে উদ্ভাসিত করেছিলেন। যেদিন আমাদের সত্যি ছেড়ে গেলেন, সেদিনও কৃষ্ণপক্ষ। সত্যিই, বড় মর্মঘাতী এই কৃষ্ণপক্ষ, আলো নির্বাপিত হওয়ার অন্ধকার বড় গাঢ় হয়। ২৩ এপ্রিলের কৃষ্ণপক্ষ তাই বুঝি এত গাঢ়, এত গভীর। মহীরুহ পতনের পর অরণ্যের মধ্যে যে হঠাৎ শূন্যতা জাগে এখন সেই শূন্যতায় আক্রান্ত এবং আচ্ছন্ন তামাম বাঙালি হৃদয়।

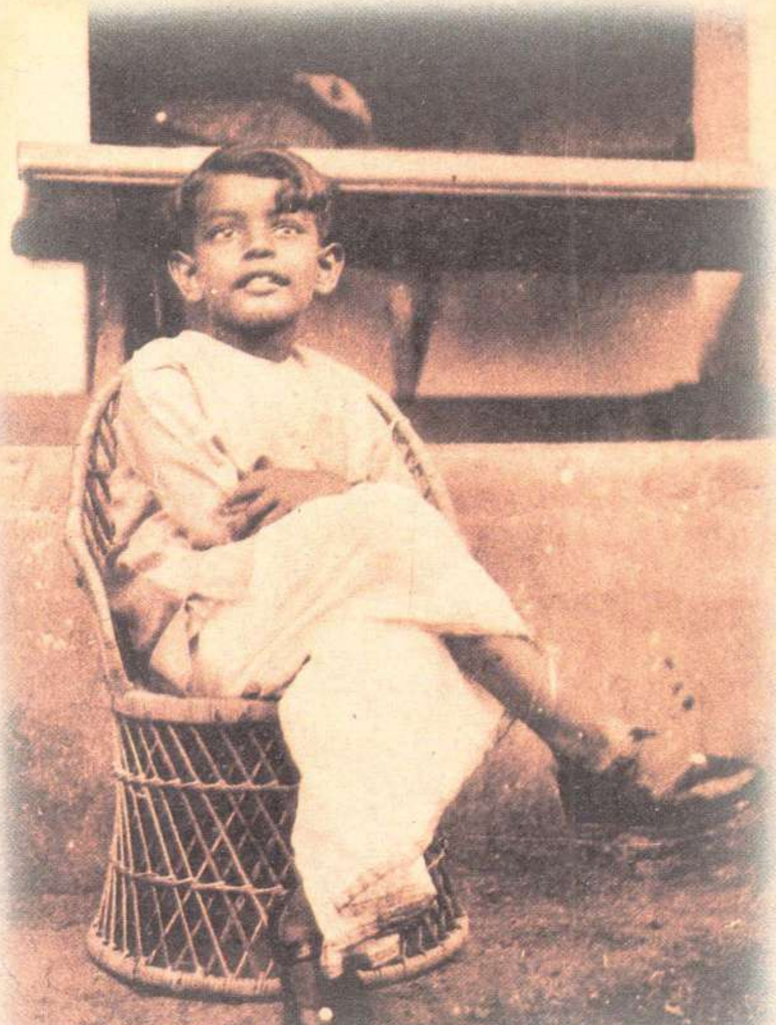
দুলেন্দ্র ভৌমিক



গড়পার থেকে শান্তিনিকেতন



সত্যজিৎ রায় জন্মেছিলেন কলকাতার গড়পারে। সেখান থেকে বকুলবাগান তারপর কলেজের পড়া শেষ করে যেতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। কেমন ছিল ছেলেবেলার সেই দিনগুলি? কেমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি? **পার্থ বসু** লিখছেন সেই দিনগুলির কথা।



• বয়স যখন চার

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ময়মনসিংহ থেকে পড়তে এসেছিলেন কলকাতায়। ময়মনসিংহেরই আরেক ছাত্র, বন্ধু গগনচন্দ্র হোমের উৎসাহে উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। পরিবার ও সমাজচ্যুত উপেন্দ্রকিশোর এককভাবে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত আর সমাজসংস্কারের চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু এঁদের উদ্যোগে শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুল' প্রকাশিত হত ; সেখানে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর ছেলে সুকুমারেরও বালকবয়সের প্রথম রচনা 'মুকুল' পত্রে মুদ্রিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর নিজে তারপর প্রকাশ করেন 'সন্দেশ' পত্রিকা ; রঙিন প্রচ্ছদচিত্র এবং সুছাঁদ-মুদ্রণবিন্যাসে, 'সন্দেশ' সেকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'সন্দেশ' পত্রের প্রেসও ছিল উপেন্দ্রকিশোরের স্বগৃহে, সুকিয়া স্ট্রিটে।

'সন্দেশ' পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারও এদিকে বড় হয়ে উঠল। গড়পার রোডে বাড়ি করে উপেন্দ্রকিশোর সেখানে সপরিবারে উঠে গেলেন। সেটি সম্ভবত ১৯১৫ সাল। সে বাড়ির সামনের দিকে 'প্রেস'। পিছনে বসতবাড়ী তিনতলা এই বাড়িতেই সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। ২ মে ১৯২১। বাবা সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা রায়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই বাড়িতেই সত্যজিতের ছোটবেলা কেটেছে। তিনতলার ছাদে খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর তখন প্রয়াত ; তিনতলায় তাঁর ঘরে গিয়ে পেয়েছেন একটা রঙের বাক্স—তাতে ছিল তুলি আর লিনসিড অয়েলের শিশি। পিতামহের এই সম্পদ শিশুটির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি, মনে হয়, প্রচ্ছন্নভাবে তাঁকে গড়ে তুলেছিল।

আড়াই বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হল। বাবার সম্বন্ধে সত্যজিতের স্মৃতি অবশ্যই অস্পষ্ট ; কিন্তু যৌথ পরিবারে মানুষ হয়েছেন বলেই সেই বালকের কোনও অভাববোধ দেখা দেয়নি। গড়পারের বাড়িতে তখন থাকতেন মেজোকাকা সুবিনয় রায় তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা এবং তাঁদের ছেলে, সত্যজিতের একমাত্র দাদা সরলকুমার, ছোটকাকা সুবিমল রায়। তিনি সিটি স্কুলের শিক্ষক। অবিবাহিত। এবং ছিলেন ঠাকুমা বিধুমুখী দেবী, উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী। ছিলেন আর এক দাদু, কুলদারঞ্জন রায় ; তাঁর ঘরে দেখা যেত ছবি এনলার্জ করার অপূর্ব পদ্ধতি, সেখানে পিতৃহীন বালক শুনত পুরাণের গল্প। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই 'ধনদাদু'র মৃতজনের লুপ্তপ্রায় পোর্টেট থেকে আশ্চর্যভাবে মুখাবয়ব উদ্ধার করে তাকে জীবন্ত করে তোলার কাজটি ছোট বালকটিকে বড় মুগ্ধ করত।

প্রেসে তারপিন তেলের গন্ধে ভরে থাকত বাড়ির আবহ আর ছোট ছেলেটি সারাদিন ঘুরে দেখত ব্লক মেকিং ডিপার্টমেন্ট, প্রোসেস ক্যামেরা, সারবাঁধা কম্পোজিটরের সামনে টেবিলে হরফের চৌকো বাক্স। কুলদারঞ্জন রায়ের বড় মেয়ে বুলুপিসি বা মাধুরী দেবীর কাছে সত্যজিৎ প্রথম পড়া শুরু করেন ; ইংরেজি বইটার নাম মনে ছিল তাঁর, 'স্টেপ বাই স্টেপ'।

মাধুরী রায়ের বিবাহ হল বুলা মহলানবীশের সঙ্গে। বুলা বা প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ ছিলেন পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই বালক সত্যজিৎকে প্রথম গ্রামোফোন দিয়েছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পর। 'সেই থেকে আমার গ্রামোফোন আর রেকর্ডের শখ।' আবার 'কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে বুলাকাকাই আমাকে জন্মদিনে একটা রেডিও উপহার দিয়েছিলেন। ...তাকে বলত ক্রিস্টাল সেট। কানে হেড ফোন লাগিয়ে শুনতে হত।' ছোটবেলায় এই গড়পারের বাড়িতেই একটা বিশ দশকের রেকর্ড ছিল। আশৈশব সেই রেকর্ড তাঁর সঙ্গী ছিল। বারবার শুনতে শুনতে সেই রেকর্ডটি সম্পূর্ণ স্মৃতিতে ধরা ছিল। প্রৌঢ় বয়সেও সেই সুরটি বাজাতেন বা আবৃত্তি করে যেতে পারতেন। বেঠোফেনের ভায়োলিন কনচার্টোর একটা মুভমেন্ট। তাছাড়া মা দিয়েছিলেন চার



• মায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ। ক্যামেরার শাটারে সুতো বেঁধে সত্যজিৎই তুলেছিলেন ছবিটা



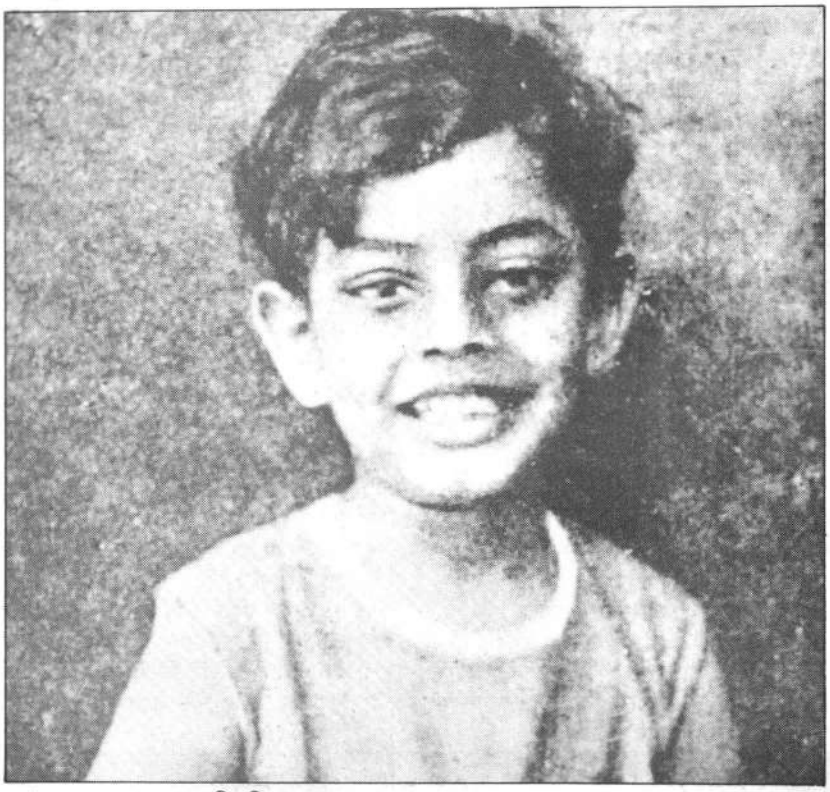
• নৌকো করে খাল ধরে জঙ্গল দেখতে যাওয়া। বাঁ দিকে সত্যজিৎ

খণ্ডে 'রোমান্স অব ফেমাস লাইভস' আর বাড়িতে ছিল দশ খণ্ডে 'বুক অব নলেজ'। এইসব বই থেকে ছোট ছেলেটি খুঁটিয়ে পড়ত বিদেশী সুরস্রষ্টাদের জীবনকাহিনী, তাঁদের কীর্তিকলাপ। বিদেশী সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ এবং উৎসাহ সত্যজিতের ছোট বয়সেই জন্ম নেয়। বিদেশী কমপোজিশনের মিনিয়েচার স্কোর পাওয়া যেত সেকালে, সেটা নিয়ে শুতে যেতেন। সেটাই ছিল 'বেডসাইড রিডিং।' একথাটি বিশদ বলার কারণ আছে। বাড়িতে গানের চর্চা ছিল বিপুলভাবে। উপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং বেহালা বাজাতেন, গান রচনা করেছেন। সুকুমার রায়ও গান রচনা করেছেন। এবং সত্যজিৎ রায়ের মাতৃকুলে যেভাবে গীতিকারদের এবং সঙ্গীতশিল্পীদের সংখ্যাধিক্য ছিল, বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারেও এমন অধিকসংখ্যায় সাঙ্গীতিক শিল্পীর দেখা পাওয়া যায়নি।
কালীনারায়ণ গুপ্ত বা ভক্ত কালীনারায়ণের সঙ্গীতচর্চা বংশানুক্রমে তাঁর উত্তরপুরুষের মধ্যে প্রবলভাবে বহমান হয়েছিল। সত্যজিতের মা সুপ্রভা রায়ের গানের গলা ছিল বিস্ময়কর এবং যত্রতত্র তিনি অনায়াসে, নিঃসংকোচে গান গাইতেন। মাসি ছিলেন সুখ্যাত কনক দাশ; তাছাড়া এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন অতুলপ্রসাদ সেন, সাহানা দেবী, মঞ্জু গুপ্ত প্রমুখ। বাড়িতে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হত। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনাথের গানেই মুখর ছিল সত্যজিতের বাল্যজীবন। তবু ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি কোনও কৌতূহল বা উৎসাহ বহুকাল সত্যজিতের মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন বিদেশী, ধ্রুপদী সঙ্গীতের অনুরাগী। আবাল্য তারই চর্চা করেছিলেন।
পাঁচ বছর বয়সে গড়পারের বাড়ি থেকে চলে আসেন ভবানীপুরের বকুলবাগানে 'সোনামামা' প্রশান্তকুমার দাসের বাড়ি।

• ছেলেবেলায় সত্যজিৎ



কারণ, সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বাজেয়াপ্ত হল, উপেন্দ্রকিশোরের তৈরি বাড়ি সহ। 'কেন গেল সেটা আমাকে বলা হয়নি। অনেক পরে আমি এসব জেনেছি। পারিবারিক দুরবস্থার কথা আমাকে কিছু বলা হয়নি, এবং অ্যাকচুয়ালি মা-র তখন নিশ্চয়ই ভয়ানক অসুবিধে হয়েছিল। আমার ছোটমামার ওখানে আমরা চলে আসি।' তখন একা সেই বালক সারা দুপুর ওই বুক অব নলেজ পড়ে আর স্টিরিওস্কোপে ছবি দেখে সময় কাটাত। সারাদিন ধরে শুনত ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র ডাক। গরমের দুপুরে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসত আর বালক সবিস্ময়ে দেখত সেই ফাঁকেই রাস্তার ছবি উল্টো হয়ে পড়ছে অন্যদিকের দেওয়ালে। বন্ধ ঘরে ম্যাজিকের মত রাস্তার লোক চলাচল দেখা যেত। 'কতদিন যে দুপুরে শুয়ে শুয়ে এই বিনা পয়সার বায়স্কোপ দেখেছি তার ঠিক নেই।' কখনও বা বন্ধ দরজার ফুটোর উপর ঘষা কাচ ধরে আরেক চলচ্ছবি দেখা হত; স্পষ্ট দেখা যেত উল্টো করে পড়েছে ছোট্ট আকার ধরে বাইরের চলন্ত জগতটি। আরেক সঙ্গী ছিল ম্যাজিক ল্যানটার্ন; তারই সাহায্যে ঘুরন্ত ফিল্মের ছবি পড়ে দেওয়ালের উপর। 'কে জানে, আমার ফিল্মের নেশা হয়ত এই



• চার বছর বয়েসের আরেকটি ছবি

ম্যাজিক ল্যানটার্নেই শুরু। ভবানীপুরের বাড়িতে এসে ছোট ছেলেটিকে অবাক করেছিল চিনে মাটির টুকরো বসানো নকশা-করা মেঝে। এইসব দৃশ্য আর শব্দকে ঘিরেই তো তৈরি হয় এমন এক শিল্পীর প্রথম পৃথিবী।

এই সময়ে সত্যজিৎ দেখেছেন কয়েকটি নির্বাক ছবি—ম্যাডোনা বা এলিটে, কখনও গ্লোবে : বেনহুর, কাউন্ট অব মন্টি ক্রিস্টো, আঙ্কল টমস কেবিন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম সবাক্ ছবি সত্যজিৎ দেখেন, 'টার্জন দি এপ ম্যান'। গ্লোবে প্রথমদিন গিয়ে সেই ছবির টিকিট পাওয়া গেল না। অতএব, সঙ্গী মামা ছোট ছেলের হতাশা কাটাবার জন্যই নিয়ে গেলেন কাছেই অ্যালবিয়ন থিয়েটারে, এখনকার রিগ্যাল-এ। সেখানে চলছিল বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র, নাম 'কাল পরিণয়'। সেটি অবশ্যই বড়দের উপযোগী। মামা অস্বস্তির ভাব কাটাবার জন্য ভাগ্নেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলেন। ভাগ্নে রাজি নয়। তার ফল হল এই যে, সত্যজিতের মনে সেই তখন থেকে বাংলা ছবি সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞার ভাব জন্ম নিয়েছিল যার জের চলেছিল আযৌবন।

বলা দরকার, প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত এই নির্বাক্ 'কাল পরিণয়' চিত্রে অভিনয় করেছিলেন নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, পেসেন্স কুপার, শান্তি প্রকাশমণি প্রমুখ। ছোটবেলায় লখনৌতে গিয়েছেন কয়েকবার ; সেখানে থাকতেন মেজোমামা আর আরেক মামা অতুলপ্রসাদ সেন, মায়ের মাসতুতো ভাই,। সেই স্মৃতি তাঁর প্রথম উপন্যাস আর চলচ্চিত্রে ছায়া ফেলেছে। তাছাড়া গিয়েছেন পিসীমা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্বামী অরুণনাথ চক্রবর্তীর কাজের জায়গায়—অনেকবার হাজারিবাগ, দ্বারভাঙ্গা, আরায়। দার্জিলিঙে মেসোমশাই দুজন থাকতেন ; তাঁদের বাড়িতেও পালা করে থেকেছেন মায়ের সঙ্গে। বছর সাতেক বয়স তখন। সেই সময় দার্জিলিঙের মহারানী গার্লস স্কুলে সুপ্রভা রায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকার। সত্যজিতের অল্পদিনের বৈদ্যালয়িক শিক্ষার সূচনা এইখানেই। বকুলবাগানে থাকতেই সাঁতার শেখেন ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবে। পদ্মপুকুর স্কোয়ার সেই বয়সেই সত্যজিৎ পারাপার করতে পারতেন। ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের ছেলেদের দেখে ব্যায়ামচর্চা করেছেন নিয়মিত। আর

খুব অল্পবয়সে বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে সেবার মা আর ছোট মাসি কনক দাসের সঙ্গে শিশু সত্যজিৎও ছিলেন সেখানে মাস তিনেক। খোয়াইতে দিগন্তবিস্তারী পূর্ণিমার কথা আর সেখানে মায়ের খোলা গলার গান তাঁর বরাবর মনে ছিল।

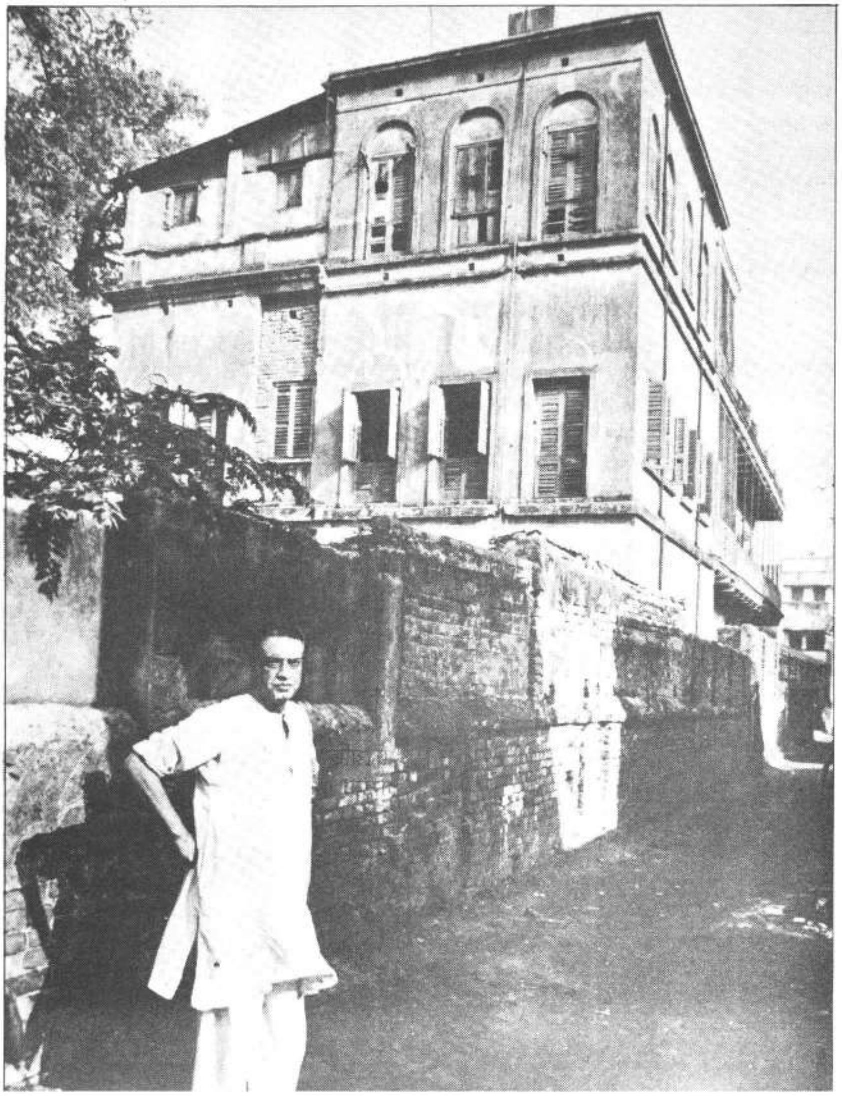
১৯২৯ সালের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অবসর সময়ে প্ল্যানচেট নামাতেন। সেই কৌতূহলকর এক নতুন খেলা কবিকে বেশ কিছু কাল নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। অনেকের মাঝে একদা এলেন সুকুমার রায়; কবির বন্ধুপুত্র এবং ভক্ত। প্রয়াত আত্মার সঙ্গে সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সংলাপ ধরা রয়েছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে এক খাতায়।

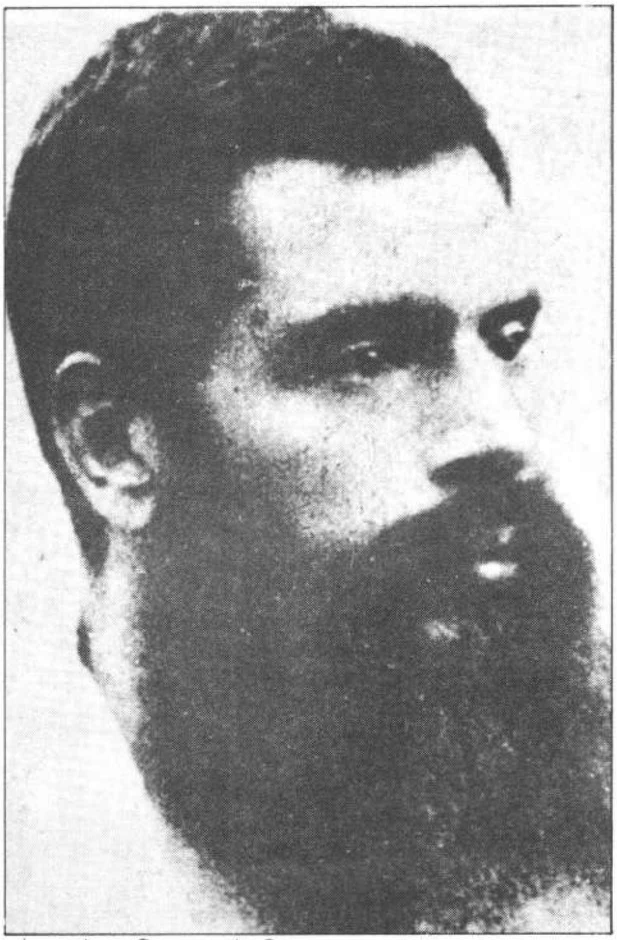
ছোটকাকার সঙ্গে গিয়ে জাপানি শিক্ষকের কাছে শিখেছেন যুযুৎসু। মায়ের কাছে শুনতেন ইংরেজি ক্লাসিকস, বাংলায় বলতেন। দাদু কুলদারঞ্জন রায়ের কাছে শুনেছিলেন সম্পূর্ণ মহাভারতের গল্প। ছোটকাকার কাছে শুনতেন ভূতের গল্প। খুব অল্পবয়সে বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যে সেবার মা আর ছোট মাসি কনক দাসের সঙ্গে শিশু সত্যজিৎও ছিলেন সেখানে মাস তিনেক। খোয়াইতে দিগন্তবিস্তারী পূর্ণিমার কথা আর সেখানে মায়ের খোলা গলার গান তাঁর বরাবর মনে ছিল। আট বছর বয়সে আবার গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেসময়ে দেখা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ত। সত্যজিতের অটোগ্রাফ খাতায় সেবারই রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন যেটি বহু ব্যবহারে বিখ্যাত হয়েছে পরে—'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে...'। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বড় হয়ে এর মানে বুঝবে। কবির টেবিলে বিদেশের স্ট্যাম্প দেখে ভীষণ লোভ হত। প্রায়ই যেতেন কলাভবনে নন্দলাল বসুর কাছে; নন্দলাল চারদিনে চারটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন ছোট ছেলেটিকে। কবিতা এবং ছবিগুলি সত্যজিৎ সর্বদা পরম সম্পদের মত সগর্বে রক্ষা করে এসেছেন।

ন-বছর বয়সে ভর্তি হলেন বালিগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়ে। মা তখন বিধবাদের স্কুল বিদ্যাসাগর বাণীভবনে গান আর সূচিকর্মে শিক্ষকতা করতেন। এই স্কুলের স্মৃতি সত্যজিতের 'যখন ছোট ছিলাম' গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বলা আছে। শেষদিকে বেলতলা রোডে এলেন। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ১৯৩৬এ সত্যজিৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন; তখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর দশ মাস।

স্কুল থেকে বেরিয়ে সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল সাহিত্য নিয়ে পড়া বা শিল্পচর্চার। বিধবা মা স্কুলে কাজ করে একটিমাত্র ছেলেকে পড়িয়ে চলেছেন। সেইকালে দেখা হল পাইকপাড়ায় সিংহদের বাড়ির এক সভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনিই

•গরপারের বাড়ি। সামনে সত্যজিৎ


নিমাই ঘোষ



• ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি



• পিতা সুকুমার রায়

প্রস্তাব করেছিলেন, 'আমার আশ্রমে চলে এস।' সত্যজিতের ইচ্ছে ছিল না। তাছাড়া সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ অন্যরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, সত্যজিৎ যদি অর্থনীতি নিয়ে পড়ে তাহলে 'সংখ্যা' পত্রিকায় আড়াইশো টাকা মাইনের একটা চাকরি দেওয়া যাবে। অর্থনীতিতে সত্যজিতের আকর্ষণ ছিল না, বাধ্য হয়েই ইকনমিক্সে অনার্স নিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন। কলেজ-জীবন যে তাঁকে কিছুই দেয়নি, এমন মন্তব্য একাধিকবার করেছেন।

এইসময়েই সত্যজিতের ফটোগ্রাফিতে আকর্ষণ বেড়ে উঠল। ভয়েটল্যান্ডার ব্রিলিয়ান্ট ক্যামেরায় কিছুদিন ছবি তুললেন। তখন বিলেত থেকে একটি পত্রিকা আসত, নাম 'বয়েজ ওন পেপার'। সেখানে একবার প্রতিযোগিতায় ফটো পাঠিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন এক পাউন্ড। কলেজে পড়ার সময় বাংলা ছবিতে, ভারতীয় সঙ্গীতে কিংবা ভারতীয় চিত্রে কখনই ঔৎসুক্য বোধ করেননি। নিকটাত্মীয় নীতিন বোসের ছবি কিছু দেখে ভাল লেগেছিল। একদম পছন্দ ছিল না প্রমথেশ বড়ুয়াকে। এই কলেজ জীবনেই পূর্ণরূপে সত্যজিৎ তাঁরই কথায়, 'তখন একেবারে ফিল্ম-ফ্যান' কিন্তু দেখতেন মার্কিনি ছবি। ডায়েরিতে ছবি দেখে তার পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়ে রাখতেন।

১৯৪০এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর মায়ের ইচ্ছেটা ফলপ্রসূ হল। শহর ছেড়ে, তাছাড়া শান্তিনিকেতনের কিছুজনের কথাবার্তার ধরন শুনে সত্যজিৎ কখনই চাননি সেখানে কিছু শিখতে যাবেন। বিশেষত ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে কোনও উৎসাহ যখন বোধ করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন; এবং সুপ্রভা রায়েরও তাই বাসনা ছিল। এর পিছনে ছোট্ট এক ইতিকথা আছে।

১৯২৯ সালে শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অবসরসময়ে প্ল্যানচেট নামাতেন। সেই কৌতূহলকর এক নতুন খেলা কবিকে বেশ কিছু কাল নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। অনেকের মাঝে একদা এলেন প্রয়াত সুকুমার রায়; কবির বন্ধুপুত্র এবং ভক্ত। প্রয়াত আত্মার সঙ্গে সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সংলাপ ধরা রয়েছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে এক খাতায়। সেখানে আছে সুকুমার রায় জিগ্যেস করছেন—'আচ্ছা, আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন?' রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল, 'তোমার স্ত্রী যদি সম্মত হন।' সুকুমারের কথা, 'তাঁকেও বলুন না!' রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তাকে পেলে আমিও খুশি হব। ...আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।'

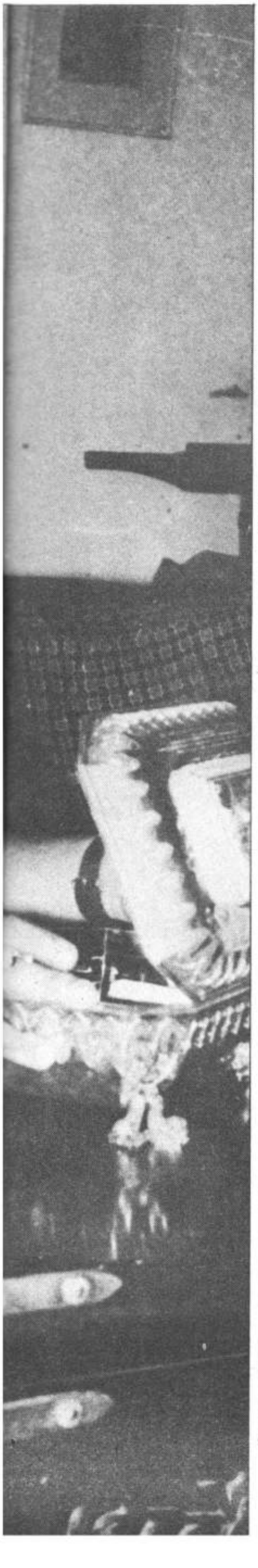
ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা মাতার একতম সন্তান সসম্মানে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও এই কারণেই শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হলেন। 'অনেককাল পরে এক 'অমল ভট্টাচার্য স্মারক' ভাষণে সত্যজিৎ রায় বলছেন, 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার চোখ আর কান খুলে গেল।'







শান্তিনিকেতন আর কলাভবনের দিনগুলিতে সত্যজিৎ রায়ের অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর একজন হলেন **দিনকর কৌশিক**। তিনি লিখছেন সেই সময়ের কথা।



শান্তিনিকেতন ও কলাভবনের দিনগুলি

সত্যজিতের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯৪০ সালে। আমি সেই বছর শান্তিনিকেতনে আসি। শেষদিকে ভাষার সমস্যা থাকার দরুন আমার সম্পর্ক ছিলো যাদের সঙ্গে আমি ইংরেজিতে আলাপ করতে পারি। কলাভবনের ছাত্রাবাসে এসেই দেখতে পেলাম লম্বা ছেলে-টিন এজার-রোগা, সাদা পাঞ্জাবী পায়জামা গায়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যাপার—যেমন পোশাকে, তেমন কথাবার্তায়, কাজে, সব ক্ষেত্রে। বারান্দায় বসে—মানিক—(সবাই ওকে মানিক নামে চিনতো) সকল সুরিয়া, পৃথ্বীশ—ইংরেজিতে গল্প করছিল। আমি অনায়াসে ওদের দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে মানিক পকেট থেকে রুপোর ডিবে বার করে জোয়ান খেতো -নিঃশ্বাসে যাতে অপরিচ্ছন্নতা না থাকে। প্রসন্ন রাও কর্ণাটকের ছেলে। সে সবাইয়ের সঙ্গে খোলামেলা, হাসি-ঠাট্টা করাই তার কাজ। সে আমার নাম দিনু কৌশিক বলে আগে থেকে প্রচার করে রেখেছিল। হঠাৎ মাঝখান থেকে মানিক বলে উঠলো—"তুমি কার কাজ পছন্দ কর দিনু ?" আমার জানার মধ্যে—দু-একটি নাম—ভ্যান গখ, সেজান। আমি বললাম—"পিকাসোর কাজে—এতো ধরনের প্রকাশ রয়েছে—সেটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।" মানিক হেসে একটু নীচু গলায় বলল—"খবরদার ! পিকাসোর নাম মাষ্টারমশাইয়ের (নন্দলাল বসু) সামনে কক্ষণো নেবে না, বুঝলে ?"

ছাত্রাবাসের সামনেই কিঙ্করদার মাটির বাড়ি ছিল। কিঙ্করদা মোটা জোর গলায় "রজনীর শেষ তারা—আঁধারে গোপনে আধো ঘুমে" গান করছিলেন, আমি কিছুক্ষণ শুনে বললাম—"তোড়ি রাগের কী নিখুঁত বন্দিশ—সদারংগ, তানসেনও খুশী হতেন এই ধরনের কাজে !" মানিক চট করে আমাকে জিজ্ঞেস করল—"তুমি মনে হয় ওস্তাদী গানের চর্চা রাখো—বেশ তো। —আমায় বলো, কোন্ গাইয়ে পছন্দ কর ?" আমি অনায়াসে বললাম "আমার কিরানা ঘরানা—বিশেষ করে খাঁ সাহেব, আব্দুল করিম খাঁ—সারাই গন্ধর্ব এঁদের গায়কী ভাল লাগে। এঁদের গানে প্রাণ আছে ভাব আছে। কসরত কম থাকে—তান বোল থাকলেও এক ধরনের সংযম এবং সঞ্চলন থাকে। এঁরা রাগকে মূল আঙ্গিক থেকে কক্ষণো বিচ্যুত হতে দেয় না। এঁরা রাগের গভীরে অবগাহন করেন। উপরিতলে লাফালাফি করে না। আমায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।" এই সব কথা আমরা ইংরেজিতেই বললাম। আমার বোঝার জ্ঞান সে সময় কিছুই ছিল না। এখন না হয় বাংলা বই পড়ি; চেষ্টা চরিত্র করে লিখিও। লেখবার সময় কিন্তু দেবনাগরী হরফ ব্যবহার করতে হয়।

সেই বছর জ্যু পিয়ো শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে 'ঘোড়া' ছাত্রদের মধ্যে বেশ লোকপ্রিয় হয়েছিল। সকল সুরিয়া—শ্রীলঙ্কার ছেলে—সব সময় বড় বড় নেপালী কাগজের পাতা নিয়ে ক্যালিগাফির অভ্যাস করত। একবার ব্রাশের ক্ষিপ্র টান দিয়ে মাস্টারমশাইয়ের পোর্ট্রেট করল। মানিক দেখাদেখি আর এক পোর্ট্রেট করল। ব্রাশের টান ছিল আরও জোরালো এবং চরিত্রের সাদৃশ্য আরও বিশ্বস্ত। মানিকের ড্রয়িংয়ের হাত স্বভাবত রূপ-নির্ভর ছিল। ফুল পাতা মানুষ স্কেচ করতে গিয়ে তাকে বেশি ধস্তাধস্তি করতে হত না। সহজভাবে রেখায়ন করা তার কাছে কঠিন ছিল না। জ্যু পিয়োর ঘোড়াগুলি কাগজে যে ভাবে লাফ দিয়ে প্রকাশ পেতো—সেই কৌশল ছাত্রদের বেশ প্রভাবিত করেছিল।

পৃথ্বীশ (নিয়োগী) ছিল আমাদের মধ্যে তাত্ত্বিক। সে নতুন নতুন শিল্প-সমীক্ষার বই পড়ে আমাদের বোঝাতো রোজার ফ্রাই, হার্বার্ট রিড, বিকেন্সকী—কুমার স্বামী এঁদের লেখা পড়ে অনেক শিল্পীদের কাজের সঙ্গে আমাদের পরিচয়

• শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ



● কলাভবনে অ্যালবাম দেখছেন। সঙ্গে অধ্যক্ষ দিনকর কৌশিক

কলাভবনের ছাত্রাবাসে এসেই দেখতে পেলাম লম্বা ছেলে টীন-এজার-রোগা, সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা গায়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যাপার— যেমন পোশাকে, যেমন কথাবার্তায়, কাজে, সব ক্ষেত্রে। বারান্দায় বসে মানিক— (সবাই ওকে মানিক নামে চিনতো) সকল সুরিয়া, পৃথ্বীশ— ইংরেজীতে গল্প করছিল।

করিয়ে দিয়েছিল। পৃথ্বীশ মাঝে মাঝে কিঙ্করদা বিনোদদার সঙ্গে শিল্পের আধুনিক চিন্তাভাবনা নিয়ে সবসময় আলোচনা করত। মানিকের মতে কিঙ্করদার কাজে ভাবনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে। কিঙ্করদার পলাশ ফুল গাছের স্কেচ দেখে মনে হয় সবুজ নীল গহনতার মধ্যে "হঠাৎ খুশী ঘনিয়ে আসে" লাল-সিঁদুর রঞ্জিত! অনুভূতির প্রাণসঞ্চার থাকে। বিনোদ দা কিন্তু নিজেকে এই ধরনের মুহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন ধরে কাজ করেন না। তাঁর কাজে বিষয়-বিশ্লেষণ এবং শেষে এক ধরনের টান থাকে যেটা ক্রমশ ধ্যান ও গাম্ভীর্যে পরিণত হয়। যখন আমি কিঙ্কর দা আর বিনোদদাকে নিয়ে তথ্যচিত্রের কথা মানিককে বললাম, মানিক চট করে আমাকে লিখল—"দেখো দিনু বিনোদদার সঙ্গে কাজ করা মনে হয় আমার পক্ষে সহজ হবে। আমি আগে বিনোদদারই উপর তথ্যচিত্র করব।" এটা হলো পরেকার (১৯৭০ র) কথা।

কিচেনে আমরা দল বেঁধে এক সঙ্গে যেতাম। আমি, মানিক, পৃথ্বীশ, মুথু, প্রসন্ন, সকল সুরিয়া সেখানে ডানদিকে নিরামিষাশী আর বাঁ দিকে আমিষাশী। কিচেনে ঢোকবার সময় আমি, পৃথ্বীশ, মুথু, প্রসন্ন ডান দিকে। বাঁ-দিকে মানিক সকল সুরিয়া—এরা। প্রায় প্রত্যেকদিন মানিক বলতো তোমরা ঘাস পাতা খেয়ে ছাগল শ্রেণীতে পড়ে যাও। মানুষে খায়—মাংসের কালিয়া, মাছের ঝোল, ডিমের ওমলেট। মানিক কোনও দিন রান্না না-করা জিনিস পছন্দ করে নি। ফল মূল কন্দ তার ভাল লাগত না। অনেক বছর পরে যখন মানিক আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে এল সে সময় ভুল করে আমার স্ত্রী পুষ্প ধনেপাতা তরকারির উপরে দিয়ে ছিল। পরে তার খেয়াল হল মানিকদা তো ওই ধরনের কাঁচা জিনিস খায় না, চট করে ধনেপাতা বাদ দিয়ে আর এক বাটিতে



নিমাই ঘোষ

তরকারি পরিবেশন করল।
কিচেনের সামনে চৈতির প্রাঙ্গণে অনেকবার ছাত্র-ছাত্রীরা টীকা-টিপ্পনী সহ কাগজ-কার্টুন ছড়া এইসব টাঙিয়ে দিতো। এক বিশেষ মোটা ছাত্রী ছিল—তার মানিকের প্রতি বোধহয় দুর্বলতা ছিল। মানিক সেটা লক্ষ করেছিল। এক দিন মানিক একটা মজাদার কার্টুন করলো। কুমড়ো পটাশ! কুমড়োর মুখ ও সেই মোটা ছাত্রীর চেহারা বেশ চেনা যায় একরকম। সেই কার্টুন দলে দলে ছাত্র ছাত্রীরা দেখতে দেখতে মন্তব্য করতে করতে চলে গেল। এই ভাবে এক অপরিণত সংঘাতের সমাপ্তি হল।
১৯৪০ এর ডিসেম্বর মাসে কলাভবনের বার্ষিক ভ্রমণ দুমকায় হবে স্থির হয়েছিল। পৃথ্বীশ এই ধরণের পিকনিক পছন্দ করতো না। সে পরামর্শ দিল—আমরা চারজন যদি দল বেঁধে অজন্তা, এলোরা, এলেফান্টা-খাজুরাহো যাই তাহলে স্টুডেন্ট কনসেশন পাব। দেখা হবে—শিক্ষাও হবে। মাস্টারমশাই পছন্দ করবেন। ব্যাস—ঠিক হল, মানিক, পৃথ্বীশ আমি আর মুথু সর্বভারত ভ্রমণের জন্য সর্বভারত প্রতিনিধি। আমি পশ্চিমা-মুথু দক্ষিণী-মানিক আর পৃথ্বীশ পূর্ব ভারতের। আমার হিন্দী জানা ছিল তাই জন্য উত্তর ভারতও আমার ভাগে ছিল। এই যাত্রার সম্বন্ধে আমি পূর্বেই 'এক্ষণ' পত্রিকায় লিখেছি। তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। কিন্তু দু একটি কথা উদ্ধৃত করার চেষ্টা করি।
আমরা চারজন চক্রাকারে ভ্রমণের টিকিট, প্রতিটি উনিশ টাকা বারো আনায় কিনে ট্রেনে কোনরকমে ঠেলাঠেলি করে উঠলাম। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের যাতায়াত চলছে। তাদের মধ্যে ওঠা সহজ ছিল না। মিলিটারি কামরায় ওঠা অসম্ভব। অথচ প্রায় সব কামরায় উর্দি-পরা জওয়ানদের ঠাসাঠাসি। ঠাণ্ডার দিন ছিল বলে রক্ষে। বেশ শরীর গরমে এবং মনের উৎসাহে সময় কী রকম কাটলো, বোঝাই গেল না। ভুল ট্রেনে ওঠা, টি.টির সঙ্গে কথা কাটাকাটি। মারাঠি মালয়ালী ভাষা বলে টি.টি-কে নিরুত্তর করে আমাদের জলগাঁওতে পৌঁছনো—এই সবেতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অজন্তায় আমার বাবুর্চিগিরি, পৃথ্বীশ, মানিকের বাবুর্চির অ্যাসিস্টেন্টশিপ রীতিমত চলছিল। এলোরার ডাকবাংলোর এক ঘটনা মনে পড়ে। আমরা গুহা গুলি দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছি। চাপরাশি আমাদের বাজরার রুটি আর ঝাল লঙ্কাসহ আলুর তরকারী খাইয়ে দিল। ঠোঁট-নাক-কান-চোখ ঝালের ঝাঁঝে ঝালাপালা করছিল। কোনরকম জল খেয়ে আমরা চারজনই মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছি। দরজা বন্ধ করেছি। মাঝ রাত্রে এক অদ্ভুত আওয়াজ—"ঠন্ ঠন্ ঠন্"। দু মিনিট পরে আবার "ঠন্ ঠন্ ঠন্"—আবার কিছু সময় পরে "ঠন্ ঠন্ ঠন্।" মানিক স্পষ্ট গলায় বলল— হোয়াটসদ্যাট !আমি ভয় পেয়েছিলাম— বললাম— সামথিং রিংগিং— আবার ঠন্ ঠন্ ঠন্। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম— বন্ধ দরজার উপরে লোহার একটা ছোট সাইনবোর্ড ছিল। এক দিকে অকোপায়েড আর এক দিক অ্যাভেলেবল লেখা। সেটা হাওয়াতে দরজার পাল্লাতে আঘাত করে "ঠন্ ঠন্ ঠন্" আওয়াজ তুলছিল। হাত দিয়ে জোরে টেনে দড়ি ছিঁড়ে সাইনবোর্ড নামিয়ে দিলাম। স্বস্তি হল, ঘুমও হল। কিন্তু আমরা রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম।

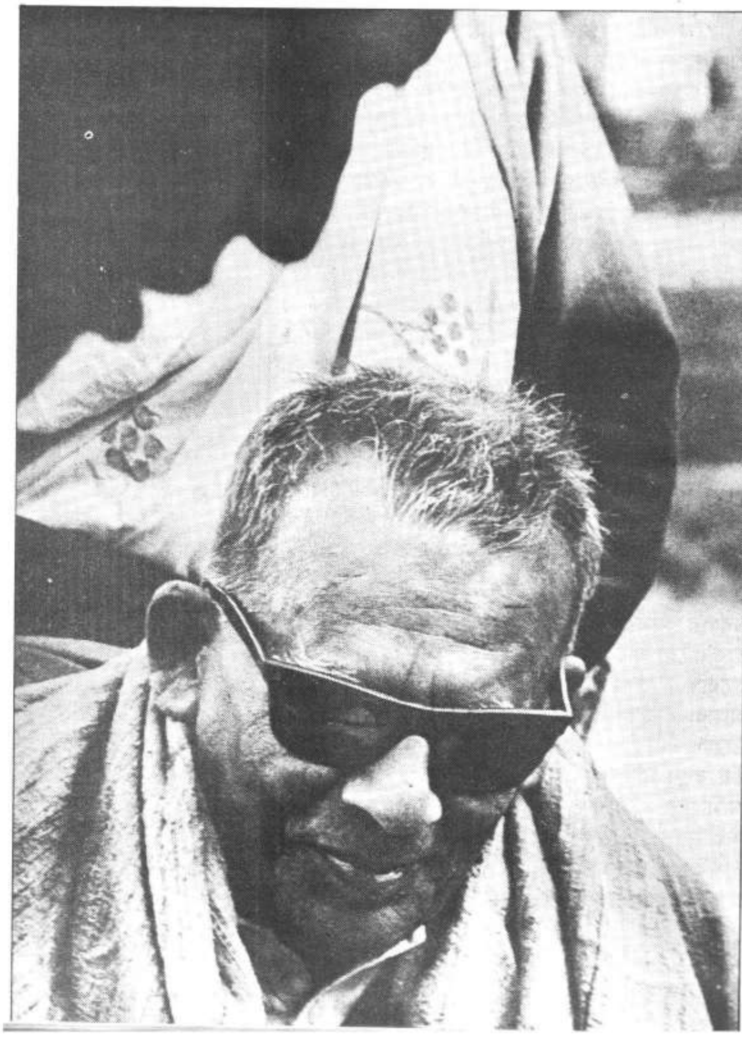
এরপর আমরা এলেফান্টা গুহা হয়ে গোয়ালিয়র খাজুরাহো যাবো। পূর্বোক্তি লেখায় আমি উল্লেখ করেছি। তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। শুধু আমরা খাজুরাহোতে যে স্থানে শুয়েছিলাম তার উল্লেখ করব। খাজুরাহোতে আমরা সারাদিন তন্ন তন্ন করে মন্দিরগুলো দেখেছিলাম। পৃথ্বীশ আমাদের সুশিক্ষিত গাইড— চন্দেলা রাজাদের শিল্পানুরাগ, ওড়িশা এবং খাজুরাহোর কাজের মধ্যে পার্থক্য। কামোন্মত্ত মূর্ত্তিদের ভাব-ভঙ্গিতে অলংকরণের ছন্দ। মানবমূর্ত্তি প্রকারান্তরে

"সকল সুরিয়া—শ্রীলঙ্কার ছেলে— সব সময় বড় বড় নেপালী কাগজের পাতা নিয়ে ক্যালিগ্রাফির অভ্যাস করত। একবার ব্রাশের ক্ষিপ্র টান দিয়ে মাস্টার মশাইয়ের পোর্ট্রেট করল। মানিক দেখাদেখি আর এক পোর্ট্রেট করল। ব্রাশের টান ছিল আরও জোরালো এবং চরিত্রের সাদৃশ্য আরও বিশ্বস্ত।"

নিমাই ঘোষ



• কলাভবন-ক্যান্টিনে মুরাল বসানোর আগে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়



নিমাই ঘোষ

•গুরু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

লতাগুল্মে রূপান্তরিত। মনুষ্য-বৃষ-পশু-পাখি যেন একই পরিবারের। এই ভাবাত্মক একতা ভারতীয় শিল্পের বিশেষ দিক। ওদের প্রকৃতি এবং মানব এই তফাৎ জানা ছিল না। না হলে শকুন্তলাকে বিদায় দেবার জন্য বৃক্ষ এবং লতা কেন অশ্রুক্ষরণ করত! কেন প্রস্তর ও অহল্যা এক হয়ে সহস্র বর্ষ একীভূত হয়ে ছিল। পৃথ্বীশ এমন রসিয়ে কথা বলত যে তা শুনে মনে হত মূর্ত্তিগুলো জ্যান্ত হয়ে মন্দির গাত্রে ক্রীড়া করছে। কিন্তু শিল্প দিয়ে পেট ভরে না—বা দিনের ক্লান্তিও দূর হয় না।
কোনরকম দু মুঠো খেয়ে শোবার জন্য জায়গার তল্লাশি শুরু করলাম। শোব আর কোথায়? কোন হোটেল নেই, ধর্মশালা নেই, কোন ছাদ নেই—যার তলায় চুপ করে পড়ে থেকে রাত কাটাই। শেষে এক গোয়ালঘর পাওয়া গেল। খড়ে ভরতি। এক পাশে গোরু মোষগুলি—হুশ-হাস-ধুপ ধাপ করে পা নাড়াচ্ছে। লেজে পোকা মাছি তাড়াচ্ছে। "জয় খাজুরাহো" বলে আমরা শুয়ে পড়লাম। কনকনে ঠাণ্ডাতে গোরুগুলোর নিঃশ্বাসে খুব গরম তাপ দিচ্ছিল। শুধু দুর্গন্ধে ভরা ছিল। সকাল সকাল উঠে আবার চায়ের সন্ধান। এবং স্কেচ বই নিয়ে মাস্টারমশাইকে দেখাবার যোগান।
শান্তিনিকেতনে পুজোর পর আমরা অজন্তা পরিক্রমার হিরো। আমাদের স্কেচ বই ভরতি। মুথু অনেক ফটো তুলেছিল। মাস্টারমশাই আমাদের বাহবা দিলেন।
সে সময় প্রাণেশ বলে এক জোয়ান ছেলে কলাভবনে ভর্তি হয়েছিল। সে ছিল খাঁটি



●তথ্যচিত্র তোলার সময়ে সত্যজিৎ, বিনোদবিহারী, কৌশিক এবং অন্যান্যরা

এক বিশেষ মোটা ছাত্রী ছিল— তার মানিকের প্রতি বোধহয় দুর্বলতা ছিল । মানিক সেটা লক্ষ করেছিল । একদিন মানিক একটা মজাদার কার্টুন করলো । কুমড়ো পটাশ ! কুমড়োর মুখ ও সেই মোটা ছাত্রীর চেহারা বেশ চেনা যায় একরকম ।

বরিশালী বাঙাল । বেশ লম্বা, ৫′-১১″ হবে । মানিকের চেয়ে দু-তিন আঙুল কম । সকালবেলার ক্লাশের পর বেশ ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরে তৈলমর্দন করত আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করতো । একদিন কী একটা বই পড়ছিল । "মানিকবাবু 'দ্য ওডোর' মানেটা কি ?" 'দ্য ওডোর' দেখি দেখি কোথায় লেখা আছে ? একটি প্রবন্ধের মুখবন্ধে 'থিয়োডর রুজভেল্ট' এর নাম ছাপা ছিল । এর প্রথম তিন অক্ষর 'বোল্ড টাইপ'-এ ডিজাইন দিয়ে বক্স করা ছিল । আমরা হেসে আর কুল পাই না । মানিক ওকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা । প্রাণেশের শরীর চর্চা বিশেষভাবে ছেলেদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, কলাভবনে ভর্তির সময়ে তার বিবাহ হয়েছে । সব সময় সে একান্তে দুঃখ করত—সে ভাবত, সে যদি অবিবাহিত থাকতে এখানে আসত তা হলে অনেক ভাল ভাল পাত্রী পাবার সুযোগ হতে পারত । হায় কপাল ! পরবর্তীকালে মানিক যখন কিমার-এ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বলে খ্যাতি অর্জন করেছে সেই সময় প্রাণেশ অনেক মলাটের কাজ, বিজ্ঞাপন দাতাদের কাজ—মানিকের হাত দিয়ে করতো—এবং কিছু উপার্জনও করতো । মানিকের বন্ধুবাৎসল্যে সব সময় অন্যেরা উপকৃত হয়েছে । তাতে কোনও কার্পণ্য ছিল না ।

১৯৪১ সালের জুন মাসে গুরুদেবকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে । গুরুদেব আশ্রমের বাসে বসে শালবীথি, সিংহসদন, শ্রীভবন, আদি ঘুরে ঘুরে যাবার আগে দেখে নিলেন । সেই সময় নন্দিতা, বিশুদা, মাসোজী, সবাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন । অগস্ট মাসের আট তারিখে সকালে বোধহয় মল্লিকজী সবাইকে জানালেন, গুরুদেবের অবস্থা অবনতির দিকে । যাঁরা কলকাতা যেতে চান-যেতে পারেন । আমি আর মানিক জোড়াসাঁকোয় গিয়ে যা দেখেছি সেটা অবিস্মরণীয় । লক্ষ লক্ষ মানুষের সমুদ্রে আমরা হারিয়ে গিয়েছি । কোনরকমে রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাসায় পৌঁছলাম । চটিগুলি হারিয়ে, ঘামে ভিজে, হুশ-হাশ করতে, মনের দুঃখ মনে রেখে গুরুদেবের কথা ভাবতে থাকলাম । পরের দিন আবার শান্তিনিকেতন । গতকাল আর আজকের মধ্যে—কত পার্থক্য । অথচ সব বাড়ী, সব গাছ যেমন ছিল তেমন থেকে গিয়েছিল । মনের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতা জন্ম নিল ।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আশ্রমের জীবনধারায় ব্যাঘাত ঘটল । রেললাইন বন্ধ । আমি—স্বদেশী দলের সঙ্গে যুক্ত হলাম । কলাভবনের অনেক ছাত্র পদযাত্রা করে কুড়ি মাইল হেঁটে মাঝরাত্রে পানাগড় গেল । তাদের মধ্যে মানিকও ছিল । পায়ে হাঁটার দীর্ঘ পরিশ্রমে মুখু প্ল্যাটফর্মে অজ্ঞান হয়েছিল । স্টেশনে গিয়ে ওরা জানতে পারল পাঁচ মিনিট আগেই এক ট্রেন কলকাতা অভিমুখে ছেড়েছে । এর পরের ট্রেন আসছে ছ ঘণ্টা পরে । আমি সেই দলে ছিলাম না । আমি সিউড়ি জেলে ইংরেজ রাজার অতিথি হয়ে দিন যাপন করছিলাম ।

কথা প্রসঙ্গে একবার ফিল্ম সম্বন্ধে আমরা বলাবলি করেছিলাম । চার্লি চ্যাপলিনের হাসির পিছনে কিরকম একটা করুণা এবং সহানুভূতির স্রোত

বিনোদদা'র ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে মানিক বিশেষভাবে সেনসিটিভ ছিল। বিনোদদা নিরালা লোক। নিজের চিন্তা দিয়ে দৃশ্য জগতের অনুধাবন করেন। বিনোদদা যে অর্থে রেখাকে প্রাধান্য দেন। যেভাবে বলেন ; আই বিলিভ ইন লাইন ডিজাইন— তাতে তাঁর চরিত্রের সার পাওয়া যায়।



• বিনোদবিহারীর শ্রীপল্লীর বাড়িতে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সত্যজিৎ ও কৌশিকের সঙ্গে

অনবরত প্রবাহিত হয় সেই কথা হচ্ছিল। মানিক 'দ্য কিড', 'গোল্ড রাশ' সম্বন্ধে বলার পর 'দ্য গ্রেট ডিকটেটর' সম্বন্ধে বলল। সেই ছবি আমার দেখা ছিল না। মানিক বর্ণনা করতে করতে ডিক্টেটর যে রকম জর্মান ভাষায় ধ্বনিতে আগড়ুম বাগড়ুম কথা বলে যাচ্ছে, যে রকম হাত পা ছুড়ে আক্ষরিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, আর মাঝে মধ্যে গলা শুকিয়ে গেলে জল খাচ্ছে আবার ঠাণ্ডা হবার জন্য প্যান্ট ফাঁক করে জল ঢালছে সেই ঘটনাগুলি অবিস্মরণীয়। এই সব মানিক বলে গেলো। অনেক বছরের ব্যবধানে যখন আমি ফিল্মে তা দেখলাম মানিকের বর্ণনা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মাস্টারমশাই নন্দলালের প্রতি মানিকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর ড্রয়িং-এ লাইনের জোর, রূপের আদিম ছন্দ ধরবার তাঁর প্রতিভা, আর সংরচনার (কম্পোজিশন) সময় গড়নের প্রতি তাঁর অধোরেখন, এই সব মানিক একান্তভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছিল। পরবর্তী কালে মাস্টারমশাইয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখল "আমার পথের পাঁচালীর ভিস্যুয়াল-এর মধ্যে যা সাদা কালোর ডায়ানামিক্স ও সামঞ্জস্য রয়েছে সেটা নন্দলালের দান বলে আমি মনে করি।" কিঙ্করদার রোমান্টিসিজম ও বোহেমিয়ান স্বভাব যদিও ভালো লাগত, মানিক মনে করতো কিঙ্করদা ভিন্ন চরিত্রের লোক। তাঁর কাজে আবেগ আছে, আঙ্গিকের গ্রহণ, বিশ্লেষণ আছে। রঙের কাব্যময়তা আছে। তবুও মানিকের নিজের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিল হয় না।

বিনোদদার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে মানিক বিশেষভাবে সেনসিটিভ ছিল। বিনোদদা নিরালা লোক। নিজের চিন্তা দিয়ে দৃশ্য জগতের অনুধাবন করেন। বিনোদদা যে অর্থে রেখাকে প্রাধান্য দেন। যেভাবে বলেন— 'আই বিলিভ ইন লাইভ ডিজাইন' —তাতে তাঁর চরিত্রের সার পাওয়া যায়। রেখা-আঙ্গিককে ব্যাখ্যা করে। রূপের নির্যাস রেখায় অঙ্কিত হয়। যে রকম সোতাৎসু হোকুসাই রেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই সত্যই হল

প্রকৃত রূপ-সত্য!

১৯৪৮ সালে আমি দিল্লীতে শিল্পী হিসাবে স্থান পাবার চেষ্টায় ছিলাম। একদিন মানিকের চিঠি পেলাম—"আমার একটা স্কেচ বই আছে, সেটা রবিশংকর তোমাকে দেবে। সেটা সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠাবে" পর দিন রবিশংকর খাতাটি আমাকে দিলেন তাতে কী সুন্দর ভিসুয়াল স্ক্রিপ্ট ছিল। মানিক বোধহয় এক সময় রবিশংকরের উপর ডকুমেন্টারি করবার পরিকল্পনা করছিলো। রবিশংকরের অনেক দিক থেকে সেতার ক্লোজআপস, ফেডআউটস, হাইলাইটস, ক্রিসক্রস ফোর শর্টিংস, হাতের ভঙ্গি, সব শুদ্ধু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, ইনস্পায়ারড কাজ প্রত্যেক





• সত্যজিৎ রায়

রবিশংকরের চেহারার ইঙ্গিত করা সাদৃশ্য। দেখে খাতাটি রেখে দেবার লোভ হয়েছিল। পরের ডাকেই আমি সেই খাতা মানিকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।

১৯৬১ হবে—মাস-তারিখ ঠিক মনে নেই। মানিক হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এলো। বাবর রোডে আমি থাকতাম। চারিদিকে কলরব। প্রখ্যাত ফিল্ম নির্মাতা সত্যজিত রায় কৌশিকের উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আশেপাশে যাঁরা বাঙালী ছিলেন, তাঁরা চুপি চুপি এক বার দেখে অন্যদের অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাঠাতে শুরু করলেন। মানিক বললো "দিনু, আজকে আমার ফিল্ম দেখানো হচ্ছে সাপ্রু হাউসে। পণ্ডিতজী আসবেন, সেই লম্বা মার্কিন অ্যামব্যাসাডর গালব্রেথ—সেও আসবে। সে আমার চেয়ে এক বিঘৎ লম্বা। তুমি পুষ্পার সঙ্গে দেখতে এসো। কী ভালো লাগছে—বোলবো! এই সময় যদি মা থাকতেন—কী না আনন্দ পেতেন, সত্যি, তাঁর শূন্যতা আমি বিশেষ ভাবে এই সময় অনুভব করি।"

১৯৬৭ যখন আমি কলাভবনে অধ্যক্ষ হয়ে শান্তিনিকেতনে আসি মানিক প্রথমেই আমাকে অভিনন্দন জানালো। "খুব ভালো হোলো। এখন মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। গান শোনা হবে—ছবি দেখা হবে।"

১৯৭০ সালে মানিক ইনার আই-র শুটিং করবার জন্য শান্তিনিকেতন এলো। তাকে আমি অনেক আগে লিখেছিলাম। "মাস্টারমশাইয়ের একটা ডক্যুমেন্টারি দেখলাম, তাতে বিশেষ চরিত্র-সূত্র নেই। শুধু কয়েকটি চলন্ত ছবি রয়েছে যাতে মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতি ধরা হয়েছে। এখন তো মাস্টারমশাই নেই কিন্তু বিনোদদা, কিঙ্করদা রয়েছেন—এঁদের ছবি যদি করো, একটা দুর্লভ ডক্যুমেন্ট থেকে যাবে।" উত্তরে মানিক লিখলো "হ্যাঁ, ঠিক কথা বলছো—আমি প্রথমে বিনোদদার উপর কাজ করব বলে স্থির করেছি।"

বিনোদদা ইতিমধ্যে নানান কথা শুনছেন। মৃণাল সেন ডক্যুমেন্টারি করবার প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন ইত্যাদি। বিনোদদা খুশী ছিলেন না। উনি আমাকে বলে পাঠালেন-দেখো কৌশিক-সত্যজিতকে আমি চিনি ও যদি আমার সম্বন্ধে ছবি করে তা হলে আমি রাজী আছি। অচেনা লোকের সামনে এই পোজ নাও, এই রকম বোসো, এই সব বললে আমার পিত্তি জ্বলবে। মানিকের দল এসে মাস খানেক থেকে ছবি তুললো। তার পরে মানিক কাঠমান্ডু, পাটনা, মসুরী বনস্থলী এই সব জায়গা থেকে ছবি তুলল। কলকাতা থেকে বিনোদদার আত্মীয়দের কাছ থেকে ছেলেবেলাকার ফোটোগুলি সংগ্রহ করে ছিলো। তারপর এই সব মশলার এডিটিং ও তার উপর মানিকের রানিং কমেন্টারি ইনার আই ডক্যুমেন্টারি হিসাবে এক অদ্বিতীয়, কীর্তি। তার সমকক্ষ তথ্যচিত্র ক্বচিৎই পাওয়া যায়।

এই গত জানুয়ারি মাসে আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে পুষ্পা আর আমার কন্যা দয়ানী আর জামাই দিলীপ বাসু এরাও ছিল। সেই সময় মানিককে দেখে, তার সঙ্গে পুরনো দিনের কথা বলে কী ভালো লেগেছিল। তার শরীর কিন্তু দুর্বল লাগছিল।

বললো—আজকে দয়ানীর জন্মদিন শুনেছি। বিজয়া সেই উপলক্ষে স্পেশাল বার্থ-ডে কেক বানিয়ে এনেছে। এ সব খাবার জিনিষ দেখেও স্বাদ পাওয়া যায়। আমার কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে স্যালিভারি বাডস শুকিয়ে গিয়েছে। যা মুখে দি ঘুরে ফিরে গলার নিচে নামে না! লুব্রিকেশন-এর অভাব। আজকে তবুও ৪০% ইমপ্রুভড় দেখছি। যাই হোক, আর বেশী খেতে পারবো না। এই যথেষ্ট।

নির্মাল্যদা পেছনে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন—একবার জানালা বন্ধ করে দিলেন। যখন ফোটো তোলা হচ্ছিল—নির্মাল্যদা গ্রুপের বাহিরে থাকবার কথা বোধহয় ভাবছিলেন। তাকে কাছাকাছি রেখে মানিকের সঙ্গে চার পাঁচ ফোটো তোলা হল। আমরা খুশী মনে বিদায় নিলাম।

মানিক পুরনো বন্ধুদের এত সহজভাবে নিজের বলে মেনে নেয়। সে এত বিরাট সৃজনী শক্তির অধিকারী, ফিল্ম নির্মাতা, গল্প লেখক, সংগীতকার ও অলৌকিক প্রতিভাধর হয়েও আমার মত সাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষকে আপনজন মনে করে। এত তার মহানতা আর গৌরবের এক বিশেষ দ্যোতক।



সত্যজিতের গ্রাফিক প্রভাব ফেলেছে



শান্তিনিকেতনের কলাভবনে সত্যজিৎ ছাত্র হিসাবে ঢুকেছিলেন একুশ বছর বয়সে। তাঁর গ্রাফিক ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য এবং চলচ্চিত্রের অদৃশ্য প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন

কে, জি, সুব্রহ্মণ্যম



• সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র

• ক্ষীরের পুতুল গ্রন্থে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবি





চেতনা তাঁর চলচ্চিত্রেও



সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে বলার সঠিক লোক আমি নই। আমি তাঁর কাজ সেরকম দেখিনি যাতে কি না একটা নির্দিষ্ট মতামত দেওয়া যায়, অন্তত তাঁর কাজ সম্পর্কে কতটা বলা উচিত বলে আমি মনে করি, সেই পরিমাণ কাজই আমার দেখা হয়নি। তাছাড়া যদিও আমরা উভয়েই পরস্পরের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানি তাহলেও ওঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও যোগাযোগ নেই। একবারই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোলপুর স্টেশনে। তাও বহুবছর আগে, আমাদের এক চেনাশোনা ব্যক্তি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎ ভিত্তি করে ব্যক্তি সত্যজিৎ সম্পর্কেও বলার কিছু থাকে না।

অবশ্য সত্যজিৎবাবু এবং আমি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে পড়েছিলাম এমন কয়েকজন শিক্ষকের কাছে যাঁদের

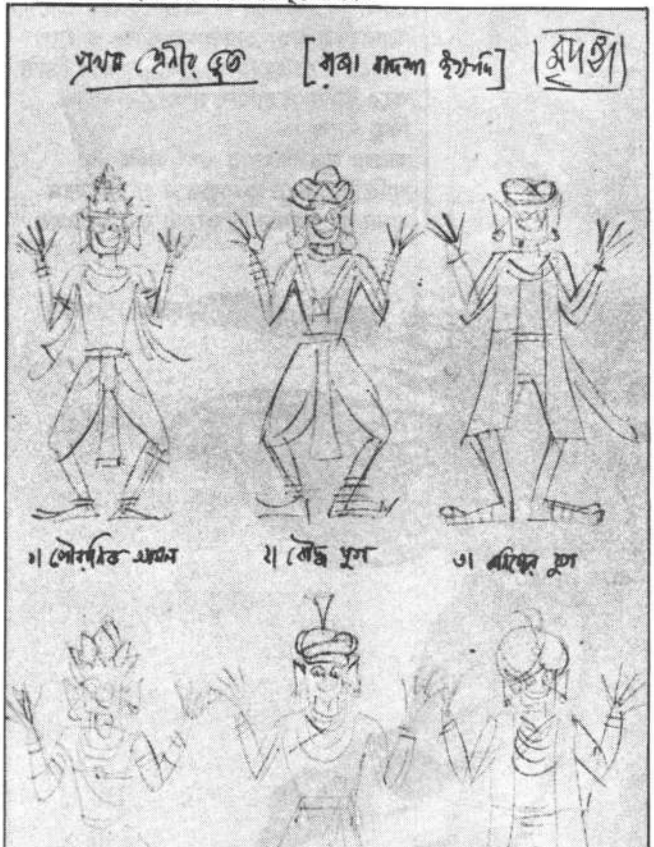
প্রতি আমরা উভয়েই ঋণী। আমরা সহপাঠী ছিলাম না। বছর কয়েকের ব্যবধান ছিল। তবে ওখানে এমনকিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হয় যাঁরা সত্যজিতের ব্যক্তিত্বের গুণমুগ্ধ ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর স্বল্পবাসেই সেই মানুষেরা সত্যজিতের বহুমুখী উৎসাহ, মনন এবং প্রতিভার পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

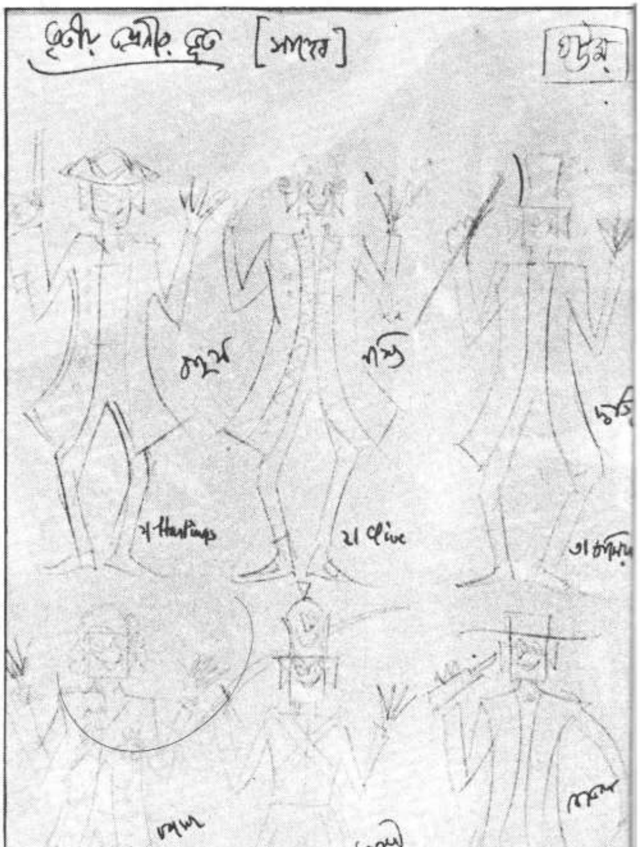
তখনকার দিনে গ্রাফিক ডিজাইন (সে সময় বলা হত কমার্শিয়াল আর্ট) নিয়ে কোনও সৃজনশীল শিল্পীই উৎসাহ বোধ করতেন না। অবশ্য যাঁদের কাছে সৃজনমূলক মৌলিক কাজের চেয়ে আর্থিক সাফল্য গুরুত্ব পেত তাঁদের কথা আলাদা। অন্যদের ধারণা ছিল গ্রাফিক ডিজাইনে গেলে সে কাজের ধারা তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতাকে সংকুচিত করবে। কল্পনা যাবে বন্দী হয়ে। তাছাড়া সে-লাইনে গেলে শিল্পী থেকে শিল্প নির্দেশক তার থেকে প্রশাসক ইত্যাদি হয়ে কেরিয়ারে সাফল্য হয়ত আসবে কিন্তু তাঁদের প্রতিভার ক্ষয় হবে। এই কথা মাথায় রাখলে সত্যজিৎবাবুর কৃতিত্ব বোঝা যায়। তিনি গ্রাফিক ডিজাইনে গেলেন, কিন্তু সেটা তাঁর ক্ষমতা ছোট করে ফেলতে পারল না। বরং গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রটিকে তিনি আরও উর্বর সমৃদ্ধ করে দিলেন। তাঁর কাজে গ্রাফিক ডিজাইনের দিগন্ত আরও প্রসারিত হল। প্রতিটি গ্রাফিক ডিজাইনের (বর্তমানে ভিসুয়াল কমিউনিকেশন-এর একটি অংশ) মধ্যেই রয়েছে একটি গ্রাফিক বার্তা, যা দর্শককে শিক্ষিত করে তোলে। এই বার্তাগুলি বিভিন্ন প্রকারের অথবা বিভিন্ন স্তরের হতে পারে।

একেবারে নিচের স্তরে একটি লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে কোনও পণ্য কিনতে প্রলুব্ধ করে। কিঞ্চিৎ ওপরের স্তরে এর তথ্য এমন গ্রহণযোগ্য আকারে পরিবেশন করে যা একই সঙ্গে বিনোদক এবং চিত্তোৎকর্ষী হয়। আরেকটু ওপরের স্তরে এটি জীবনের প্রতি দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। আরও ওপরের স্তরে এটি দর্শকের দৃশ্যগত অনুভূতি প্রবণতা বাড়ায় এবং তাকে চারপাশের জীবন এবং সাংস্কৃতিক জগতের কাছে যেতে সাহায্য করে। এ-ছাড়া এর আরও অন্যদিক তো রয়েছেই।

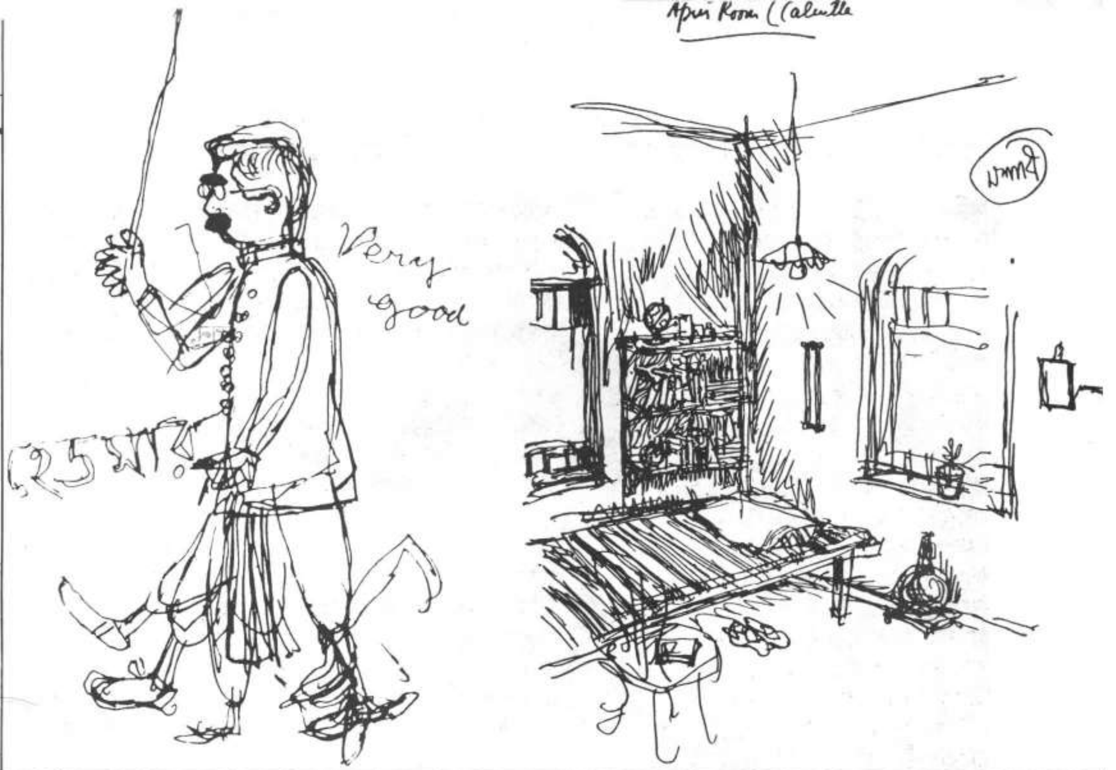
সৌভাগ্যক্রমে সত্যজিৎবাবুর সেই প্রতিভা, সেই দক্ষতা এবং বুদ্ধি ছিল যা তাঁর সামনে এই সবকটি স্তরে পৌঁছনোর পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর যেটুকু কাজ আমি দেখেছি তাতে বলতে পারি যে তিনি কোনও নিচু স্তরের প্রতি ধাবমান হননি। বরং উচ্চস্তরের কাজেই সময় দিয়েছেন। যেমন বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা বা পরবর্তীকালে তাঁর চলচ্চিত্রের কাঠামোয় গ্রাফিক কল্পনার প্রয়োগ। আর সে সবের মাধ্যমেই তিনি তাঁর দর্শককে

● 'গু-গা-বা-বা' ছবির বিভিন্ন শ্রেণীর ভূতের স্কেচ

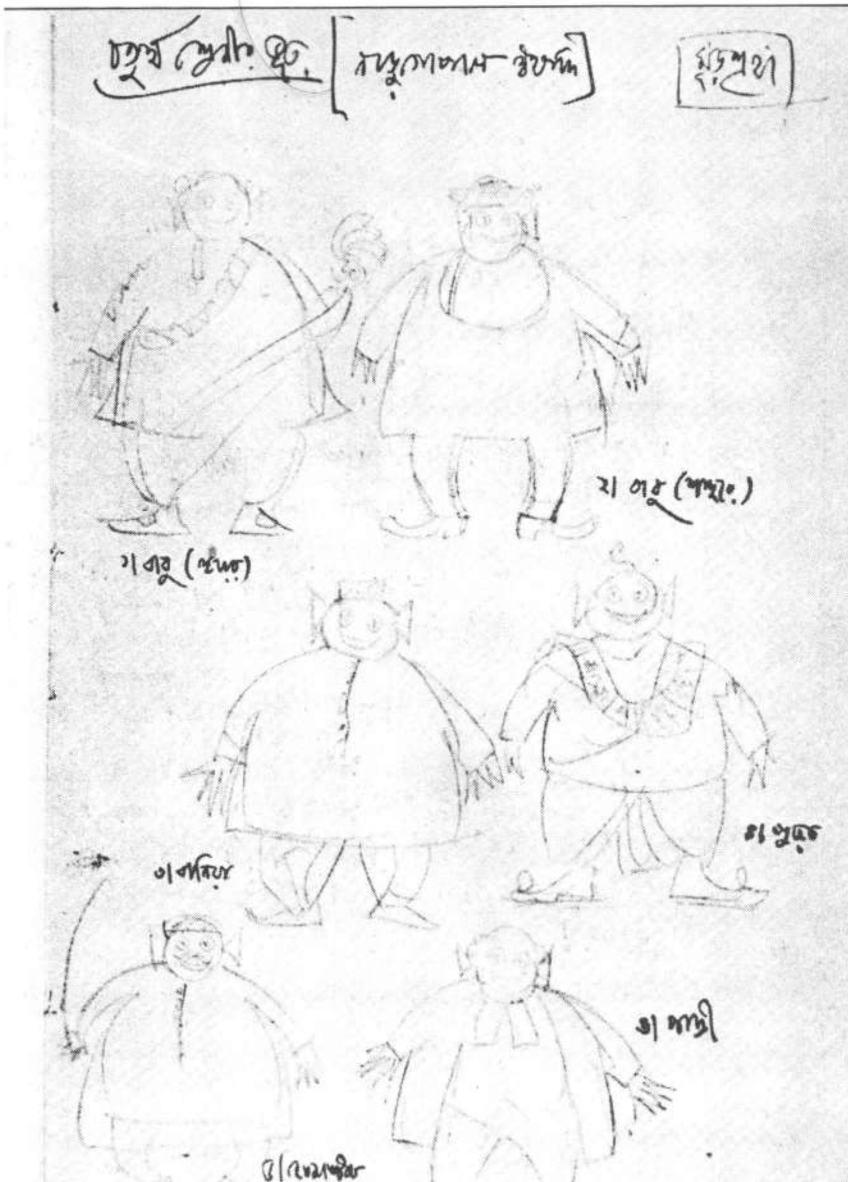




তিনি গ্রাফিক ডিজাইনে গেলেন, কিন্তু সেটা তাঁর ক্ষমতা ছোট করে ফেলতে পারল না। বরং গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রটিকে তিনি আরও উর্বর সমৃদ্ধ করে দিলেন। তাঁর কাজে গ্রাফিক ডিজাইনের দিগন্ত আরও প্রসারিত হল।

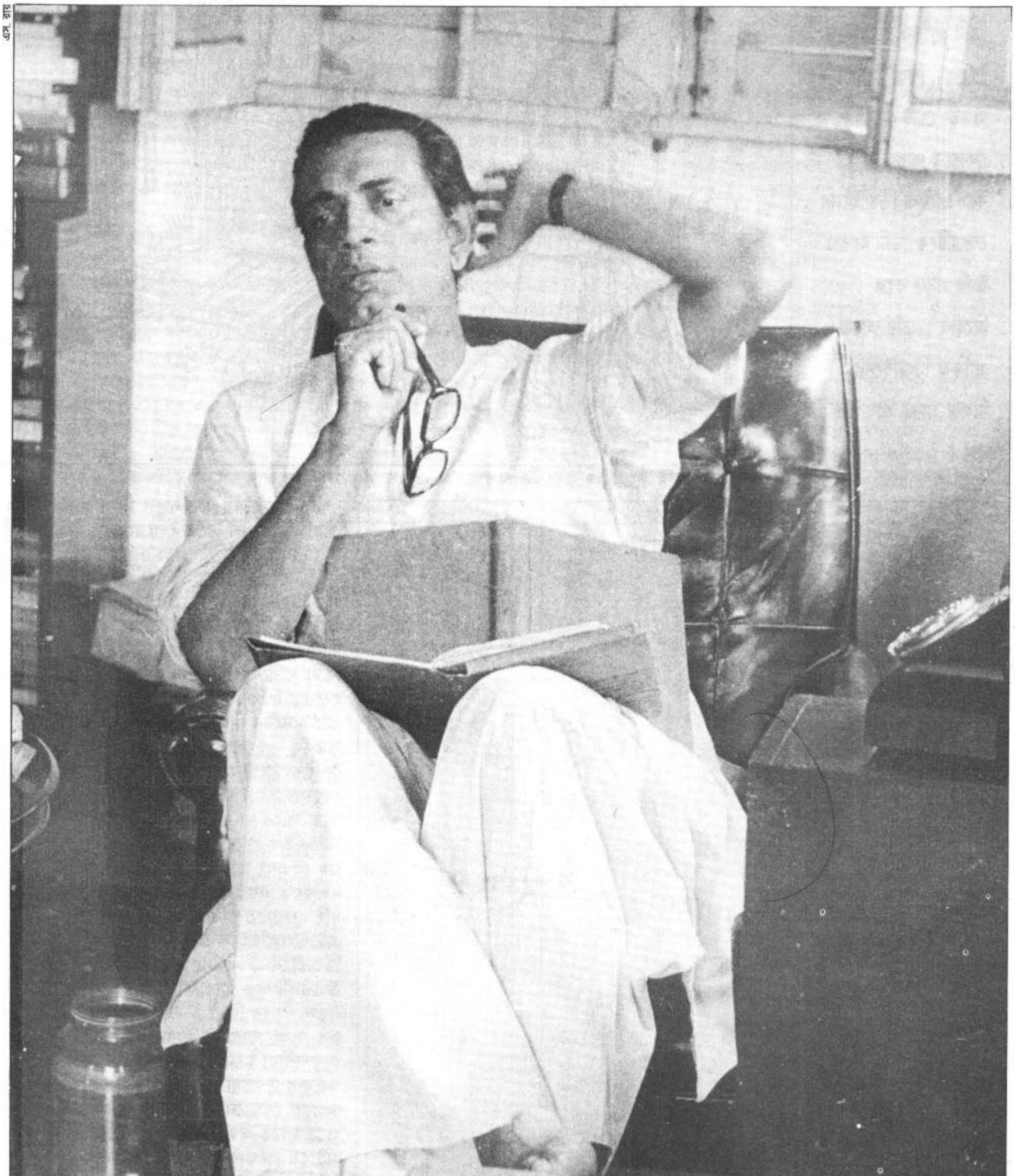


• সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত 'অপরাজিত' ছবির হেড মাস্টারমশাই-এর স্কেচ এবং কলকাতায় অপুর বাসাবাড়ির রেখাচিত্র



দৃশ্যগত কল্পনায় এক নতুন সীমা এবং শিহরণের স্পর্শ দিতে পেরেছেন। আমার মনে হয় তাঁর ক্ষেত্র নির্বাচনে শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতা খুব কাজে এসেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন 'মাস্টারমশায়' নন্দলালের কাছে তাঁর ঋণের কথা। বলেছেন কীভাবে তিনি পরিবেশের ছন্দের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন। এই শিক্ষাই তাঁর মননের দিগন্ত খুলে দেয়। এবং সম্ভবত এই শিক্ষাই তাঁর মধ্যে এক শৈল্পিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। যেমন, কোনও সংযোগই ভিত্তিগতভাবে সফল হতে পারে না যদি না তা সমাজের সাংস্কৃতিক স্তরের একেবারে মূলে প্রোথিত হয়। এবং তার মধ্যে এমন ছন্দ থাকে যা দর্শককে একই সঙ্গে সামনে এবং পিছনে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে।

এই উপলব্ধিই সত্যজিৎ রায়ের গ্রাফিক ডিজাইনে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাঁর উত্তরসূরিরাও তাঁর কাজ থেকে পেয়েছেন নতুন পথের দিশা। তার আগে যা কাজ হত, সবই পাশ্চাত্য ধারার। এই ধারার অনুসারীরা মনে করতেন যে এই ধারার কাজের উপযোগিতা রয়েছে বিজ্ঞাপনের জগতে যেখানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে মূলত স্বপ্ন। তাঁদের অভিমত ছিল এই যে পাশ্চাত্য ভাবধারা ভবিষ্যৎ দেখে, প্রগতির অভীপ্সা জাগায়। এই মতানুসারীদের ভ্রান্তিবিলাস বা বিপদ যাই হোকনা কেন তা অবশ্য গুরুগম্ভীর সংযোগের প্রবক্তাদের মধ্যেও বিদ্যমান। বাহ্যত সত্যজিৎ বাবুও তাঁদের একজন। তাঁর গ্রাফিক ডিজাইন এবং চলচ্চিত্র



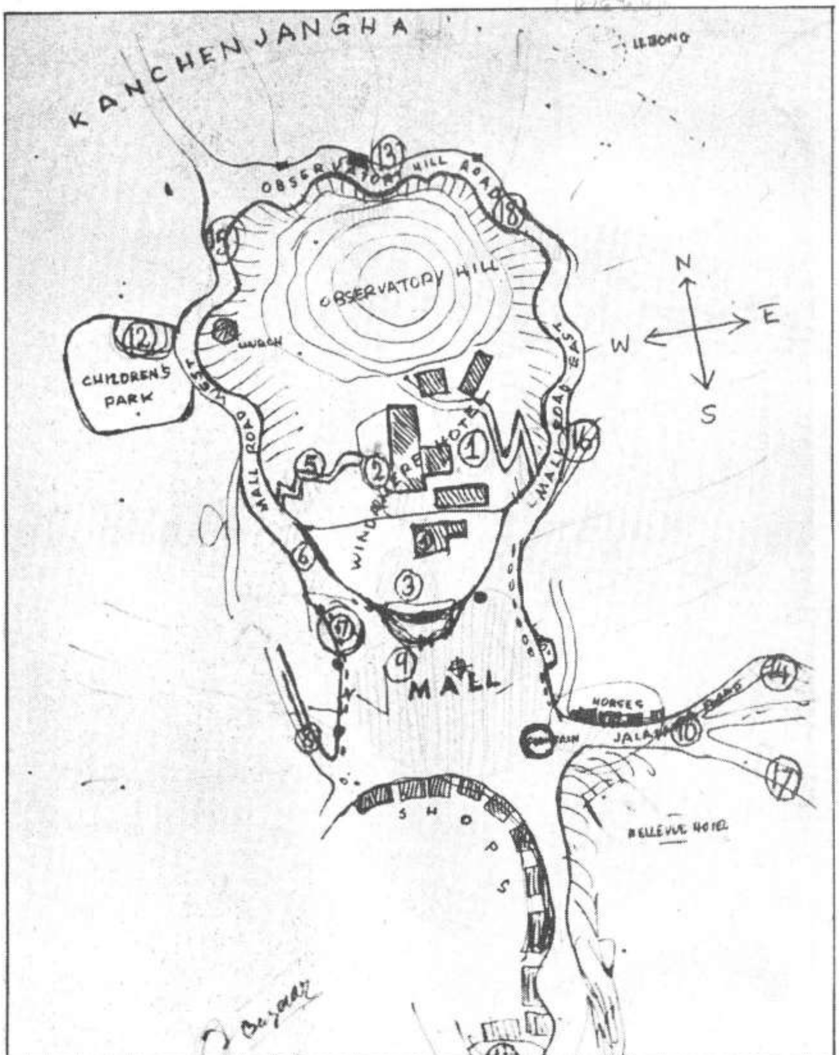
এস. রায়

উভয়ই আমাদের সংস্কৃতির এই নতুন দর্শনের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে। আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে যেন এক মৌলিক ভাবনার প্রকাশ অথবা যেন এক আত্মানুসন্ধান।

সত্যজিৎবাবুর গ্রাফিকের কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে তাঁর শিল্পশিক্ষায় শান্তিনিকেতনের প্রভাব অতি অল্প। এবং এও বলেন যে শান্তিনিকেতনী শিল্প ভাবনায় তাঁর উৎসাহ তেমন ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি স্বভাবজ দক্ষতা নেই এমন কোনও ছাত্র কোনও শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করতে আসে না। কলাভবনও ছাত্রদের কাছে বরাবর এই ক্ষমতার আশা করেছে। কলাভবন কখনও গ্রাফিক সম্পর্কে নির্দিষ্ট, সুগঠিত শিক্ষাক্রমে ছাত্রদের শেখায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলাভবন তার ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পেরেছে, চারপাশ সম্পর্কে একটা নতুন স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছে।



● 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির স্কেচ



● 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির জন্য সত্যজিৎ রায়-কৃত দার্জিলিঙ-এর ম্যাপ

সত্যজিৎবাবু নিজেও একাধিকবার সে-কথা স্বীকার করেছেন। বেশি কথা কি, সত্যজিৎবাবুর গ্রাফিক কাজকর্ম ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় তিনি নন্দলাল বা বিনোদবিহারীর কাজের কাছে কতটা ঋণী। তা যে তাঁর তুলির টানেই হোক বা সাদা-কালোর ব্যবহারেই হোক বা তাঁর পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার দক্ষতাতেই হোক। সন্দেহ নেই, কলাভবনের শিক্ষা তাঁর নিজের ক্ষমতায় অন্য মাত্রা পেয়েছে। যেমন স্বীকার করতে বাধা নেই কলাভবনের প্রভাবমুক্ত হয়েও তিনি তাঁর আঁকায় ভিন্ন ভিন্ন শৈল্পিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবু এ-কথা সত্য যে তাঁর পূর্বসূরীদের কাজের থেকে সত্যজিৎবাবুর কাজের যে উৎকর্ষ তার অনেকটাই শান্তিনিকেতন-প্রভাবিত।

যখন ছাত্র হিসেবে শান্তিনিকেতন যাই তখন অন্য অনেকের মত আমিও 'সহজ পাঠ'-এ মাস্টারমশায়ের আঁকা উৎসাহের সঙ্গে অনুধাবন করি। সে-সব আঁকা, বইয়ের চমৎকার লেখার কাছে গৌণ হয়ে পড়েনি। আঁকা আর লেখা যেন পরস্পরের পরিপূরক ছিল। একটা ভাবনা বা বিষয় পরিস্ফুটনে অঙ্কন যে কোন উঁচু পর্যায়ে যেতে পারে সেগুলি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আঁকা যে কত রোমান্টিক হতে পারে রহস্যময় হতে পারে, কতভাবে নিজের পথ-অনুসারী হতে পারে, কত প্রকাশমান হতে পারে, সে-সব আঁকার অলো-ছায়ার ব্যবহারে তা বোঝা যায়। সত্যজিৎবাবুর সব আঁকা সেই পর্যায়ের নয়। তবে অতি অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ কিছু কাজ সেই পর্যায়ের। যখন আমি তাঁর অঙ্কিত 'হাতে খড়ি' দেখি তখন সেই মুহূর্তেই আমার মনে হয় এমন একজনের কাজ দেখলাম যিনি শুরু করেছেন সেই জায়গা থেকে যেখানে নন্দলাল শেষ করছেন তাঁর কাজ।

এ-কথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে গ্রাফিক ডিজাইনে তাঁর দশ বছরের কর্মকালে সত্যজিৎ এ-দেশে বইয়ের প্রচ্ছদে এবং আঁকায়, ছাপার হরফে, পৃষ্ঠাসজ্জায় এক শীলিত এবং বিশেষ দেশজ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। এ-কথাও কেউ অস্বীকার করবেন না যে তাঁর গ্রাফিক চেতনা তাঁর চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ এবং কখনও বা খণ্ডভাবে প্রভাব ফেলেছে। যদ্দূর মনে পড়ছে সত্যজিৎবাবুর ওপর বেনেগালের তথ্যচিত্রে প্রশ্নোত্তরকালে সত্যজিৎবাবু নিজেই এ-কথা স্বীকার করেছেন।



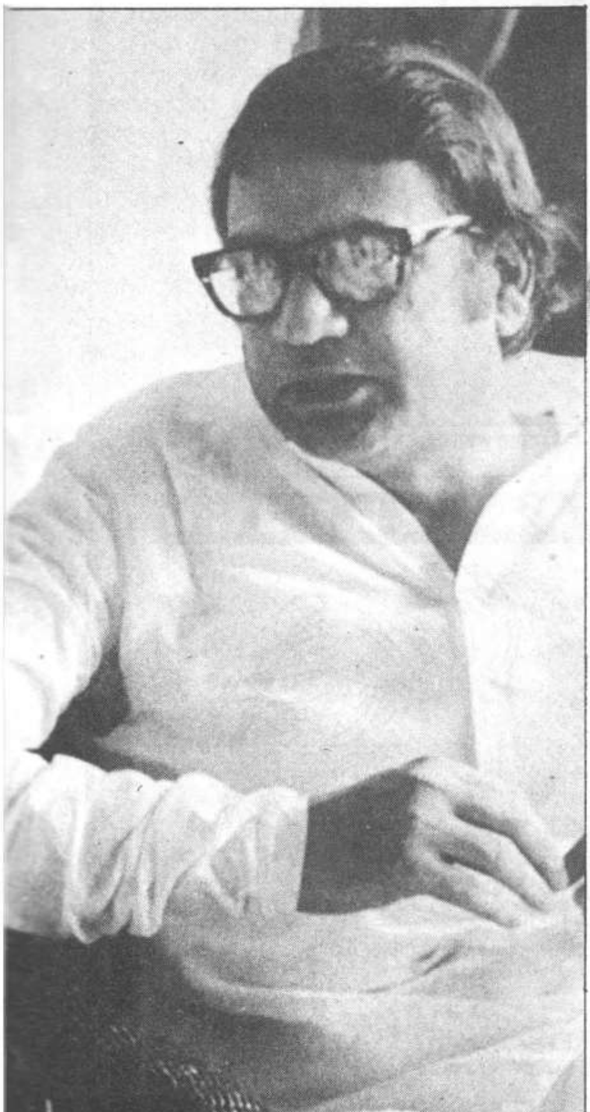
মানিক অন্য স্তরের



• সত্যজিৎ ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় : একান্তে, আলাপচারিতায়

সত্যজিৎ রায়কে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। চেনার কারণও আছে। আমরা দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আর তাছাড়া সত্যজিৎ রায় যাঁকে বিবাহ করল, সেই বিজয়া দাশ আমার মায়ের মাসতুতো বোন। বিজয়া দাশ-আমার মংকু মাসি। সেই অর্থে সত্যজিত অর্থাৎ মানিক একদিক দিয়ে যেমন আমার বন্ধু, তেমনি অন্যদিকে আমার মেসোমশায়ও বটে।
আমার বয়স যখন সাত-আট বছর। আমি তখন পড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে এবং আর সত্যজিৎ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। তখন ওরা আমাদের বাড়ির পশ্চিমের ডানদিকে বেলতলা রোডের সাদা বাড়িটায় থাকত। তাই রোজ স্কুল থেকে ফিরে আমরা সকলে একজায়গায় জড়ো হতাম। ওখানে গল্পের বই পড়া হত, আড্ডা হত। তাছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলা হত। এই খেলায় পাড়ার ছেলেরাও আসত। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মানিকের খুব ভাল আলাপও ছিল। পচ্ছন্দও করত ও সকলকে। বলতে গেলে, আমরা একসঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছি।
এরপর স্কুল জীবন শেষ হলে, মানিক গেল প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমিও ভর্তি হলাম একই কলেজে। কিন্তু আমার ছিল আর্টস, কথা হত না খুব একটা। তবে সকাল-সন্ধে দেখা হত দুজনের।
সত্যজিৎ কিন্তু ছোট থেকেই একটা রিফ্লেক্টিভ মুডে থাকত। খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করত। মাঝে-মধ্যেই ও অন্যমনস্ক হয়ে যেত। ও একটা অন্যস্তরের মানুষ ছিল। যেমন, ছোটবেলায় আমরা যে স্তরে চিন্তাভাবনা করে খেলাধুলো করতাম, ও কিন্তু সে স্তরে চিন্তা করত না। ওর একটা আলাদা

মানুষ ছিল



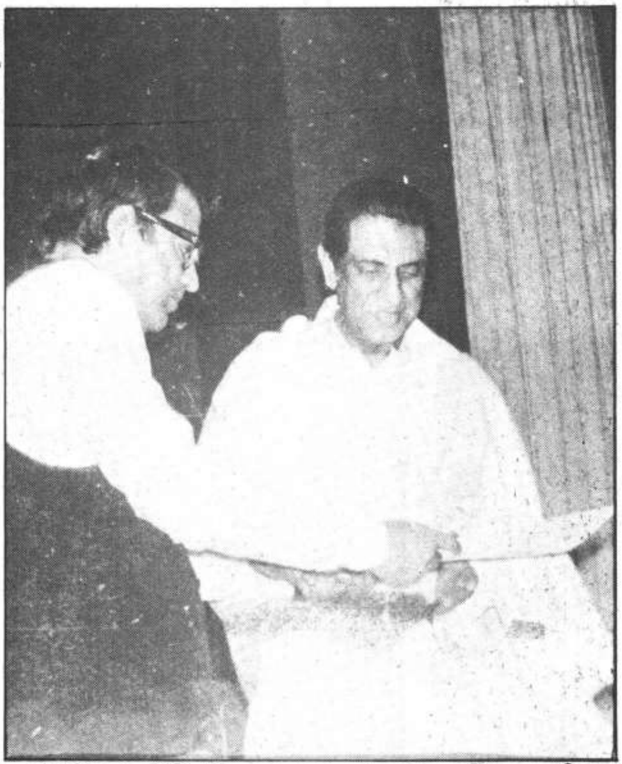


সত্যজিতের বাল্যবন্ধু এবং আত্মীয় **সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের** স্মৃতিচারণে রয়েছে সত্যজিতের সোনালী অতীত।

ইমাজিনেশন ছিল। ওর একটা স্বপ্ন ছিল। ওর মানসিক স্তরটা ছিল ভিন্ন। তারপর সত্যজিৎ চলে গেল শান্তিনিকেতন। ওখানে আমি একবার যাই সেইসময়। বহুদিন বাদে মানিকের সঙ্গে দেখা হল। তখন রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। প্রমথ চৌধুরী ওখানে ছিলেন। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে আমি আন্ডার সেক্রেটারি ছিলাম। ওই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে একটা ডেলিগেশন নিয়ে যাই শান্তিনিকেতনে। ছাত্র নেতা সুনীল সেন ছিলেন আমাদের নেতা ওই ডেলিগেশনের। আমরা গিয়েছিলাম প্রমথ চৌধুরীকে একটা সম্মান পত্র দিতে। সেইসময় আমরা দিন দশেক ছিলাম। তখন মানিকও ছিল শান্তিনিকেতনে, পড়াশুনো করছিল ওইখানে। বেশ কয়েকদিন জমিয়ে আড্ডা মারলাম মানিকের সঙ্গে। সেটাই ছিল ছাত্রজীবনের শেষ আড্ডা। তারপর তো আমি চলে গেলাম বিদেশে। মানিক জয়েন করল একটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোম্পানিতে। তবে আমি ওকে দেখেছি থেকে থেকে। ওর 'পথের পাঁচালী' রিলিজ করার পর ছবিটা আমি দেখি। তখন মানিকের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমি ব্যস্ত ছিলাম আইন নিয়ে—যাকে বলে স্ট্রাগলিং ব্যারিস্টার। কোনও রকমে জলের ওপর নাকটি রাখার চেষ্টা করছি। আর সত্যজিৎ তখন স্ট্রাগলিং ডিরেক্টর।

সেই সময় টাকা পয়সার খুব অভাব হয় মানিকের। তখন মন্টু মাসি তাঁর গয়নাপত্র বিক্রি করে দেয়। এই ব্যাপারটা আমি শুনেছিলাম। কেননা, সরকার যতটা টাকা দেবে বলেছিল ততটা দিতে পারেনি। যাইহোক করে ছবিটা শেষ হয়। এবং মুক্তিও পায় ছবিটা। ছবি

দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম মানিককে। চিঠিটায় মাত্র একটি লাইন ছিল—মাই ডিয়ার মানিক, ইউ উইল লিড ফর এভার। তারপর আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলাম, তখন আমরা ঠিক করলাম সরকার থেকে সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে একটা ছবি করার। সত্যজিৎ রায়কে জানালাম সবকিছু। ও ঠিক করল 'সোনার কেল্লা' করবে। আমি বললাম ওকে তুমি যা কিছু করতে পার। খুব অল্প টাকায় ছবিটি ও শেষ করল। আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় পাঁচ লাখ টাকারও কমে ছবিটা ও করেছিল। ছোটদের জন্য ছবিটা করেছিল মানিক। এরপর আমি পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে গেলাম দিল্লি। সেইসময় ইন্দিরা গান্ধিকে বললাম, তোমার সঙ্গে সত্যজিতের একটা ভাল সম্পর্ক হওয়া উচিত। যদিও



• তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়

ইন্দিরার সঙ্গে মানিকের চেনাজানা ছিল। তখন ইন্দিরা আমাকে বলল, 'ঠিক আছে তুমি সত্যজিৎ আর তাঁর স্ত্রীকে দিল্লিতে নিয়ে এস। এবং এখানে আমি 'অশনি সংকেত' ছবিটা দেখানোর ব্যবস্থা করব।' তাই হল, আমি মানিক আর মংকু মাসিকে নিয়ে এলাম দিল্লিতে। আমি সেইসময় ২ সার্কুলার রোডে থাকতাম। ওইখানেই ওরা রইল। এরপর ইন্দিরা ঠিক করল প্রথমে খাওয়া হবে, তারপর ছবি দেখা হবে। তখন আমি বললাম, না-না তা হয় না। আগে ছবি দেখা হবে, পরে খাওয়া-দাওয়া। ইন্দিরা বলল 'হ্যাঁ। ঠিক আছে তাই হবে। বিদেশেও তাই হয়'। ইন্দিরা এটা খুব বড় ভাবে করেছিল। অনেককে নিমন্ত্রণ করেছিল ইন্দিরা। ছবি দেখানোর সময় বেশ একটা মজা হয়েছিল। ইন্দিরা

যেখানে বসেছিল তার ডানদিকে সত্যজিৎ আর বাঁদিকে আমি। আমরা দুজনেই খুব লম্বা। ইন্দিরা মাঝখানে। এই দৃশ্য দেখে প্রায় সকলেই বলতে লাগলেন 'ইন্দিরা গান্ধি দু'জন লম্বা লম্বা বাঙালিকে নিয়ে সিনেমা দেখছেন।' খুব হাসি-ঠাট্টা

মানিক এত দিনের বন্ধু আর আমার থেকে অনেক ছোট, ও যে আমার আগে যাবে, তা আমি ধারণাই করতে পারিনি।



• সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিজয়া রায় ও সত্যজিৎ রায়

হয়েছিল ছবি দেখার পর। এবং ইন্দিরা গান্ধির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াও হল। অনেক কথাবার্তা হল ইন্দিরা গান্ধি আর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। আমিও ছিলাম সেখানে। ইন্দিরা গান্ধি ছিল গ্রেট লাভার অফ আর্ট। তাই মানিককেও খুব শ্রদ্ধাভক্তি করত ইন্দিরা। এবং মানিকের শিল্পকে খুব পচ্ছন্দও করত। সত্যজিৎ রায়ের নাম প্রায়ই করত ইন্দিরা। আমি চোদ্দো বছর কলকাতায় ছিলাম না। তাই যোগাযোগটাও তেমন ছিল না। তবে মাঝে দেখা হত। যেমন, পাঞ্জাবের রাজ্যপাল থাকাকালীন সময়ে একবার এসেছিলাম। মানিকের জন্য কিছু জিনিসপত্র এনেছিলাম। সেগুলো একদিন দিতে গেলাম ওর বাড়িতে, আমি আর আমার স্ত্রী মায়া। আমার একটা কথা এখনও মনে পড়ে। যখন শান্তিনিকেতনে আমি গিয়েছিলাম, তখন শ্রীনিকেতন থেকে একটা অটোগ্রাফ খাতা কিনেছিলাম। সেই খাতাতে কলাভবনের অনেকেই ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এঁকে দিয়েছিলেন ছবি। সত্যজিৎ রায় এঁকে দিয়েছিল আমার ছবি। সেটি এখনও সযত্নে আমার কাছে রয়েছে। সত্যজিতের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, প্রচুর পড়াশুনো করত। চিন্তাভাবনা করত। আর এক্সপেরিমেন্টেশন খুব পচ্ছন্দ করত মানিক। ওর যে ইনটেলেকট ছিল, সেটা খুব উঁচু স্তরের। মানিক যে হোরাইজনে ছিল সেখানে সাধারণ মানুষের ঢোকার সাধ্য নেই। মানিকের সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার ছিল—ও মনেপ্রাণে প্রচন্ড বাঙালি ছিল। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, আচার ব্যবহারে, সবকিছুতেই বাঙালিয়ানা ছিল দেখবার মতো। মানিক ছিল সত্যিই বাঙালি-যে বাঙলা পড়ত, যে বাঙলা লিখত, যে বাঙলা চিন্তা-ভাবনা করত বাঙলায় কথা বলত। হি ইজ অ্যা সিটিজেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট হি ইজ অ্যা গ্রেট বেঙ্গলি। মানিক এতও দিনের বন্ধু আর আমার থেকে অনেক ছোট, ও যে আমার আগে যাবে, তা আমি ধারণাই করতে পারিনি।



কলকাতায় ফিল্ম এবং সত্যজিৎ

চলচ্চিত্রের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহ কবে থেকে ? কেমন করে তাঁরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ? সেদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু **কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ** বলেছেন সেই সব দিনের কথা ।

বোধহয় সেটা ১৯৪৭ সালের শেষ অথবা ১৯৪৮ সালের প্রথম, আমাদের হাতে বিদেশী ফিল্ম সংক্রান্ত একটা বই এল । পেঙ্গুইনের পাবলিকেশন । লেখক রজার ম্যানভেল । বইটির নাম 'ফিল্ম' । বইটি প্রথম বেরোয় ১৯৪৪ সালে । আমাদের হাতে আসে ৪৬-এর রিভাইজড এ্যান্ড এনলার্জড তৃতীয় সংস্করণটি । সে বইটি পড়াও এক



রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । শেষের দিকে একটি পরিচ্ছেদ ছিল 'হোয়াই নট স্টার্ট এ ফিলম সোসাইটি?' লেখাটির শুরু 'দেয়ার ইজ নো রিজন হোয়াই নট' । তারপর ফিলম সোসাইটি আন্দোলন গড়ে তোলা কি ভাবে 'সম্ভব', কি কি প্রয়োজন এবং তার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর ।

সেই সময় কলকাতায় 'আদার ফিলম' সম্পর্কে একটা কৌতূহলের হাওয়া সবে বইতে শুরু করেছে নব্যভাবনার যুবকদের মধ্যে । আর্টিকেলটা পড়ার পরই আমি আর মনোজেন্দু মজুমদার (আমরা দুজনেই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বন্ধু) সোজা চলে গেলুম চিদু অর্থাৎ চিদানন্দ দাশগুপ্তর পণ্ডিতিয়া প্লেসের বাড়িতে । তাকে বইটা দেখাতেই সে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল । আমাদের নিয়ে গেল সত্যজিতের বাড়ি । সত্যজিৎ তখন ট্রাঙ্গুলার পার্কের পেছন দিকে রাসবিহারী এ্যাভিনিউর ওপর মামার বাড়িতে থাকে । পাশের বাড়িতেই থাকতেন সদ্য প্রয়াত অশোকানন্দ দাশ । যিনি মানিকের পিসতুতো দিদি নলিনী চক্রবর্তীকে বিবাহ



• ১৯৫০ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সভায় জাঁ রেনোয়া

সোসাইটি



করেছিলেন। এখন যেখানে 'সন্দেশ' পত্রিকার অফিস। অশোকানন্দ দাশ যে কবি জীবনানন্দর দাদা একথা বোধহয় না বললেও চলে। সেই আমাদের সত্যজিতের সঙ্গে আলাপ। চিদানন্দ আর সত্যজিৎ তখন খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজনেই ডি জে কিমারে চাকরি করে।

তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফিলম সোসাইটি আন্দোলন যে দানা বাঁধছে, এ'খবর সত্যজিৎ রাখে সেটা তাদের কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল। ফলে লেখাটা হাতে পড়তেই তার একটা রূপরেখা তৈরি হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

সেই সত্যজিতের বাড়ি আমাদের যাতায়াত শুরু ফিলম ভাবনা ছাড়াও তার আর একটা বড় কারণ ছিল বিদেশী মিউজিক শোনা। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে ওর অসম্ভব আকর্ষণ ছিল এবং দখলও ছিল। মোৎসার্ট, বেঠোফেন থেকে শুরু করে এমন কোন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত ছিল না, যা ওর সংগ্রহে ছিল না। পাশাপাশি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত।

তার এই অহোরাত্রের সঙ্গীত প্রেম কীরকম ছিল, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে।

তখন আমাদের হৃদ্যতা বেশ গড়ে উঠেছে। ওকে ডাকতে গিয়েছি কী ফোন করেছি, দেখা যেত ও শিস দিতে দিতে এসে দরজা খুলে দিচ্ছে বা ফোন ধরছে। আসলে ও সব কাজের মধ্যেও সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে থাকত।

যাই হোক, ওই চাপ্টারটা পড়ার পরই ব্যাপারটা দানা বাঁধল। তখনই ফিলম সোসাইটি গড়ে উঠল না ঠিকই, তবে অদৃশ্যভাবে তার একটা তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। খোঁজ খবর নেওয়া, আলোচনা এগুতে লাগল। কোন মহৎ উদ্দেশ্যের মাথায় একটা বড় মাপের মানুষ থাকলে লোকে সেটাকে গুরুত্ব দেয় আবার অনেক কাজ সহজও হয়ে যায়। তাই আমরা হাবুলদা অর্থাৎ বিখ্যাত হিরণকুমার সান্যাল মশাইকে গিয়ে পাকড়ালুম। তাঁর তখন বাঘা বাঘা ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা। ইনফ্লুয়েন্সও খুব।

তারপর সত্যি সত্যি একদিন

স্বপ্ন দেখতে শুরু করলুম ফিলম সোসাইটি গড়ার ব্রিটিশ ফিলম ইন্সটিট্যুট, আমেরিকান এমব্যসী, স্থানীয় ইংরিজি ছবির ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে ছবি এনে, প্রজেকটার জোগাড় করে নব্যভাবনার উৎসাহীদের মধ্যে ছবি দেখানো শুরু হয়ে গেল। সেও এক অভিজ্ঞতা। তখন কোন হল দূরে থাক, একটা পাকাপোক্ত ঠাঁই পর্যন্ত নেই যেখানে ছবি দেখানো যেতে পারে। কোন বাড়িওলাই রাজি হয়না। (পরের দিকে 'ভবানী' সিনেমা হল অবশ্য মাঝে মধ্যে পাওয়া যেত। সে আবার অন্য কাহিনী) উল্টে ফিলম দেখানো হবে শুনলেই তাড়া করে। আমাদের চাল চুলো নেই, অফিস-টাপিস তো দূর-অস্ত। সবটাই এলোমেলো। একবার কবি জীবনানন্দ দাশের বাড়িতে ফিলম দেখানোর একটা ব্যবস্থা হল। শুনেই বাড়িওলা তেড়ে এল। সে কি কান্ড! তবু তার মধ্যেই ছবি দেখানো চলতে লাগল এখানে ওখানে।

: প্রথম কোন ছবি এবং কোথায় দেখানো হয়?

: 'দ্য গ্রেট ওয়াল্জ'। একজন বিখ্যাত জার্মান মিউজিশিয়ানের ওয়ার্কস এর ওপর। বহু জায়গা খোঁজার পর শেষে সত্যজিতের বাড়িতেই ছবিটা দেখানো হয়। ওদের বাড়িতে ছোট মত একটা হল ছিল, সেখানে। সেও বেশ থ্রিলিং ব্যাপার। পোস্টকার্ড কিনে তাতে টাইপ করে উৎসাহীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেদিন। তখন তো এই রুচির দর্শকও কম ছিল। প্রথম প্রথম তাই খুব একটা ভীড়ও হত না। এই ছবি দেখানো নিয়েও আবার কত মজা হয়ে গেছে। একবার, বিখ্যাত পল জিলসের ডকুমেন্টারী ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ৩৫ মি মির ছবি। চারুবাবুর প্রজেকটার। কিন্তু সেটা চালু হতেই প্রচন্ডভাবে বাড়ি কাঁপতে শুরু করে দিল। আসল ব্যাপার, অত লোড প্রজেকটার বোধহয় টানতে পারছিল না। কিন্তু আমরা কি সে সব জানি, না বুঝি! মেশিন চালানো তো দূরের কথা। আর একবার। আজকের বেলভেডিয়ারের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর হল ঘরের কাঠের ফ্লোরে (অর্থাৎ ছোট লাটের আমলের বলরুম) ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ছবির নাম 'লে ভিজিটর্স দ্য সোয়ার'। ১৬ মি মি-র ছবি। সেন্ট জেভিয়ার্সের পাদ্রীরা প্রজেকটার দিয়েছেন। কিন্তু চালাবে কে? শেষ পর্যন্ত ওঁদের অপারেটারকে ধরা হল। কিন্তু তার বিচিত্র সংস্কার। সেখানে ডেভিল আছে। মেশিন চালাতে গেলেই ফ্রেমের মধ্যে সেই ডেভিলের মুখ ভেসে উঠবে। অতএব শেষ পর্যন্ত সেখানে আর ছবি দেখানোই সম্ভব হল না। এই ছবি দেখা বা দেখানো নিয়ে আমাদের অভিঙ্গতাও কম হয়নি। যেমন একবার পার্ক স্ট্রীটের আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির (এখন যেখানে এ্যাপিজে হাউস) ভাঙ্গাবাড়ির অপরিসর একটা ঘরে সামান্য কয়েকজন উৎসাহীর সামনে ছবি দেখানো হয়েছিল।

: বোধহয় সেবারই প্রথম আইজেন স্টাইনের বিশ্ব বিখ্যাত ছবি 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' দেখানো হয়। এবং সেটাই প্রথম ভারতেও। চিন্মোহন শেহানবিশ তাই লিখেছেন।

: হতে পারে।

: কিন্তু সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, একটা খালি বা পরিত্যক্ত গ্যারেজে প্রথম ছবিটা দেখানো হয়। তবে ঠিকানা নেই। অবশ্য ততদিনে ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সেটা বোধহয় ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে। আর ছবিটি পাওয়ার ব্যাপারটা চিদানন্দবাবু চমকপ্রদভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখায়। সত্যি সত্যি 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' যেদিন ডাকযোগে আমাদের দরজায় এসে পৌঁছল, সেদিন সেকী উত্তেজনা আমাদের মধ্যে। কার দায়িত্বে সেটা থাকবে তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে গেল।

: হ্যাঁ। খুব ঠিক কথা। তবে তারও একটা ভূমিকা আছে। রজার ম্যানভেলের 'ফিলম' বইটি পড়েই, আমরা প্রথম 'প্রোটেমকিন' ছবিটার কথা পড়ি এবং রোমাঞ্চিত হই। বিশেষ করে ছমিনিট ব্যাপী 'ওডেসা স্টেপস.সিকোয়েন্সটা পড়ে। সেই ভিত্তিতেই খোঁজখবর করে ব্রিটেনের ব্রিটিশ ফিলম ইন্সটিট্যুটের লাইব্রেরী ইনচার্জ আর্নেস্ট লিন্ডগ্রেনের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করি। চিঠিপত্র মূলত আমিই লিখতাম। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যি সত্যি আমাদের আবেদন মঞ্জুর হয়ে চিঠি এলো। এই প্রসঙ্গে কি শর্তে ছবির একটা ১৬ মিমি কপি পেলাম সেটাও জানাই---'অন এ পার্মানেন্ট লোন বেসিস'।

: সত্যজিৎবাবু যাকে বলেছেন 'এ্যাট নো কষ্ট এ্যাট অল।

: ঐ একই কথা। হুইচ মিনস দ্যাট উই ওয়্যার সাপোসড় টু পে লেটার, বাট ডিড নট।

: অবশ্য বিখ্যাত ইকনমিস্ট লেখক অশোক মিত্র'র একটা লেখায় পাওয়া যায়, ব্যাটেলশিপ ১৯৫০-৫১তে ভাড়া পাওয়া যেত ৫০ টাকায়। তিনি তখন সদ্যই লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সেই সময় সেখানকার কিছু অধ্যাপকের উৎসাহে ওর প্রিন্টটি নিয়ে ছিলেন।

: সেটা মূখ্যত ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটির ফান্ড তোলা, বইপত্র কেনা, প্রিন্ট ঠিক রাখা, নানা কারণে নিতে হত। এই প্রসঙ্গে জানাই, সোসাইটির গোড়ার দিকে সত্যজিৎ বহু মূল্যবান বই দিয়ে লাইব্রেরী করতে সাহায্য করেছিল সোসাইটিকে।

: এই প্রিন্টটা নাকি একবার রহস্যজনকভাবে হারিয়েও গিয়েছিল?

: হ্যাঁ। এবং ওই রহস্য বা রোমহর্ষকভাবেই সেটা আবার উদ্ধারও হয়েছিল। সেই সময় অতি সন্তর্পণে অর্থাৎ গোপনে তার প্রদর্শনীও হয়েছিল বলে আমাদের কাছে খবর আসে। কিন্তু সে ব্যাপারটা খোলাখুলি বলা



• ১৯৫৬ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির দ্বিতীয় সারির বাঁদিকে সত্যজিৎ

উচিত হবে না। তবে আমরাই যে 'পোটেমকিন' এনে এবং দেখে ও দেখিয়ে ভারতে প্রথম সিনে সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রপাত করি, এতে কোন দ্বিমত নেই।

: কিন্তু আমি যদি বলি আপনাদের বহু আগে স্বয়ং আইজেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ মস্কো আছেন জেনে তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর ছবিটি দেখতে এবং ১৫ সেপ্টম্বর ১৯৩০ আইজেনস্টাইন দম্পতির সঙ্গে বসে তিনি

ছবিটি দেখেন।
সেটা তো ঐতিহাসিক সত্য।
: যাই হোক সেসময় আপনাদের ছবি দেখার আরও কিছু স্মরণীয় ঘটনার কথা বলুন।
: কত স্মৃতিই তো আছে। যেমন ধরুন, বিদেশী ছবি ছাড়াও, এদেশে থেকে বিদেশী মানুষের তোলা মূল্যবান এবং অভাবনীয় ডকুমেন্টারী ছবিও আমরা দেখেছি। বিখ্যাত এ্যানথ্রোপলজিস্ট ভেরিয়ের এলুইন ট্রাইবাল বিশারদ ছিলেন। সেকালের নাগাদের নিয়ে (তারা তখনও একরকমের আদিমই ছিল)



সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন মারী সিটন

তাঁর তোলা দু:সাহসিক ডকুমেন্টারী দেখার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও আমাদের হয়েছে। ততদিনে সত্যজিৎকে মধ্যমণি করে ক্যালকাটা ফিলম সোসাইটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্য সক্রিয় কর্মী আমি ছাড়া মনোজেন্দু এবং চিদানন্দ। আর সদস্য বলতে বড় জোড় ডজন খানেক।
: 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই সময়কার দর্শক আজও রোমন্থন করেন। আপনাদের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
: 'সে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বোধহয় সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। সেই ছবি দেখার পর সিনেমার মিডিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারনাই পাল্টে গেল। ম্যানভেলের বইতে বিস্তৃত আলোচনা পড়েই আমাদের মধ্যে ছবিটা দেখার আগ্রহ তীব্র হয়েছিল। দেখার পর সেটা আরও বেড়ে গেল। ভ্যাকুলিনচুক-এর মৃত্যু দৃশ্যটি সত্যজিৎকে তখন খুবই প্রভাবিত করেছিল। এ কথা সে নিজেই লিখেছে।
: বহুবার দেখা সেই নির্বাক ছবিতে একবার প্রদর্শনীর সময় সত্যজিৎ তাতে খুব ভেবেচিন্তে পরীক্ষামূলকভাবে সিবেলিয়াস-কৃত সিম্ফনীও ব্যবহার করেছিলেন এবং তাতে তিনি সার্থকও হয়েছিলেন। সত্যজিৎ লিখেছেন ইট ইকোড দ্য মুড অফ দ্য ফিলম ইট ওয়াজ এ্যান অকেশন দ্যাট আই ওয়াজ প্রাউড বিকজ দ্য এক্সপেরিমেন্ট ওয়ার্কড।
: হ্যাঁ। সেটা আমিও পড়েছি। আসলে মানিক ছবিটা যেমন বহুবার দেখেছে, তেমনি নানা চিন্তাভাবনাও করেছে তাকে নিয়ে। সেগেঁই আইজেনস্টাইনের আর এক ছবি 'থান্ডার ওভার ম্যাক্সিকো, দেখার অভিজ্ঞতাও আমাদের কম নয়। এই ছবির সঙ্গে মারি সিটন ছবি সম্পর্কে, তার পরিচালক এবং তার কাজের ওপর লেকচারও দিয়েছিলেন।
' সত্যজিতের ফিলম মেকার হওয়ার স্বপ্ন, ফিলম সোসাইটি গড়ার প্রেরণা তাহলে 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন দেখার পরই?
: প্রথমে 'ফিলম' বইটি আমাদের কাছে সেই দরজা খুলে দেয়। সেখানেই ফিলম সোসাইটি গড়ার কথা, পোটেমকিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পড়ে আমরা অনুপ্রাণিত হই। তখন থেকেই ছবি দেখার প্রতি ঝোঁক বাড়ে। বিদেশী ছবি ছাড়াও দল বেঁধে আমরা অন্য ছবি দেখতে যেতাম। একবার আমি আর মানিক দোতলা প্রাইভেট বাসে চড়ে নর্থের চিত্রা'য় (এখন 'মিত্রা') 'দেশের মাটি' ছবিটি দেখতে গিয়েছিলাম মনে আছে। এছাড়া ছিল ছবির আড্ডা। সত্যজিৎ তখন ডি জে কিমারে। চিদানন্দও। বিকেল পাঁচটার পর সেখানে, কোন কোন দিন আমাদের মিটিং প্লেস চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর কফি হাউসের ভেতর দিককার ঘর, যাকে বলা হত 'হাউস অফ লর্ডস', সেখানে ; কখনও বা তার উল্টোদিকে ভারত ভবনে ফিলম ডিস্ট্রিবিউটর মিস্টার হেমাডের ঘরে আসর বসত আলোচনার। সবই ওই ছবি দেখা সংক্রান্ত।
এই আলোচনা সভার একটা স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ল। আগেই বলেছি আমাদের ছবি দেখা বা মিলিত হবার নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা ছিল না। একবার তাই বাধ্য হয়ে সেই বিখ্যাত ৪২এ ধর্মতলা স্ট্রীটে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হল। বিষয়, সদ্য দেখা 'হ্যামলেট' ছবি। সবাই বললে, শিশির ভাদুড়ি মশাই এ ব্যাপারে অথরিটি। তাঁকে পেলে আলোচনা সভার গুরুত্ব বাড়ে। শেষ পর্যন্ত আমাকে পাঠানো হল। সমীহ একটা ছিলই তাঁর প্রতি। তাই সুযোগ পেয়ে পুলকিত হলুম।
সেদিন শ্রীরঙ্গমে শো ছিল। প্রায় প্রাক মুহূর্ত। তিনি তখন স্টেজে ঢোকার মুখে। আমার প্রস্তাব শুনেই তিনি বেঁকে বসলেন। বললেন, যে ছবিতে সেই মূল্যবান 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' অংশটা বাদ যায়, সে ছবি সম্পর্কে আমি কোন আলোচনা করব না। বলেই তিনি গড়গড় করে সেই অংশটি নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে গেলেন।
:এই সব ঘটনা থেকেও কি আর এক সত্যজিৎকে পাওয়া যায় না?
: নিশ্চয়। কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ বললেন, পথের পাঁচালীর আগের সত্যজিৎ, ফিলম সোসাইটি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তির অন্তরালে প্রস্তুতি পর্ব আমার কাছে আজও বিস্ময়। যে মানুষটি শয়নে স্বপনে সঙ্গীতে একান্তই নিবেদিত, শিশুসুলভ অথচ ম্যাচিওর্ড ভাবনা যাকে প্রতিমুহূর্তের জন্য সজীব এবং স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত করেছে, সে এক অন্য সত্যজিৎ। সেই সময় হলিউড কোয়ার্টার্লি, সাইট এ্যান্ড সাউন্ড, ইত্যাদি পত্র পত্রিকা নিয়মিত আনা হত। চিরকালই ওর মিউজিকের পরেই পড়ার ঝোঁক ছিল তীব্র। ওই সব ম্যাগাজিন পেলেই সে তাতে ডুবে যেত। তবে দেখেছি, জন গ্যাসলারের স্ক্রিপ্ট বা চিত্রনাট্যর ওপর লেখা বই-ওর বোধহয় সবচেয়ে প্রিয় ছিল। এছাড়া চিত্রনাট্যর প্রতি বা তার উপর বইয়ের প্রতি ওর একটা আলাদা ঝোঁক বা আকর্ষণই ছিল।
:কমলালয়ে আপনাদের একটা আড্ডা ছিল না?
:না। তবে রাম হালদারের কমলালয় বুক হাউসে মাঝে মধ্যে যেতুম। এই মাত্র।
:'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্য আপনি দেখেছেন?
: হ্যাঁ দেখেছি। তবে তারও অনেক আগে ও 'ঘরে বাইরে'র চিত্রনাট্য করে ফেলেছিল। শান্তিনিকেতনে আমরা ক'জন, আমি, বংশী, সঞ্জীব দাশ, মনোজেন্দ্র সত্যজিতের সঙ্গে ট্রেনে করে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। রবি ঠাকুরের পারমিশান বা ছাড়পত্র নিতে। সদ্য বিলেত প্রত্যাগত হরিসাধন দাশগুপ্ত গিয়েছিল গাড়ি হাঁকিয়ে। সেটা পৌষমেলার সময় ছিল। আমরা সেখানে খড়ের বিছানায় দু'রাত কাটিয়ে ছিলাম। সেই স্মৃতিটা আজও আমার অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে।

সত্যজিৎ প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ছবির সঙ্গীত পরিচালক **বিলায়েৎ খান** বলেছেন 'জলসাঘর' ছবির সঙ্গীত ও সত্যজিৎ সম্পর্কে

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায় এবং বিলায়েৎ খান এই দুই নক্ষত্রের যোগাযোগ কবে থেকে ?
বিলায়েৎ খান : পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই মানিকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা ।
প্রশ্ন : তখন সত্যজিৎ প্রথম ছবির কাজও শুরু করেননি, কিন্তু আপনি ভারতবিখ্যাত সেতারী, মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ।
বিলায়েৎ খান : সেই সূত্রেই তো সম্পর্ক । সত্যজিৎবাবু বরাবরই গানবাজনার রসিক শ্রোতা । আমার বাজনা ওঁর খুবই ভাললাগতো, সে কারণেই হয়তো উনি যোগাযোগ রাখতেন নিয়মিত । ফলে ক্রমশ: সম্পর্কটা গভীর হয়েছে ।
প্রশ্ন : কোথায় হোত যোগাযোগটা ?
বিলায়েৎ খান : আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে । সত্যজিৎবাবু ছাড়াও সেখানে ডক্টর ঘোষাল আসতেন সস্ত্রীক এবং ঘনিষ্ঠ আরও কয়েকজন । গল্পগুজব গানবাজনা হোত, কাবাব পরোটা আসতো । বেশ জমাটি আড্ডার পরিবেশ এবং তা একদিন দু'দিন নয়, আমি কোলকাতায় থাকলে কোন মাসে কুড়িদিন আমরা একসঙ্গে বসেছি, এমনও হয়েছে ।
প্রশ্ন : গানবাজনার মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকতো আপনাদের আলোচনা ?
বিলায়েৎ খান : নানা ব্যাপারেই কথা হোত এবং সেখানেই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সত্যজিৎবাবুর জ্ঞানের পরিচয় পাই । ছবি করার কথা তখনও উনি সিরিয়াসলি ভেবেছেন কি না জানি না, তবে ... ছবি আঁকা এবং ছবি তোলায় ওঁর মুন্সীয়ানার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি । আমি একমনে বসে বাজাচ্ছি, আর উনি কাগজ কলম নিয়ে আমার স্কেচ করে চলেছেন । আমার অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাটটা স্কেচ এভাবে করেছিলেন উনি । তার দু'চারটে নমুনা মনে হয় আজও থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় । একটা রোলিকর্ড ক্যামেরা থাকতো সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে— ফটাফট ছবি তুলতেন, কখনো একা কারুর, কখনো আড্ডার ।
প্রশ্ন : এই আড্ডাটা যতদিন চলেছিল, তাতে উনি সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা কখনও প্রকাশ করেননি ?
বিলায়েৎ খান : সিনেমার কথা হোত, এবং সত্যজিৎবাবুর আগ্রহ এবং ক্ষমতা উপলব্ধি করে ডক্টর ঘোষালই কতবার বলেছেন, 'তুমি ছবি তৈরি করছো না কেন ?' ছবি তৈরির অসুবিধের কথা হোত । সে সব অসুবিধে পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত 'পথের পাঁচালি' তৈরি করেছিলেন । তখনও আমাদের যোগাযোগ বেশ ভাল ।
প্রশ্ন : ছবি তৈরি করার সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি ?
বিলায়েৎ খান : আলোচনা কেন, 'পথের পাচালি'র সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিতেই সত্যজিৎবাবু আমাকে অনুরোধ করেছিলেন । অনুরোধ কেন, রীতিমত জোর করেছিলেন বলা উচিত । আমি রাজী হইনি ।
প্রশ্ন : রাজী না হবার বিশেষ কোন কারণ ছিল ?



• বিলায়েৎ খান



এবং 'জলসাঘর' বিলায়েৎ খান



• সত্যজিৎ রায়

বিলায়েৎ খান : সিনেমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইনি আমি। বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতের কারবারী আমি। ফিল্মী ব্যাপারের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে ওরকম দায়িত্ব নেওয়া যায় না। উনি অবশ্যি বলেছিলেন, 'আমি মিউজিকের লোক নই, আপনি ইচ্ছেখুশীমতন কাজ করবেন ভাল হলে ভাল, খারাপ হলে হোক, কিন্তু তবু করিনি আমি।

প্রশ্ন : এতে কি সত্যজিৎ আপনার ওপর অখুশী হয়েছিলেন ?

বিলায়েৎ খান : আমি এড়িয়ে যাচ্ছি, ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়েছিল ফলে একটু মনোমালিন্য হয়েছিল বোধহয়। উনি দুঃখিত হয়েছিলেন সম্ভবত। তাতে অবিশ্যি আমাদের সম্পর্কে আঁচড় পড়েনি। সে যাই হোক, আমি করলাম না বলেই 'পথের পাঁচালির' সঙ্গীত পরিচালনার কাজটা করেছিলেন রবিশঙ্কর।

প্রশ্ন : তা হলে পরবর্তীকালে 'জলসাঘর' ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করতে রাজী হলেন কেন ?

বিলায়েৎ খান : তখনও আমি সহজে রাজী হয়েছি এমন নয়। তবে মানিকবাবু বললেন, এবারের ছবির বিষয়টা সঙ্গীতনির্ভর, আমি কাজ করে অখুশী হব না। স্টোরি লাইনটা শুনে দেখলাম মার্গসঙ্গীত নিয়ে কাজ করবার সুযোগ আছে। তাছাড়া উনি আগেও অফার দিয়েছিলেন। সবমিলিয়ে ভেবে দেখলাম একবার করে দেখাই যাক না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবিশ্যি নিয়েছিলাম খানিকটা রীল দেখবার পরে।

প্রশ্ন : ছবির কাজ চলাকালীনই নিশ্চয়ই আপনাকে সক্রিয় হতে হয়েছে, কারণ সঙ্গীতাংশের শুটিং ছবির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বিলায়েৎ খান : তা তো বটেই। ছবির প্রতিটি গানের কম্পোজিশন এমনকি কিছু লিরিকও আমার নিজস্ব রচনা, সেটা না তৈরি করে শুটিং করা যেত না।

প্রশ্ন : বেগম আখতার ছবিটিতে বাঈজী চরিত্রে স্বয়ং অংশ নিয়েছিলেন, এটা কি আপনার আইডিয়া ?

বিলায়েৎ খান : ওটা আমিই চেয়েছিলাম, মুজরোর দৃশ্য যখন তোলা হচ্ছে তখন সত্যিকারের একজন গাইয়ে পর্দায় এলে দৃশ্যের ব্যঞ্জনাটা বাড়বে এই ভেবে বেগম আখতারের ব্যাপারটা সাজেস্ট করি আমি, সত্যজিৎবাবু খুশী হয়েই সম্মতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : সালামত খাঁ বা রোশনকুমারীকে নির্বাচনের সিদ্ধান্তও কি আপনার ?

বিলায়েৎ খান : সালামত খাঁকে দিয়ে গাওয়াবার পরিকল্পনাটা আমারই, রোশনকুমারীকে সত্যজিৎবাবুই চেয়েছিলেন। ওই 'চতুরঙ্গ'টি বিশেষভাবে কম্পোজ করেছিলাম আমি। আসলে আমার কাজের ব্যাপারে উনি পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেননি।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ যেখানে চিত্রনির্মাতা, সঙ্গীত পরিচালককে উপযোগী পরামর্শ দেওয়াটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয় ?

বিলায়েৎ খান : পরামর্শ মানে কি, কোন সিকোয়েন্সে উনি ঠিক কেমন আবহ চাইছেন বা কীরকম এফেক্ট গড়ে তুলতে চাইছেন, সেটা হয়তো ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আইডিয়াকে আমি নিজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছি। এর বিপরীতটাও হয়েছে—



● 'জলসাঘর' : ছবি বিশ্বাস

প্রশ্ন : আপনার পরামর্শ নিয়েছেন সত্যজিৎ ?

বিলায়েৎ খান : হ্যাঁ। মিউজিকের ক্ষেত্রে তো বটেই— এমনকি শুটিং-য়ের সময়ও দু একটা ব্যাপারে আমার মতটাকেই খুশী হয়ে অ্যাকসেপ্ট করেছেন উনি। যেমন ওই নাচের দৃশ্যটা যেখানে ভুঁইফোড় ধনী নজরানা দেবার জন্য টাকার থলি বের করেছে। ওখানে ছবি বিশ্বাসের ডায়ালগ ছিল। শট নেবার সময় আমি বললাম, ছড়িটা দিয়ে হাতটা টেনে ধরার কথা। উনি বললেন, এটা তো দারুণ ভেবেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার পরামর্শ অনুযায়ীই শটটা নেওয়া হোল।

প্রশ্ন : দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত হয়নি কখনো ?

বিলায়েৎ খান : তেমন সুযোগ ছিল না। আমাকে উনি চূড়ান্ত স্বাধীনতা দিয়েছেন আমিও মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করেছি। প্রয়োজনমত দু'জনে আলোচনা করে নিয়েছি। কম্যান্ড করার কোন অ্যাটিচ্যুডই কখনো দেখাননি উনি।

প্রশ্ন : একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সত্যজিতের সাঙ্গীতিক বোধ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়েছে ?

বিলায়েৎ খান : যদিও উনি প্রায়ই বলতেন, আমি মিউজিক তেমন বুঝি না, কিন্তু অত্যন্ত সমঝদার এবং সঙ্গীতরসিক ছিলেন তিনি। সব ব্যাপারেই একটা পরিচ্ছন্ন বোধ, উপলব্ধির গভীরতা ছিল ওঁর। কোন কাজের তারিফ করার চরিত্র দেখেই বোঝা যায়, যে তারিফ করছে তার যোগ্যতা কত।

যদিও উনি প্রায়ই বলতেন, আমি মিউজিক তেমন বুঝি না, কিন্তু অত্যন্ত সমঝদার এবং সঙ্গীতরসিক ছিলেন। সব ব্যাপারেই একটা পরিচ্ছন্ন বোধ, উপলব্ধির গভীরতা ছিল ওঁর। কোন কাজের তারিফ করার চরিত্র দেখেই বোঝা যায়, যে তারিফ করছে তার যোগ্যতা কত !

প্রশ্ন : আপনার তো এর আগে সঙ্গীত পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না, সেক্ষেত্রে সিনেমায় সঙ্গীত প্রযুক্তির টেকনিক্যাল দিকটা সামলেছিলেন কিভাবে ?

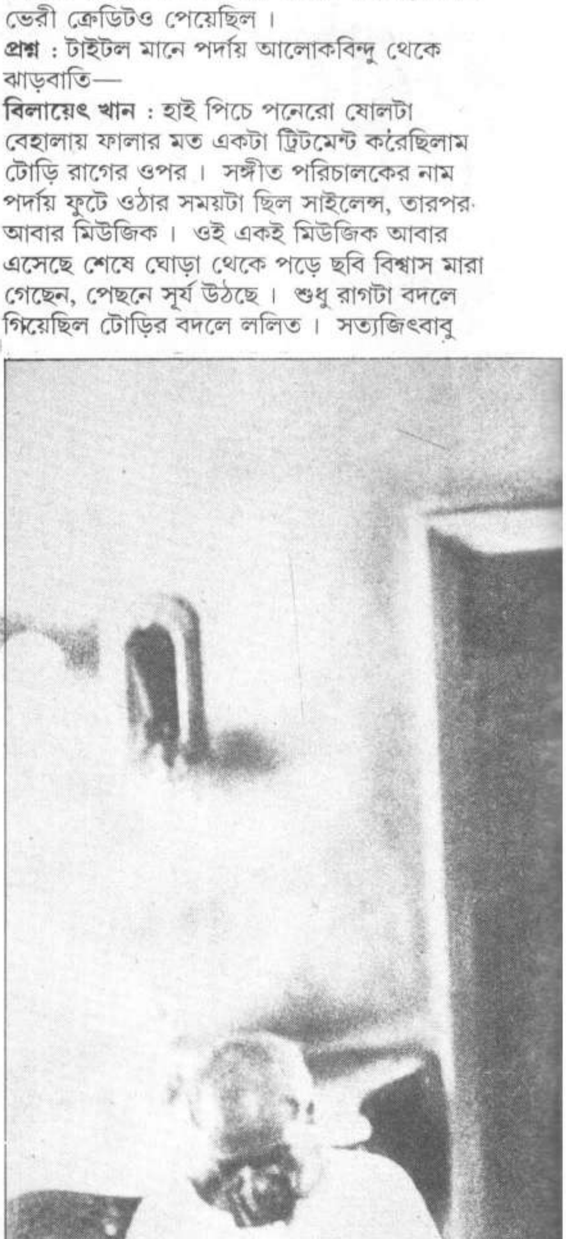
বিলায়েৎ খান : আমি মিউজিকটা ভেবেছি, যন্ত্র নির্বাচন থেকে শিল্পী এবং সঙ্গীত রচনা, সেলুলয়েডে তাকে বসানোর ব্যাপারে সত্যজিৎবাবুই দায়িত্ব সামলেছেন। টেকনিক্যাল ওসব ঝামেলা রপ্ত না থাকাটাও আমার ছবিতে কাজ না করার একটা কারণ।

প্রশ্ন : 'জলসাঘর'-এর সঙ্গীত পরিচালনা করে আপনি খুশী ?

বিলায়েৎ খান : প্রথমত সত্যজিৎবাবু খুশী হলেই আমি সন্তুষ্ট, কারণ তাঁর অনুরোধেই এই দায়িত্বটা আমি পালন করেছি। তিনি অখুশী হয়েছেন বলে শুনিনি। এরপর দর্শক শ্রোতাদের প্রশ্ন, তাদের ভাল লেগেছে বলেই জানি। জলসাঘর ছবির 'টাইটল মিউজিক' এবং 'প্লে আউট' বোধহয় কার্ল ভেরী ক্রেডিটও পেয়েছিল।

প্রশ্ন : টাইটল মানে পর্দায় আলোকবিন্দু থেকে ঝাড়বাতি—

বিলায়েৎ খান : হাই পিচে পনেরো ষোলটা বেহালায় ফালার মত একটা ট্রিটমেন্ট করেছিলাম টোড়ি রাগের ওপর। সঙ্গীত পরিচালকের নাম পর্দায় ফুটে ওঠার সময়টা ছিল সাইলেন্স, তারপর আবার মিউজিক। ওই একই মিউজিক আবার এসেছে শেষে ঘোড়া থেকে পড়ে ছবি বিশ্বাস মারা গেছেন, পেছনে সূর্য উঠছে। শুধু রাগটা বদলে গিয়েছিল টোড়ির বদলে ললিত। সত্যজিৎবাবু



● 'জলসাঘর' : ছবি বিশ্বাস



• বিলায়েৎ খান



দারুণ উজ্জীবীত হয়েছিলেন এই ট্রিটমেন্টে। যাই হোক মোটের ওপর কাজটা করতে ভালই লেগেছে আমার, এবং মনে হয় ভালই হয়েছিল।

প্রশ্ন : অথচ তারপর সত্যজিতের আর কোন ছবিতে আপনি সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পাননি ?

বিলায়েৎ খান : প্রথমত মিউজিকটা ছবির মূল থীম না হলে আমি কাজ করতে আগ্রহী নই। দ্বিতীয়ত পরবর্তীকালে উনি নিজেই ছবির জন্য উপযোগী সঙ্গীত রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন, ফলে এ প্রশ্ন ওঠে না। তবে যখন উনি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবি তৈরি করেন, তখন আমার মনে হয়েছিল যে ওই ছবিটার কেন্দ্রে মিউজিক আছে এবং বিষয়টা আমার। আমি কাজটা জমিয়ে করতে পারতাম। একটা টেম্পটেশন, কিংবা আগ্রহও বলা যায়। আসলে আমার মধ্যে এই আগ্রহের জন্মদাতাও তো সত্যজিৎবাবুই।

প্রশ্ন : আপনি এ ব্যাপারে সত্যজিতের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ভেবেছিলেন ?

বিলায়েৎ খান : আমার যোগাযোগের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ চিত্রনির্মাতা স্বয়ং সিদ্ধান্ত নেবেন তার কাকে দরকার বা না দরকার। ওঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সুখের, সেই সূত্রে ভাবনাটা এসেছিল এই পর্যন্ত।

প্রশ্ন : শতরঞ্জ— দেখেছেন আপনি, মিউজিক কেমন লেগেছে ?

বিলায়েৎ খান : না দেখিনি, সিনেমা আমি দেখি না বললেই চলে। তবে ছবিটায় ভাল মিউজিক ট্রিটমেন্টের সুযোগ ছিল বলে মনে হয়েছে আমার।

প্রশ্ন : সত্যজিতের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগাযোগ ছিল ?

বিলায়েৎ খান : ভাল, তবে অতীতের মত থাকা তো সম্ভব নয়, দুজনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যস্ততায় বাঁধা ! তবে অসুস্থ হবার আগে সত্যজিৎবাবু কোলকাতায় আমার বাজনা থাকলে শুনতে আসতেন। এই সেদিন আমি গিয়েছিলাম ওঁকে দেখতে। আসলে দূরত্বে থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সম্পর্ক বরাবরই বজায় ছিল।

প্রশ্ন : মানুষ বা শিল্পী সত্যজিৎ সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কেমন ?

বিলায়েৎ খান : নিঃসন্দেহে সত্যজিৎবাবু ছিলেন বড় মনের মানুষ, তাঁর আজকের এই খ্যাতির অনেক আগে থেকেই তাঁকে দেখেছি, মিশেছি, ফলে এটা বোঝা সহজ ছিল। শিল্পী হিসেবেও তিনি অনেক উঁচু স্তরের, যা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সেই সঙ্গে বলব, ভাগ্যও তাঁর সহায়ক হয়েছে। শুধু প্রতিভা থাকলে বা সৃষ্টিশীল কাজ করে গেলেই তো তাঁর মত বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি মেলে না। সত্যজিৎবাবু সেটা পেয়েছেন, সুখের কথা। তিনি চলে গেলেন। আমি হারালাম এক আপনজনকে। দেশ হারালো এক বিরাট মাপের মানুষকে।



সত্যজিৎবাবুর স্টাইলটাই

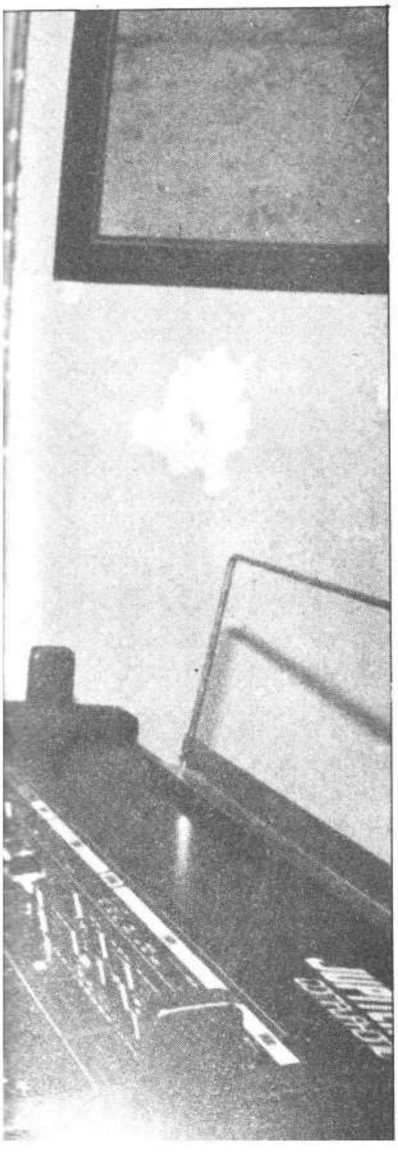


টোপাদাকে চিনতেন তো ? অমর দত্ত । টোপাদা নামেই এ লাইনের সবাই তাঁকে চিনত । বিখ্যাত যন্ত্রী । সব যন্ত্রই তাঁর হাতে কথা বলত । তখন তিনি বেঁচে । তা 'সোনার কেল্লা'র তখন মিউজিক টেক চলছে । টোপাদাও তাতে আছেন । সত্যজিৎবাবুর লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রীদের আমিই নিয়ে আসতাম । তিনি নিজেই কী কী যন্ত্র ব্যবহার করা হবে কোন্ সিকোয়েন্সে, কোন্‌টা কখন বাজবে তাও তিনিই স্বরলিপির সঙ্গে উল্লেখ করে দিতেন । যেমন কটা ভায়োলিন, ধরুন আটটা, দুটো চেলো, এই রকম । বাকি কাজটা করিয়ে নেবার দায়িত্ব আমার । তো, মিউজিক রিহার্সাল চলছে । সবাই তৈরি অভ্যস্ত বাজিয়ে তো । তাই বেশিক্ষণ লাগার কথা নয় । কিন্তু সেবার কি হল টোপাদার কিছুতেই হচ্ছে না । ভুল করতে লাগলেন । একবার, দুবার, তিনবার । অথচ তাঁর এমনটি কখনও হয় না । ফলে তিনি যেমন অপ্রস্তুত, তেমনি তাঁর অস্বস্তিও বাড়ছে । আর সেটা মুখে চোখেও ফুটে উঠছে

• পিয়ানোতে বসেই সুর করেন সত্যজিৎ রায়



মিউজিক আলাদা



নিমাই ঘোষ



সঙ্গীতের প্রতি সত্যজিৎ রায়ের আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। চলচ্চিত্রের মতো ফিল্মে সঙ্গীতের প্রয়োগকর্মেও তিনি ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের সহযোগী **অলোকনাথ দে** বলছেন সত্যজিতের সঙ্গীত ভাবনার কথা।

ক্রমশ। খুবই লজ্জার ব্যাপার।

আমি মানিকবাবুর দিকে তাকালুম। দেখলুম উনি নিচু হয়ে কাগজে কী লিখছেন। আমারও একটু অবাক লাগল। স্কোরিং রুমে বসে নোটেশন বা স্বরলিপি পালটেছেন, এমন ঘটনা আমি কোনদিন দেখিনি। এক সময় মুখ তুলতে চোখাচোখি হতেই উনি আমাকে ইশারায় ডাকলেন। কাছে যেতেই কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি তো প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। কী এটা ? ক্রমে স্পষ্ট হল। একটা ছবি। ওনার স্কেচ করা। হুবহু টোপাদার তখনকার মুখের এক্সপ্রেশন। সেই অপ্রস্তুত, অস্বস্তি, গলদঘর্ম ভাব। মুহূর্তে আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলুম। অর্থাৎ, এই যাঁর অবস্থা, তাঁকে আর কষ্ট না দিয়ে ছেড়ে দাও। আমিও ব্যাপারটা বুঝে ম্যানেজ করে নিলুম। টোপাদারও কোন অসম্মান হল না। আসলে মানিকবাবু কখনোই ঠিক মত কাজ না পেলেও মুখে কিছু বলতেন না। অর্থাৎ অসম্মান করতেন না। তাঁর প্রাপ্য অবশ্যই দিয়ে দিতেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাপারটা মনের মত হত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছাড়তেন না। অর্থাৎ পারফেকশন।

টোপাদার সেদিন ভুল হবার কারণ ছিল, সত্যজিৎবাবুর মিউজিক স্টাইলটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারুর সঙ্গেই মেলে না। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন শুনলেই বোঝা যায়, সত্যজিৎবাবুর মিউজিকও তাই। আমাদের ফিলম লাইনের কাজের সঙ্গে যার কোন মিলই নেই। তাই টোপাদা ব্যাপারটা ধরতে পারছিলেন না।

এই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়। আবার যখন ঠিক নিজের মনের মতটি হত, সে খুশিরও তুলনা নেই। এবং সেটা স্বতোৎসারিত হয়ে উল্লেখও করতেন। আর অন্যকে সম্মান জানানো ? ধরুন, সব কাজ ঠিক ঠিক, ওঁর মনের মত হয়ে গেল। যাবার সময় সবার কাছ থেকে বিদায় নেবেন। হাসিমুখে বলতেন, আবার দেখা হবে। কাউকে ছোট করতেন না।

বলে, উচ্ছ্বসিত, খুশি বিখ্যাত বংশীবাদক, অ্যারেঞ্জার অলোকনাথ দে আমার দিকে তাকালেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কোথায় হয়েছিল ?

উত্তর : ইন্ডিয়া ল্যাবে।

প্রশ্ন : আপনার সঙ্গে তাঁর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি রকম ?

উত্তর : দারুণ। মানুষ হিসেবে তো তুলনা হয় না। টলেস্ট তো সব দিকেই টলেস্ট। আর আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে করতে এমন হয়ে গিয়েছি যে তিনি কি চান, কতটুকু চান, সেটা আমি অনায়াসেই বুঝতে পারি।

প্রশ্ন : নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত ?

অলোকবাবু হেসে বললেন, অনেকটা।

প্রশ্ন : উনি কি সবটাই নিজে স্বরলিপি করতেন ?

উত্তর : সব সব। অলোকবাবু বললেন, কমপ্লিট নোটেশান করে তার একটা কপি আমায় দিতেন সেই সঙ্গে ক'টা যন্ত্র, কোন্‌টা কখন বাজবে।

অর্থাৎ কোনটা এক নম্বর, কোনটা পাঁচ নম্বর, কোনটা আট নম্বর। সঙ্গে ইন্সট্রাকশনও লেখাই থাকত। অল কমপ্লিট।

প্রশ্ন : রেকর্ডিংয়ের সময় সর্বদাই উনি কাছে থাকতেন ?

উত্তর : মাস্ট। নিজে না থাকলে রেকর্ডিং হবেই না। ... তবে শেষের দিকে, এই ধরুন 'গুপি বাঘা ফিরে এলো' কি তার আগে থেকে, ঐ যখন থেকে বাড়াবাড়ি শরীর খারাপ, ডাক্তারের রেসট্রিকশন— এই সব হতে লাগল, তখন মাঝে মধ্যে—

প্রশ্ন : ভুল-টুল কী রকম হত ?

উত্তর : ও বাবা, সেসব ভাবাই যায় না। সব, অর্থাৎ নোটেশন-টোটেশন সব কমপ্লিট করেই তিনি মিউজিকে হাত দিতেন। শুধু এতদিনের মধ্যে একবারই শুধু তেমন ঘটনা ঘটেছিল।

প্রশ্ন : যেমন ?

উত্তর : যেমন, এটা অবশ্য ইদানীংকালে, ধরুন, টেন বাই ওয়ান একটা সিকোয়েন্স নিলেন, পরের দিনই অন্য একটা করে পাঠালেন। ঐ টেন বাই ওয়ান, পাশে লেখা 'অল্টারনেট'। অর্থাৎ আগেরটা পছন্দ হয়নি বাড়ি গিয়ে মনে হয়েছে। পারফেকশন সম্পর্কে এত সেনসেটিভ।

প্রশ্ন : বিষয়টা পরিষ্কার করা যায় না ?

উত্তরে অলোকনাথবাবু প্রথমে অপ্রস্তুত হাসলেন, পরে বললেন, এটা আমাদের কোড়, বুঝিয়ে বলা যাবে না। বুঝে নিতে হবে।

এই সময় তাঁর স্ত্রী ভেতর থেকে অলোকনাথবাবুর কৃতিত্ব এবং সত্যজিৎবাবুর তাঁকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই অলোকনাথবাবু সরল হাসলেন। পরে বললেন, সেটা 'সোনার কেল্লা' ছবির সময়কার ঘটনা। একটা দৃশ্য ছিল— ট্রেন যাচ্ছে, সেটার আওয়াজ, সত্যজিৎবাবু বললেন, আমি ফ্লুটে ভেবেছি। কিন্তু খুব দমের দরকার। তুমি পারবে ? করলে কিন্তু নতুন একটা ব্যাপার হবে। সব মিউজিক হয়ে গেছে। শুধু এটাই বাকি।

প্রশ্ন : আপনি পারলেন ?

অলোকনাথবাবু আবার সেই আগের মত অপ্রস্তুত হাসলেন। বললেন, ঠাকুরের নাম নিয়ে শুরু করলাম। শেষ হতেই উনি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, খুব ভাল, দারুণ। এই সত্যজিৎ রায়।

প্রশ্ন : দৃশ্যটা কতক্ষণের ছিল ?

উত্তর : অনেকটা। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটের ডিউরেশন।

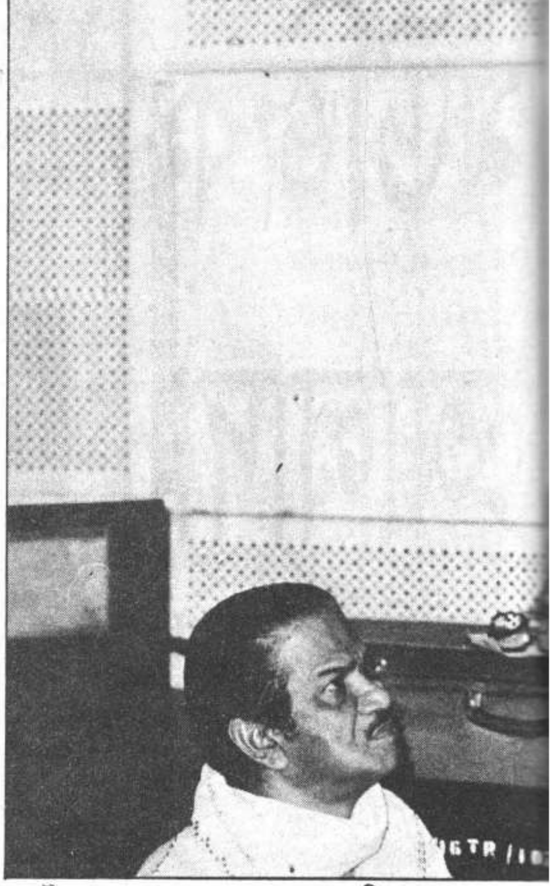
প্রশ্ন : তাহলে কারুর প্রশংসা করার ওঁনার কোন কার্পণ্য ছিল না ?

উত্তর : মোটেও না। শুধু তাই নয়। কোন কৃপণতাও করেননি কোনদিন। মিউজিকের ক্ষেত্রে তো নয়ই। সব সম্মানজনক, বরং খুশি হবার মত পেমেন্ট। সেখানে তিনি দরাজ হস্ত। তবে মিউজিকের ক্ষেত্রে 'নো কমপ্রোমাইজ'।

প্রশ্ন : উনি কখনও কোন যন্ত্র বাজিয়ে বা অন্যভাবে আপনাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেন ?

উত্তর : না। সব তো স্বরলিপিতে লেখাই থাকত। অর্থাৎ ইনস্ট্রাশন। সেই মত কাজ

আসলে ওঁর মুড, রুচি, আমি জানি, সেটা বুঝে নিয়েই আমি কনডাকটিং করি, অনেক সময় তাই আমার প্রয়োগও উনি মেনে নিয়েছেন। এটা আমার পরম সৌভাগ্য।



• সঙ্গীত গ্রহণের আগে অলোকনাথ দে ও সত্যজিৎ

পেলেই উনি খুশি। তবে অসুখের পর এখন হয়েছে, যেটা উনি চান, ভেতরে এসে সেই সুরটা গেয়ে শুনিয়ে যেতেন। অবশ্য সংকোচের সঙ্গেই বলছি, উনি কখনও কোথাও আটকালে আমি সেটা কারেকশন করেও দিয়েছি, তবে ওঁনার নোটেশনের ওপরই।

প্রশ্ন : উনি তাতে কিছু মনে করতেন না ?

অলোকনাথবাবু আমায় বাধা দিয়ে বললেন, না, না, কখনোই না। বরং ধরিয়ে দিলে উনি খুশীই হতেন। আমার ওপর তাঁর সেই নির্ভরতা আছে বলেই তো সেই প্রথম ছবি থেকে আমি আজও টিকে আছি। উনি আমায় যে কী ভালবাসেন, তা মুখে বলার নয়।

এই সময় ওঁর স্ত্রী একটি ঘটনা বললেন। উনি (অর্থাৎ, অলোকনাথ বাবু) বোম্বে গেছেন তখন সলিলবাবুর অনুরোধে। সেই সময় কী একটা কাজে ওঁকে প্রয়োজন হয়েছে। নিজেই টেলিফোন করেছেন, ঐরকমই নিজেই ফোন করেন, আমাদের সঙ্গে তো ওঁর পারিবারিক সম্পর্কই। উনি আমাদের জন্য যা করেছেন, সে ঋণ কোনদিনই শোধ হবার নয়। তা, উনি ফোন ধরতে আমি ব্যাপারটা বলতেই উনি বললেন, ও আবার বোম্বে গেল কেন। ওখানে কী আছে।

প্রশ্ন : এই নোটেশনের ব্যাপারে আপনার ওপর



মানুষ হিসেবে তো তুলনা হয় না। টলেস্ট তো সব দিকেই টলেস্ট। আর আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করতে করতে এমন হয়ে গিয়েছি যে তিনি কি চান, কতটুকু চান, সেটা আমি অনায়াসেই বুঝতে পারি।

সত্যজিৎবাবুর নির্ভর করেন নিশ্চয়ই—
উত্তর : হ্যাঁ, আসলে ওঁর মুড, রুচি, আমি জানি, সেটা বুঝে নিয়েই আমি কনডাকটিং করি, অনেক সময় তাই আমার প্রয়োগও উনি মেনে নিয়েছেন। এটা আমার পরম সৌভাগ্য।
প্রশ্ন : নোটেশন বা স্বরলিপি কি সত্যজিৎবাবু প্রথম থেকেই করতেন ?
উত্তর : না। সেটা অবশ্য নয়। রবিশঙ্কর, বিলায়েত, আলি আকবরের সময় ছাড়া উনি যখন সুর করা শুরু করলেন, তখন ফিলমের তো আলাদা নোটেশন, সেটা ওঁর ঠিক সড়গড় ছিল না। তখন উনি সুর করে আনতেন আমি নোটেশন করে নিতাম। তারপর ঐ ব্যাপারটা একদিন শুনে নিয়ে, বোধহয় 'জলসাঘর'-এর পর থেকে নিজেই সব করেন। তবে যেটা তিনি করেন, তাতে কারুর কোন ছোঁয়া পর্যন্ত থাকে না। যাকে বলা যায়, নিজস্ব, অর্থাৎ 'সত্যজিৎ ঘরানা'-র তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানা।
প্রশ্ন : আপনি তো 'পথের পাঁচালী' থেকেই ওঁর সঙ্গে আছেন। সেই সময় অর্থাৎ রবিশঙ্কর, বিলায়েত খাঁ, আলি আকবরের সময় কী হিসেবে ছিলেন ?
শুধু যন্ত্রী ?
উত্তর : না, শুধু বিলায়েতের সময় যন্ত্রী হিসেবে ছিলাম। বাকি দু'জনের সঙ্গেই সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ছিলাম। টাইটেলেও সেটা থাকত।
প্রশ্ন : সত্যজিৎবাবু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের না নিয়ে নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে নিলেন কেন ?
উত্তর : আসলে এঁরা সবাই মস্ত বড় গুণী। সত্যজিৎবাবু এঁদের গুণগ্রাহীও বটে। কিন্তু যেটা তাঁর ভেতর থেকে চাইতেন সেটা ঠিক পেতেন না বলেই, অর্থাৎ একটা ফাঁক থেকে যেত বলেই হয়তো— খুবই খুঁতখুঁতে লোক তো। যেটা তাঁর প্রয়োজন, তার জন্য এক এক সময় যতক্ষণ না সেটা পেতেন কাজ করিয়ে নিতেন। তার জন্য তিনি প্রচুর খাটতেন, বলতে কি এত কারেকশন, পারফেকশন, গানের জন্য এত খরচ বাংলা ছবিতে ভাবাই যায় না। আবার দেখুন, 'আগন্তুক' ছবির সময়। এত তাড়াতাড়ি, এমন অবলীলায় মিউজিক টেক হয়ে গেল যে, তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে দেরিতে ল্যাবে আসা স্ত্রীকেও বললেন, তুমি দেখলে না, কত তাড়াতাড়ি কী করে যে মিউজিক টেক হয়ে গেল, যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। চমৎকার সেকথা তিনি আমাদেরও বলেছেন।
প্রশ্ন : কটা স্বরলিপির কপি হত ?
উত্তর : দুটো। একটা নিজের জন্য একটা আমার। গান থাকলে তিনটে। গাইয়ের জন্যে।



• 'শাখা প্রশাখা' : সঙ্গীত গ্রহণ । অলোকনাথ এবং সত্যজিৎ রায়

তবে ওঁর ছবিতে তো গান খুব কমই থাকত । একটা মজার ঘটনা বলি । 'গুপী বাঘা'র মিউজিক টেক হচ্ছে । এবার অনুপ ঘোষাল গাইবে । কিন্তু গান আরম্ভ হতেই দেখা গেল আমাদের নোটেশনের সঙ্গে দু'এক জায়গায় মিলছে না । তা, অনুপকে বলা হল তুমি ভুল গাইছ । কিন্তু সে সেটা মানবে না । বললে, না আমি ঠিক গাইছি । কী ব্যাপার ? খানিক কথা চালাচালির পর ব্যাপারটা ধরা পড়ল । আসলে সত্যজিৎবাবু ফাইনাল নোটেশন করার পর একটা ছেলে তার কপি করে দেয় অন্যদের জন্য । সেইখানেই সে গণ্ডগোল করে ফেলে অনবধানতাবশত । ঐ যেমন সা'-এর জায়গায় পা, মা-এর জায়গায় ধা, এই রকম । এমনি সময়ে অর্থাৎ সত্যজিৎবাবু মিউজিক টেকিং-এর সময় যেমন সিরিয়াস, তেমনি স্ট্রিক্ট । কিন্তু সেই ঘটনা জানার পর শিশুর মত হেসে ফেললেন । শেষে অবশ্য ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হল । উনি তাই দেখে বললেন তুমি খুবজোর ম্যানেজ করেছ । বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন ।

প্রশ্ন : রবিশঙ্কর, আলি আকবরের সময় কোন হস্তক্ষেপ করতেন ?

উত্তর : একদম না । শুধু চুপচাপ শুনতেন । কিন্তু মনে-মনে অনেক সময়ই খুশী হতে পারতেন না । কিন্তু কাউকেই কোনদিনই অসৌজন্য প্রকাশ করেননি । তিনি কাউকে অসম্মান বা ছোট করেছেন এমন ঘটনা আমার জানা নেই ।

প্রশ্ন : কিশোরকুমারকে দিয়ে নাকি উনি 'গুপী গাইনে' গাওয়াতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর : সেটা আমার জানা নেই । তবে 'চারুলতা'-তে তো গাইয়েছেন । সেটা ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, রেকর্ডিং বোম্বেতে হয়েছিল । উনি নিজে থেকেই করিয়েছিলেন । আমি অবশ্য সেখানে ছিলাম না ।

প্রশ্ন : সত্যজিৎবাবুর ছবিতে কত হ্যান্ডস ব্যবহৃত হত ?

উত্তর : সাধারণত ৩০/৩৫ জন ।

প্রশ্ন : মিউজিক টেকিং কখন হত ?

উত্তর : ছবি শেষ হয়ে সম্পাদনার পর । একটা কথা, ওঁর সুরের ওপর উনি কারুকার্য পছন্দ করেন না । সবই সাজানো থাকত । সেটাই আসল । সেই মতই কোন্টার পর কোন্টা, সেইভাবেই অর্কেস্ট্রা । আর আমাদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ছিল । তাই একবার আমি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও উনি অন্যের ওপর দায়িত্ব দেননি । সুস্থ হয়ে উঠে আমিই সেটা করেছি । এমন বিশ্বাস বা নির্ভরতা আমার ওপর ।

প্রশ্ন : শুনেছি ওর সমগ্র মিউজিক নিয়ে একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে ?

উত্তর : হ্যাঁ, বাবুই (পুত্র সন্দীপ) সেটা গড়ে তুলেছে । তাতে গান সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, নোটেশন নোট ইত্যাদি থেকে রেকর্ড, ক্যাসেট, টেপ মায় ছবিতে ব্যবহৃত হয়নি অথচ রেকর্ড করা আছে এমন সুর, সবই সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

আমার শেষ প্রশ্ন : আপনাদের এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল কী ভাবে ?

উত্তর : সেটা ১৯৫৪-টুয়ান্ন হবে । অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করি (১৯৪২ থেকেই শুরু) । রেডিও স্টেশন তখন গারস্টিন প্লেসে । একদিন জ্ঞানদা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বললেন, তোমাকে একটা ফিলিমে বাজাতে হবে । আজকেই সে আসবে । তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো । ইয়ংম্যান । শিক্ষিত । দেখবে তোমার খুব ভাল লাগবে । যথাসময়ে তিনি এলেন । স্মার্ট, লম্বা, রীতিমত ভদ্র ব্যবহার । ইনিই আজকের সত্যজিৎ রায় ।

আমি ফের হেসে বললাম, নিশ্চয়ই তিনি আপনার বাঁশির একজন অ্যাডমায়ারার ছিলেন ?

অলোকনাথবাবু হেসে কৃতজ্ঞের স্বরে বললেন, হলে, সেটা আমার পরম সৌভাগ্য ।

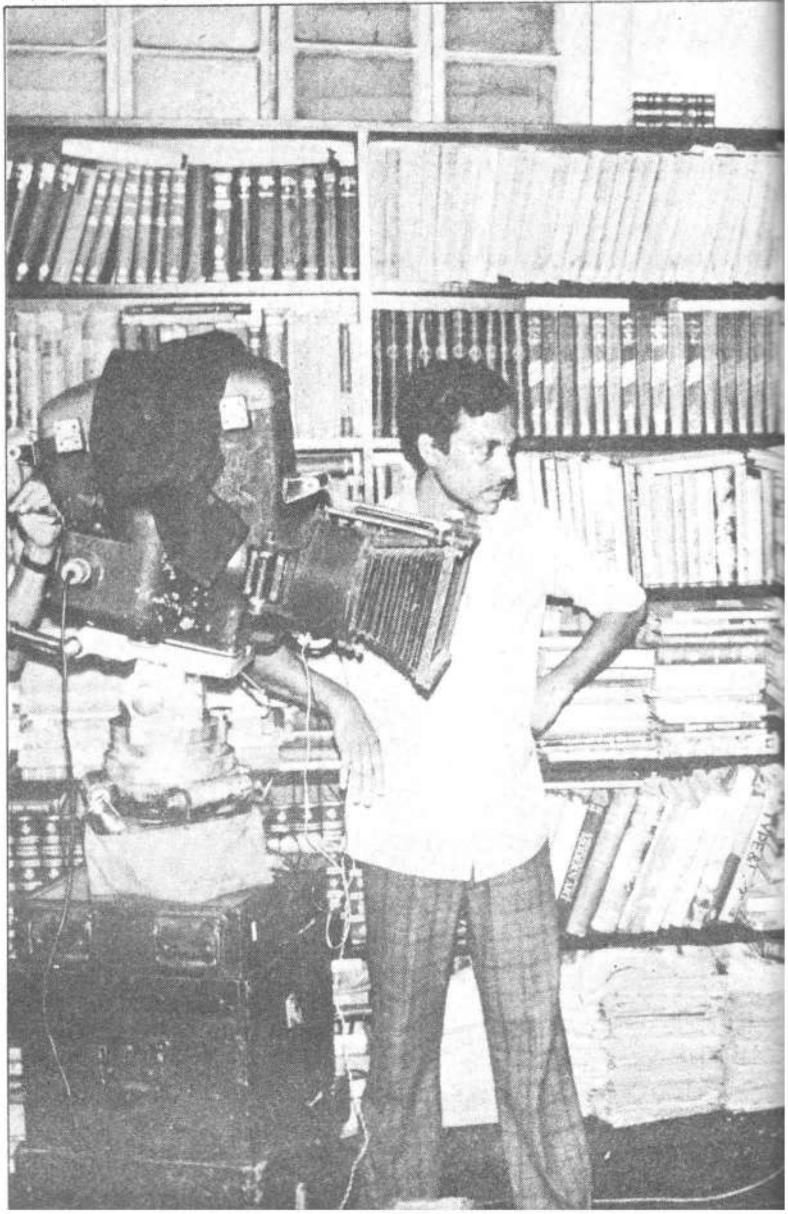
মানিকবাবু কখনোই ঠিক মত কাজ না পেলেও মুখে কিছু বলতেন না । অর্থাৎ অসম্মান করতেন না । তাঁর প্রাপ্য অবশ্যই দিয়ে দিতেন । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাপারটা মনের মত হত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছাড়তেন না ।



সত্যজিতের সঙ্গীতমানস

সত্যজিতের সঙ্গীতমানস বা অবাহসঙ্গীত রচনার আশ্চর্য প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গেলে চলে যেতে হয় একেবারে গোড়ার দিকে। অর্থাৎ, "পথের পাঁচালি" রচনার সময়। অথচ "পথের পাঁচালি"র সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর। তবে কেন "পথের পাঁচালি"র প্রশ্ন আসছে? আসছে এই কারণে, একজন দক্ষ পরিচালক, যিনি যথার্থ চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝেন, একমাত্র তিনিই সবচেয়ে ভাল বোঝেন চলচ্চিত্রের আবহসঙ্গীত—গল্পের পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী কী ধরনের যন্ত্র, কোন ধরনের আবহসঙ্গীত চলচ্চিত্রের কাঠামোটিকে অতিরিক্ত সৌন্দর্য ও অলঙ্কার দিতে পারে। আর সেই প্রয়োজনেই চিত্রপরিচালক সঙ্গীত পরিচালকের কাছ থেকে দৃশ্য অনুযায়ী, স্থান কাল পাত্র অনুসারে আবহসঙ্গীত রচনার দাবী জানান বা আদায় করেন। কেন না, চিত্র পরিচালক গল্প বাছাই করে চিত্রনাট্য রচনা করেন, আর সেই চিত্রনাট্যের অর্গানিক স্ট্রাকচারের স্বার্থে শুটিং চলাকালীন তিনি ভেবেও নিতে পারেন কোথায় সেতার, কোথায় বীণা, কোথায় গুব্‌গুবি, কোথায় তারসানাই ব্যবহৃত হওয়া দরকার। আবার, কোথায় সঙ্গীতের পরিবর্তে শুধুই ধ্বনি বা পেয়ালা পিরিচ ঘটি বাটি থালার ঝন্ ঝন্ শব্দে সেই বিশেষ মুহূর্তটি অনেক বেশী বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে। পণ্ডিত রবিশঙ্করের পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভাকে ছোট না করেও বলতে পারি, ছবির প্রয়োজনে অর্থাৎ চলচ্চিত্রকারের বোধ ও চাহিদা অনুযায়ী রবিশঙ্কর নানান রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু "পথের পাঁচালি"র সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে রবিশঙ্করকে নির্বাচন—সেটার ছিল সেই যুগ ও পরিবেশের প্রশ্নে একটা বিরাট ব্যতিক্রম ও নতুন পদক্ষেপ। "পথের পাঁচালি"র আবহসঙ্গীত থেকে পরিচালকের একটি নতুন, বিপ্লবাত্মক দৃষ্টান্ত আমরা পাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের কর্মশৈলীতে। যেমন, ইন্দির ঠাকরুনের মুখে "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল"—খালি গলায় বৃদ্ধার কণ্ঠের এই গান এবং ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু পর্যন্ত সেই সুরকে যন্ত্রসঙ্গীতে ব্যবহার করা,—এ তো সত্যজিতেরই সৃষ্টি এবং আবিষ্কার। কিংবা, ঘুরে ফিরে আড় বাঁশীতে আর সেতারের সম্মিলনে একটা থিম্ মিউজিক কানে বাজতে থাকে,-তখন একটুও ভেবে নিতে অসুবিধা হয় না অপু-দূর্গার প্রকৃতির কোলে ছোটাছুটি, রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার আনন্দানুভূতি ও উচ্ছ্বাস, দূর্গার অসুস্থতা, হরিহরের বিযাদময় দারিদ্র্যের জ্বালা, সর্বজায়ার অসহায় একাকিত্ব। কিংবা, আজও ভোলা যায় না সর্বজায়া দূর্গার ডুরে শাড়ি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, কান্না নেই—শুধুই তার সানাই বেজে ওঠে। মৃতা কন্যার দুঃখময় মৃত্যুর স্মৃতি মায়ের মনে যেভাবে মুচড়ে ওঠে, দর্শকের কাছে সেই অনুভূতির অর্থবহতা ওই সানাইয়ের ব্যবহার আলাদা ব্যঞ্জনা এনে দেয়। এই চিন্তা, কল্পনা, সাঙ্গীতিক বোধ একমাত্র পরিচালক ছাড়া আর কার মুন্সিয়ানায় ব্যবহৃত হতে পারে? সঙ্গীত পরিচালক তো

• 'মিউজিক অফ সত্যজিৎ রে' শুটিং-এর প্রাক্কালে সত্যজিৎ রায়, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী এবং জনৈক সহক



ফিল্মে সঙ্গীতকে কেমনভাবে ব্যবহার করতেন সত্যজিৎ রায় ? সত্যজিতের সঙ্গীত মানস নিয়ে লিখছেন 'মিউজিক অফ সত্যজিৎ রে' তথ্যচিত্রের পরিচালক **উৎপলেন্দু চক্রবর্তী** ।

সঙ্গীত রচনা করেই খালাস, কিন্তু তারপর এডিটিং টেবিলে দৃশ্য অনুযায়ী, মাপে মাপে কেটে কেটে কত বুদ্ধি খাটিয়েই না সেই সঙ্গীতের টুকরোটিকে ব্যবহার করতে হয়, যাতে ছবির গায়ে মেদ না জমে, ছবির দৃশ্য বা সংলাপ থেকে আমাদের কান বা চোখকে সঙ্গীতের দিকে টেনে না নিয়ে যায় ; —আর এই অসাধ্য সাধনে পরিচালক সফল হন তখনই, যখন পরিচালক শুধু চিত্রনাট্য রচনা করে তাকে যথার্থ চলচ্চিত্রের ভাষায় রূপ দিয়েই সঙ্গীতের দিকটি দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিয়ে সুখ নিদ্রায় মগ্ন থাকেন না । অন্তত আমার গত চৌদ্দ বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই বলে । অবশ্য, এখানে বলা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ চিত্র পরিচালকেরই এই সাঙ্গীতিক বোধটুকু একেবারেই নেই ।
যাই হোক, "পথের পাঁচালি", "অপরাজিত", "অপুর সংসার" দেখার পর যে-কোন সঙ্গীত













সচেতন মানুষের বুঝে উঠতে দেরী হয় না যে শুধু নামী কম্পোজার নিলেই হয় না, তাঁকে ব্যবহার করতে হয় চরম দক্ষতা এবং পরিমিতিবোধ নিয়ে এবং সেজন্য পরিচালককে সঙ্গীত সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। সত্যজিৎ গোড়া থেকেই সেখানে সার্থক এবং সফল—যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তিনি পরবর্তীকালে নিজেই তাঁর সমস্ত ছবির সঙ্গীতের দায়িত্ব নেন। তাঁকে যখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনি নিজে কেন সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন ?" জবাবে বলেছিলেন "....আসলে রবিশঙ্কর, আলি আকবর, বিলায়েৎ—এঁরা নামী দামী কম্পোজার। ওঁরা সর্বক্ষণ দেশ-বিদেশে ব্যস্ত থাকেন। সময় দেওয়া কষ্টকর ছিল। আর একটা কারণ হ'ল, আমি হয়তো এক মিনিট একটা বাজনা বাজাতে বলতাম। ওঁরা ঠিক পেরে উঠতেন না। আমাকে তখন সেটাকে এডিটিং-এ বসে কেটে কুটে লাগাতে হত। এটা করতে করতে মনে হল যে, আমি যখন রেকর্ডেড মিউজিককে আমার মতন এডিট করেই ব্যবহার করতে পারছি, যেটা ওঁরা আদৌ করেননি, তখন আমিই করি না আবহসঙ্গীতটা ! ১৯৬১ সালে আমি "তিন কন্যা" ছবিতে প্রথম আবহসঙ্গীত রচনা করি। প্রথম দিকটায় খুবই কঠিন লেগেছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে উঠল।"

মনে পড়ে গেল সত্যজিতের প্রত্যেক ছবিতেই তাঁরই প্রবর্তিত থিম মিউজিক এর কথা। সেই "পথের পাঁচালি" থেকে "সদ্‌গতি" পর্যন্ত। একটা বিশেষ স্টাইল, বিশেষ ঘরানা এবং বিশেষ শৈল্পিক কর্মকাণ্ড। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তিনি হঠাৎই ঠিক করলেন ছবিতে সঙ্গীত রচনা করবেন—এটা একটা উল্লম্ফন (গ্যালপ)। কিন্তু নিজের ভিতরে বা পারিবারিক সূত্রে কোনভাবে রক্তের মধ্যে সঙ্গীত চেতনা না থাকলে এটা সম্ভবপর নয়, একেবারেই নয়। কাজেই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করাতে উনি জবাব দেন, "হ্যাঁ, আমি সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই বড় হয়েছি। আমার বাবার দিক থেকে আমার ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন। অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতেন, পাখোয়াজ বাজাতেন, আমার মায়ের দিক থেকে মায়ের প্রমাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত একজন বিখ্যাত সঙ্গীত স্রষ্টা ছিলেন। আমার মামা ছিলেন অতুলপ্রসাদ, মাসী ছিলেন কণক বিশ্বাস, সাহানাদেবী, পিসী ছিলেন মালতী ঘোষাল,— ওই বাবার দিক থেকে আর মায়ের দিক থেকে এমন একটা সাঙ্গীতিক পরিবেশ পাওয়ায় আমার মধ্যেও একটা সাঙ্গীতিক বোধ বা চেতনা অর্থাৎ সঙ্গীতের প্রতি একটা গভীর অনুরাগ বা ভালবাসা তৈরি হয়েছিল।"

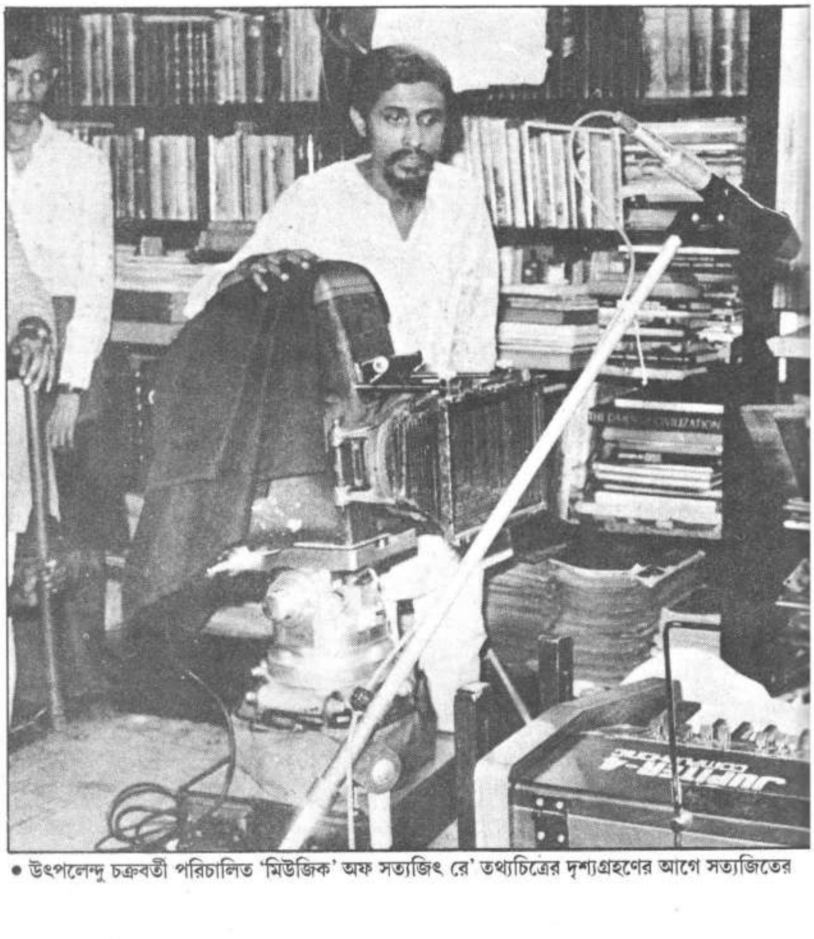
সত্যজিতের ছবিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যে মিলন দেখা যায়, সেটাও তাঁর কিশোর বয়স থেকে ওয়েস্টার্ন মিউজিক সম্পর্কে ভালবাসা, জ্ঞান অর্জন ও অধ্যয়নেরই ফলশ্রুতি।

"তিন কন্যা"তেই তাঁর টাইটেল মিউজিকে দক্ষতার পরিচয় মেলে। ধরা যাক, "সমাপ্তি"তে—যখন



অরুণ চট্টোপাধ্যায়

• 'অপরাজিত' ছবির সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছেন সত্যজিৎ রায় ও রবিশঙ্কর



• উৎপলেন্দু চক্রবর্তী পরিচালিত 'মিউজিক' অফ সত্যজিৎ রে' তথ্যচিত্রের দৃশ্যগ্রহণের আগে সত্যজিতের





সঙ্গে আলোচনা করে নিচ্ছেন উৎপলেন্দু

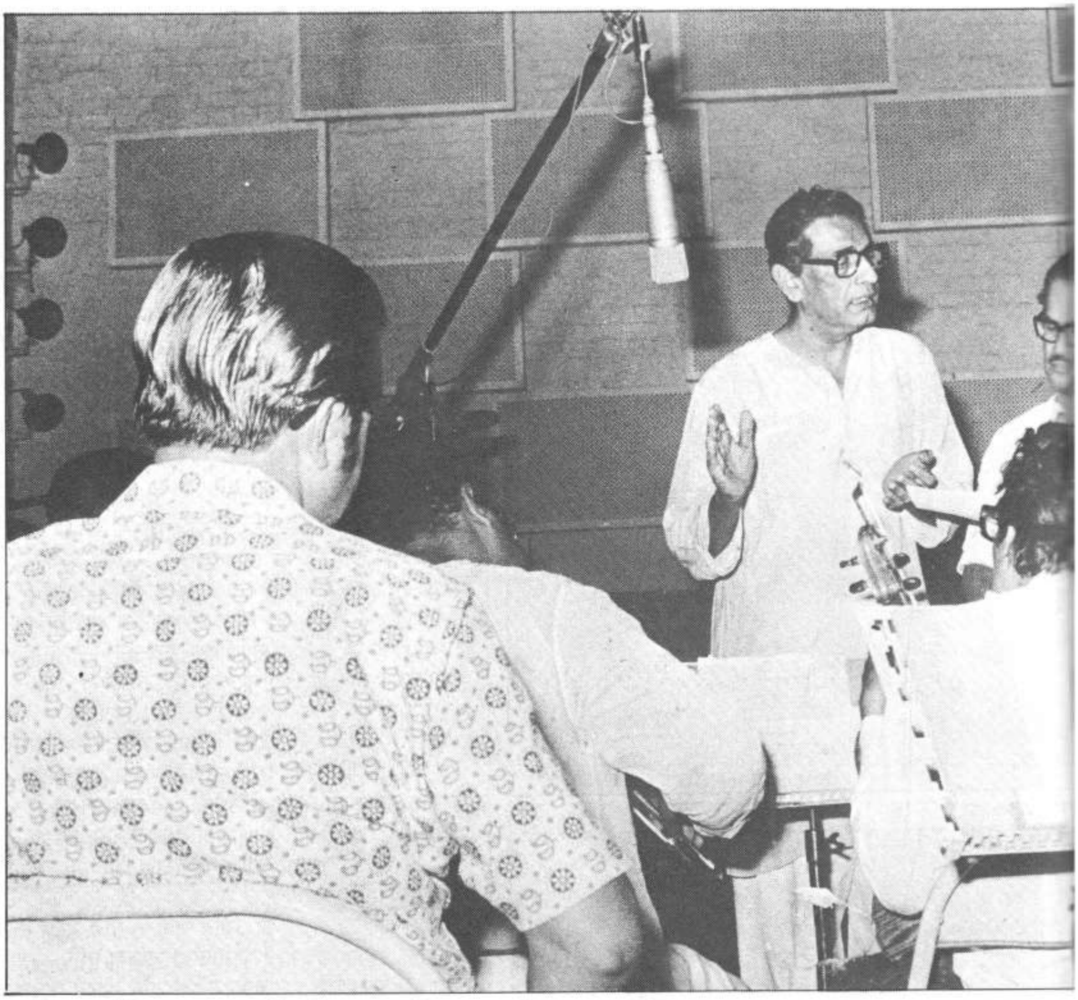
নববধূ সাজে বাসর ছেড়ে রাতের অন্ধকারে মৃন্ময়ী ছুটে আসে, তখন যে আবহসঙ্গীত শুনতে পাই তা পাশ্চাত্য আঙ্গিকেই তৈরি। কিন্তু রানার দেখে মৃন্ময়ী থমকে যায়। কোন সঙ্গীত এখানে নেই ; শুধুই রানারের ঘণ্টার ঝুমঝুম শব্দ ! এই তাৎক্ষণিক নির্জনতা পরবর্তী সঙ্গীতের গভীরতা ও প্রয়োজনীয়তাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। তারপর মৃন্ময়ী যখন আপন মনে উন্মুক্ত চিত্তে সংসারের তথাকথিত সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে মনের সুখে দোলনায় দোল খেতে থাকে, তখনকার যে আবহসঙ্গীত সত্যজিৎ রচনা করেন তা ভিস্যুয়াল কোয়ালিটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ক্রমাগত যে ডাইমেনশনে নিয়ে যায় তা সত্যজিতের পক্ষেই সম্ভবপর,— একেবারে প্রাচ্যের সুরে বাঁধা কিন্তু কোথাও কোন মামুলী ব্যাপার নেই। অর্থাৎ হ্যাপী টিউন তাই সেতার সরোদ কাড়া নাকড়া সবই মিলেমিশে জগাখিচুড়ি হয়ে গেল, যা যে কেউ করতেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয়—কী আশ্চর্যভাবে ছবির টাইটেল মিউজিকের সঙ্গে এই অর্কেস্ট্রেশনটির মূল মিল। অর্থাৎ তিনটি গল্পের সামগ্রিক সুর কী—সেটাই মনে করিয়ে দেয় এই দৃশ্যের মিউজিকের কম্পোজিশন। এক কথায় ইউনিফর্মিটি অফ কমন টিউন এ্যান্ড লাইফ। এই মিউজিকে আমরা পাই একটি নিটোল অর্কেস্ট্রেশন, যাতে সেতার সরোদ, ভিওলা, চেলো, বাঁশী, বেহালা সবই আছে। এরপর কিন্তু আমরা আর মিউজিক পাই না। অন্তত যা পাই তা শুধুই ফিলার হিসেবে। বরং বার বার মনে পড়ে মৃন্ময়ীর সেই রেকর্ডহীন কলের গান চালিয়ে দেওয়ার শব্দ—যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মৃন্ময়ীর মায়াভরা সজল দুটি চোখ—যে প্রেম সে বুঝতে পারেনি, পরে তাকে বুঝতে পেরে যৌবনের লজ্জায় আর আগের সেই দৃষ্টি নেই। এখন আর সে সরাসরি স্বামীর কাছে চলে যেতে পারে না আগের মতন। এখন সে বধূজীবনের, সংসারের গুরুত্ব বুঝে গেছে। সেটাই যেন বুঝিয়ে দেয় কলের গানের রেকর্ডহীন হয়ে ঘুরে যাবার একটানা শব্দ। অর্থাৎ, চলো, ঠিক ঠিক এই ভাবেই ; পূর্বের মতন নয়।... মৃন্ময়ীর স্বামী অপূর্ব এগিয়ে আসে। মৃন্ময়ীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়। মা তখন ছেলের জন্য মিষ্টি হাতে উঠে আসছিলেন সিঁড়ি দিয়ে, দরজা বন্ধ হতেই থমকে দাঁড়ান বিস্মিত চোখে। আশ্চর্য, এমন একটা সুন্দর মুহূর্ত ছবির রোম্যান্টিক পরিণতিকে কোন পরিচালকই বিনা আবহসঙ্গীতে ছেড়ে দিতেন না। হয় সেতারের ঝালা, কিংবা ইমনের একটা টান সানাইয়ে কিংবা সুরমণ্ডল বা সুরবাহারের কয়েকটা স্ট্রোক, নিদেনপক্ষে বাঁশীর আকুল করা লম্বা লম্বা টান কলাবতী বা টোড়িতে। না, সত্যজিৎ তা হতে দেননি, কেননা উনি জানেন বা বোঝেন "সমাপ্তি"র সমাপ্তিটুকু এতই মিষ্টি এত সাঙ্গীতিক যে ওখানে আবার অতিরিক্ত মিউজিক বসানো মানে কন্যার নাকে নথ থাকতেও অনর্থক নোলক পরানো ! এই পরিমিতি বোধ কথাটাই সত্যজিতের



আমি যখন রেকর্ডেড মিউজিককে আমার মতন এডিট করেই ব্যবহার করতে পারছি, যেটা ওঁরা আদৌ করেননি, তখন আমিই করি না আবহসঙ্গীতটা ! ১৯৬১ সালে আমি "তিন কন্যা" ছবিতে প্রথম আবহসঙ্গীত রচনা করি। প্রথম দিকটায় খুবই কঠিন লেগেছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে উঠল।



"নষ্টনীড়" গল্পের বিষয় : প্রেমের দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমি— সব মিলিয়ে যে একটা পিরিয়ডিক্যাল সুররিয়ালিজম, রোম্যান্টিকতা, সময় ও কালের কাব্যময়তা— তাকে সত্যজিৎ সহজেই সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে পেরেছেন, যাকে বলে একেবারে সার্বিক সফলতা।



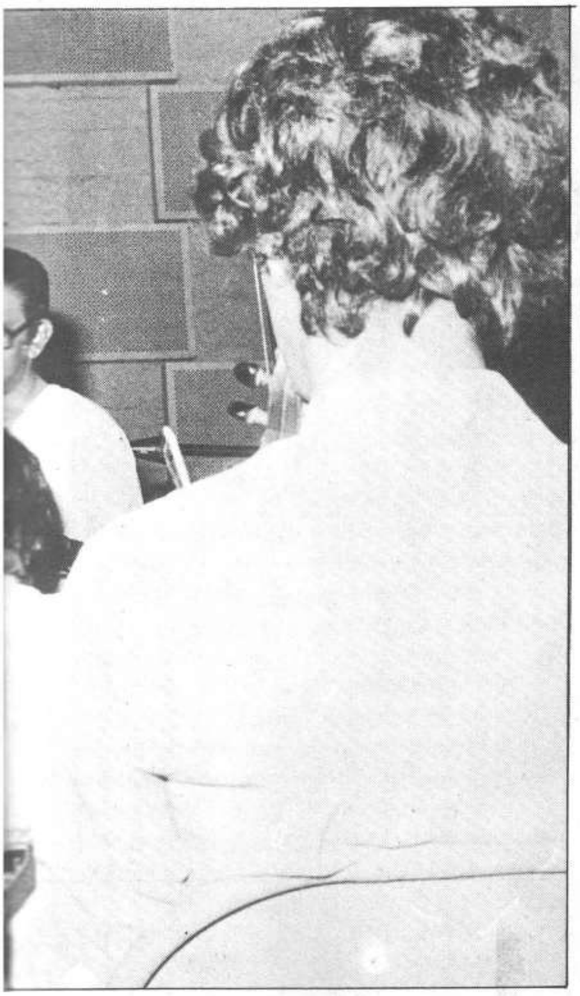
নিমাই ঘোষ

• ছবির জন্য সঙ্গীতগ্রহণ করছেন সঙ্গীতপরিচালক সত্যজিৎ রায়। ছবিতে অলোকনাথ দে ও অন্যান্যরা

ছবির মতই সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বার বার উল্লেখ করতে হয়।

যেমন ধরা যাক, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"র কথা। সেখানে একটি পরিবারই ছবির মূল চরিত্র কিন্তু মূল লক্ষ্য হচ্ছে "কাঞ্চন-জঙ্ঘা"— যার তুষারাবৃত কুয়াশাচ্ছন্ন শরীরটাও ওই পরিবারের আভ্যন্তরীণ দুঃখ, বেদনা, অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবারের মাথা রায়বাহাদুর (আধুনিক সামন্ততন্ত্রের নয়া ফিউডাল লর্ড, ব্রিটিশ শাসনের আপোষহীন পৃষ্ঠপোষক) এবং তাঁর পরিবারের আত্ম অহমিকার আবরগুলি ক্রমশ খুলে যেতে থাকে, কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশাও ক্রমশ খুলতে থাকে। অবশেষে তাঁর নির্বাচিত পাত্রকে কন্যার প্রত্যাখ্যান, যে বেকার যুবককে শ্রেণীগত আত্মঅহমিকায় তিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েও তার আত্মমর্যাদার কাছে হোঁচট খান, সেই ছেলেটির সঙ্গে রায়বাহাদুর কন্যার কথোপকথন ও বন্ধুত্ব স্থাপন,—এসব দেখে রায় বাহাদুরের আত্মম্ভরিতা যখন প্রচণ্ডরকম হয়ে পরিবারের সবাইকে খোঁজে, তখন কেউ নেই তাঁর পাশে। তিনি একা, নিঃসঙ্গ, এ্যালিয়েনেটেড ! যেন সবাই তাঁকে ত্যাগ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার কুয়াশাও ধীরে ধীরে কাটছে— আর আমরা দেখতে পাই সেই পাহাড়ী শিশুটি খোলা গলায় গান গাইছে (রায়বাহাদুর নির্বাচিত স্যুটারের হাত থেকে নেওয়া চকোলেটটি নিয়ে) ক্রমে সেই সুরটাই নানা বাদ্যযন্ত্রের সম্মেলনে ফোক টিউনে ব্লেন্ডেড হয়ে এক অসাধারণ অর্কেস্ট্রেশন রূপ নেয়। যার অর্থ— রায়বাহাদুরের ফিউডাল ভ্যালুম পরাজিত হয়েছে তাঁর পরিবারের কাছে, যাঁরা তাঁর এই প্রভুত্ববাদকে মেনে নিতে পারছেন না। যেমন স্ত্রী, কন্যা, জামাই এবং শ্যালক। তাই আমরা দেখতে পাই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সমস্ত কুয়াশা সরিয়ে রোদের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। সে যেন ঠিক আধুনিক মূল্যাবোধ ও প্রগতিরই জয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। রক্ষণশীল সামন্ত মূল্যবোধের পরাজয়ই যেন প্রমাণিত হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার আশ্চর্য সুন্দর মূর্ত রূপে।

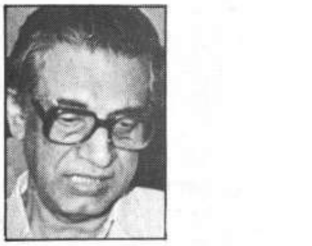
এখানে বলা প্রয়োজন, "কাঞ্চনজঙ্ঘা"য় সঙ্গীতের ব্যবহার খুবই কম। প্রাকৃতিক শব্দ, জন্তু জানোয়ারের পায়ের শব্দ, গলায় বাঁধা ঘণ্টির শব্দ, মিলিটারি ব্যান্ড— এগুলোই সঙ্গীতের জায়গা



দখল করে এক একটা মুহূর্তের অসাধারণ অর্থ তৈরি করেছে। বস্তুত "কাঞ্চনজঙ্ঘার" স্ট্রাকচারটাই এত মিউজিকাল যে এখানে বাড়তি সঙ্গীতের ব্যবহার পরিত্যজ্য ছিল। মনে হয় সত্যজিৎও সেটাই জানতেন। তাই ছবির চিত্রনাট্যের সাঙ্গীতিক চেহারাটা এত উচ্চস্তরের যে মিউজিক ছাড়াই ছবিটি সেই মানে (স্ট্যান্ডার্ডে) পৌঁছে যায় সহজেই তার স্বাভাবিক শৈল্পিক উৎকর্ষে।

অবশ্য সত্যজিতের সবচেয়ে পরিণত আবহসঙ্গীত "চারুলতা"য়। আসলে একের পর এক ছবির আবহসঙ্গীত রচনা করতে করতে কান, চেতনা, অভিজ্ঞতা সবই অনেক সমৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া "নষ্টনীড়" গল্পের বিষয় : প্রেমের দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমি— সব মিলিয়ে যে একটা পিরিয়ডিক্যাল সুররিয়ালিজম, রোম্যান্টিকতা, সময় ও কালের কাব্যময়তা— তাকে সত্যজিৎ সহজেই সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে পেরেছেন, যাকে বলে একেবারে সার্বিক সফলতা। চারু-অমলের সম্পর্কের ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অমলের উচ্ছ্বাস, চারুর একাকিত্ব এবং অমলের প্রতি তার দুর্বার অবৈধ টান, আবার ভূপতির প্রতিও নীরব দায়িত্ববোধ, চারুর অমলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গল্প লেখার দৃশ্য ইত্যাদি বা এইসব নীরব বা সরব মুহূর্তে বাগানের প্রাকৃতিক পরিবেশকে চলচ্চিত্রের ভাষায় ধরেও কত সংযতভাবে একেবারে কোমল মিউজিক ব্যবহার করে মনের উদ্বেলতা প্রকাশ পেয়েছে। গ্রামের স্মৃতি, তারপর জেদ থেকে গল্পের জন্ম দিয়ে অমলকে চ্যালেঞ্জ— এসব দৃশ্য বিনা সঙ্গীতে ভাবা যায় না, আবার সঙ্গীতটাও ফুটিয়ে তোলে সেই শ্রেণীকে, যার একটা সফিস্টিকেশন আছে, আভিজাত্য আছে। "চারুলতা"র টাইটেল মিউজিক নিঃসন্দেহে অসাধারণ। টাইটেলের সঙ্গে সঙ্গে মিউজিক চলে আর তার সঙ্গে দেখা যায় চারুর হাতে তৈরি হচ্ছে ভূপতিকে উপহার দেওয়ার জন্য একটি রুমাল,— যে রুমাল শেষ পর্যন্ত ভূপতির চোখের জলে ভিজে ওঠে,— যে রুমাল শেষে দু'জনের ভাঙ্গা মনকে জোড়া দিতে পারল না। কিন্তু এই যে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে..." এই কথার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে নষ্টনীড়ের মূল গন্ধা। এমন সুর এবং সঙ্গীতের ব্যবহার ভারতবর্ষের কোন ছবিতে পাওয়া যায় ? নেই ! একেবারে নেই ! তথাপি, এর চেয়েও সঙ্গীত চেতনার অসাধারণ দৃষ্টান্ত,— যখন চারু তার নিঃসঙ্গতাকে ঘোচাবার জন্য বই খুঁজতে যায় এবং তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বই বার করতে করতে সুর করে গেয়ে ওঠে, "বঙ্কিম—বঙ্কিম !" অসাধারণ এই ভাবনা, যা গানের চেয়েও অনেক বেশি শৈল্পিক এবং বাস্তব। কিংবা দোলনায় বসে খালি গলায় "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে...." এখানে অন্য কোন পরিচালক হলে বলেই ফেলতেন, "বড় ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে, অন্তত একটু ভাইব্রোফোন দাও, দু-একটা সেতারের স্ট্রোক !" না, শিল্পী তা করতে দিতে পারেন না ! কারণ, তিনি চলচ্চিত্রের বাস্তব ভাষা বোঝেন, তাই তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গীতও বোঝেন সম্যকভাবে। তাই না কত আত্মবিশ্বাস আর আস্থার জোরে তিনি ধীরে ধীরে সঙ্গীতের ব্যবহার কমিয়ে দিতে থাকলেন "প্রতিদ্বন্দ্বী", "অরণ্যের দিনরাত্রি" থেকে "সদ্গতি"— "পিকু" পর্যন্ত !

একেবারে মিউজিক না দিলেই নয় যেখানে, শুধু সেখানে মিউজিক ব্যবহার করেছেন। যেটা বার্গম্যান বহু আগেই করেছেন। তবু যে ছবি সঙ্গীতের জন্য, গানের জন্য— সেখানে সঙ্গীত ও গানের প্রচুর ব্যবহারও অপরিহার্য। সত্যজিৎ এক্ষেত্রে আর এক বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন যা পৃথিবীর অন্য কোন পরিচালক (চ্যাপলিন ছাড়া) রাখতে পারেন নি। গান লিখে তাতে সুর দিয়েও তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে গেলেন। উদাহরণ— "গুগা বাবা", "হীরক রাজার দেশে"। কী করে তিনি এমন গানের সুর রচনা করতে পারলেন ? তিনি কি গান গাইতেন ? উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন— "পারিবারিক সূত্রে গান আমার রক্তেই ছিল। কিন্তু গান আমি গাইনি। কেননা আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম।



সঙ্গীত চেতনার অসাধারণ দৃষ্টান্ত, যখন চারু তার নিঃসঙ্গতাকে ঘোচাবার জন্য বই খুঁজতে যায় এবং তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বই বার করতে করতে সুর করে গেয়ে ওঠে, "বঙ্কিম-বঙ্কিম !" অসাধারণ এই ভাবনা, যা গানের চেয়েও অনেক বেশি শৈল্পিক এবং বাস্তব।


বেনারসী
রামকানাই
যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাঃ লিঃ
সহযোগী সংস্থা
রামকানাই
রমণীকান্ত পাল
বড়বাজার □ কলকাতা



● 'মিউজিক অফ সত্যজিৎ রে' তথ্যচিত্রের সেটে সত্যজিৎ রায়, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা

স্কুলে প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হলে পুরস্কার নিতে হবে, দু-চার কথা বলতে হবে— এটা আমার কাছে সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। ফলে গান সেভাবে গাইনি কখনও। আমার ভীষণ নার্ভ টেনশন হত! কিন্তু গুনগুন করে বাথরুমে যে গাইনি তা নয়! আসলে গান আমার ভিতরের ব্যাপার, ভালবাসার ব্যাপার! মিউজিক ইজ মাই ফার্স্ট লাভ। যেমন, আমার মাসী কণক বিশ্বাস, বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন। কিন্তু গান গাইতে গেলেই নার্ভাস হয়ে পড়তেন!"

প্রশ্ন করেছিলাম, "গুগাবাবা"র আগেও কি আপনি গানে সুর দিয়েছিলেন?"

সত্যজিৎ বললেন— "হ্যাঁ, "চিড়িয়াখানা"য়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল, "চিড়িয়াখানা"য় একটি গানে শুধু সুর নয়, কথাও লিখেছিলেন তিনি। গানটি ছিল "ভালবাসার তুমি কী জানো? বিস্ময় লাগে ভাবতে, সেই নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির অভিজাত মন এবং চাহিদা অনুযায়ী এই গানটি তিনি কম্পোজ করেছিলেন। যা অক্ষরে অক্ষরে সেই যুগের মানসিকতাকেই তুলে ধরে। উনি যে একজন যথার্থ সুর স্রষ্টা, তার প্রমাণ মেলে "গুগা বাবা"তে। "গুগা বাবা"র গান শুনে যে কারণে অভিভূত হই, সেটা হল—এর সরলতা। সহজ ইংরেজি এবং বাংলায় কোন কথা বলা, গদ্য লেখা, পদ্য লেখা অত্যন্ত কঠিন। যিনি সেটা পারেন তিনি অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি। তারই প্রমাণ "গুগা বাবা"! মার্গ সঙ্গীতের ভিত্তিতেই তিনি গুগা বাবার বিভিন্ন গান রচনা করেছেন। অথচ সেই গানগুলি ব্যাকরণের চাপে অবনত নয়। যেমন "দেখরে নয়ন মেলে... দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার;" ভৈরবীর সুরে এই গান বাঁধা। একটু বেচাল হলেই ঠুংরীর চলন যেখানে ঢুকে পড়তে পারত, সংযতভাবে একটি সাপাট তান দিয়েই গানটিকে সম্পূর্ণ করেছেন। এখানেই সঙ্গীত পরিচালকের মুন্সীয়ানা। অথচ "বাঘারেগুপীরে, এবার কেটে পড়ি..." গানে কর্নাটকী ধ্রুপদী গানের আঙ্গিক রেখেও মজাটা জমে ওঠে। "বাঘারে বাবারে পালারে..." এই কথাগুলি কিন্তু আসলে তানকারিরই আধুনিকীকরণ। কিন্তু কী অপূর্ব কী সরল এই সঙ্গীতের ব্যবহার। "হীরক রাজার দেশে"র "পায়ে পড়ি বাঘ মামা" গানটির নিখুঁত কর্নাটকী স্টাইল ও সুর এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখনীয়। ধ্রুপদী গানের সম্পূর্ণ মেজাজ বজায় রেখেও সরগম ব্যবহার না করে সে জায়গায় "থাক...বাবা...বাবারে" এইভাবে কথা বসিয়ে গাওয়ানো হয়েছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতের ছায়ায় থেকেও অনবদ্য হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

"মহারাজা তোমারে সেলাম"— বাংলার লোকসঙ্গীত এই গানের পটভূমি। কিন্তু নিছক অনুকরণের ছাপ কোথাও মিলবে না। অথচ গান না বোঝা দর্শক-শ্রোতার কানেও সহজেই এর সুর খাপ খেয়ে যায়। যাত্রা-কথকতার স্টাইলে "ও মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্রী মশাই" বা "এক যে ছিল রাজা তার ভারী দুখ" সিচ্যুয়েশনের মুড অনুযায়ী দুই জায়গায় দু রকম। কিন্তু সত্যজিতের সঙ্গীত চেতনার পাশ্চাত্য মেজাজকে এ সব গানে ধরা যায় না। অথচ "ও মন্ত্রীমশাই" বা "ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে" দুটি গানেই প্রচ্ছন্ন আছে পাশ্চাত্য সুর। তবু তার প্রাচ্যকরণের ফলে তাকে আলাদা করে বিদেশী বলে চিনবার উপায় রাখেন নি সত্যজিৎ।

এইখানেই না সত্যজিতের শৈল্পিক সহমর্মিতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ! পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ভাণ্ডারের সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা আছে কিন্তু কোথাও বশ্যতা নেই কারো কাছে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা—মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টানের ফলেই সব কিছুই হয়ে উঠেছে ভারতীয় সঙ্গীত ও তার ঐতিহ্যের চরম পরিণতি। এই আত্মীকরণেই নাম ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীত এবং সত্যজিৎ। শুধুমাত্র চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যই শ্রদ্ধায় বলতে ইচ্ছে করে— "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।"



সত্যজিৎ এক্ষেত্রে আর এক বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন যা পৃথিবীর অন্য কোন পরিচালক (চ্যাপলিন ছাড়া) রাখতে পারেন নি। গান লিখে তাতে সুর দিয়েও তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে গেলেন। উদাহরণ— "গুগা বাবা", "হীরক রাজার দেশে"। কী করে তিনি এমন গানের সুর রচনা করতে পারলেন?



বিদেশে সত্যজিৎ



বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ বিদেশী দর্শক এবং সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছেন প্রথম ছবি থেকেই। তাঁর ছবির নান্দনিক গুণ অভিভূত করেছে সারা বিশ্বের দর্শকদের। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় সত্যজিৎ কেমনভাবে প্রশংসিত তাই নিয়ে লিখেছেন **স্বপনকুমার ঘোষ**

১৯৮৪। মে মাসের কোনও একদিন। সুদূর কান-এ একটি প্রাচীন রেস্তোঁরায় বসেছিলাম আমরা কয়েকজন। আমি, সাংবাদিক মধু জৈন এবং ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের তদানীন্তন সহ-অধিকর্ত্রী বিন্দু বাত্রা। পরের দিন সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' দেখান হবে কান-এর প্রতিযোগিতায়। ফলে আমাদের আলোচনার বিষয়ও ছিল 'ঘরে বাইরে'। এন এফ ডি সি ছবিটির প্রযোজক। প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে সেখানে হাজির ছিলেন মালতি তাম্বে বৈদ্য, রবি মালিক প্রমুখ। অসুস্থতার জন্য সত্যজিৎ অনুপস্থিত। তবে ছবিটির সূত্রে সেদিনই কান-এ এসে পৌঁছেছিলেন সন্দীপ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় এবং অনিল চৌধুরি। দীর্ঘ ২৬ বছর পর কান-এ আবার সত্যজিতের ছবি। মুখে মুখে প্রচার ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু ছিল না পোস্টার, হোর্ডিং, অন্যান্য বিজ্ঞাপন। সেসব নিয়েই আমরা তখন কফির পেয়ালায় তুফান তুলেছি। পদে পদে এন এফ ডি সি কে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল। দায়ী করা হচ্ছিল এন এফ ডি সি-র অপদার্থতাকে। রেস্তোঁরার এক বৃদ্ধ ওয়েটার আমাদের কফি পরিবেশন করতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে, হয় ত আমাদের কথাই মন দিয়ে শুনছিলেন। ভদ্রলোক ফরাসি, ইংরাজি জানেন, সেটা বোঝা গিয়েছিল যখন তিনি আমাদের কাছে অর্ডার নিতে আসেন। হঠাৎ আমাদের উত্তেজিত আলোচনা থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'কোনও দরকার নেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবির পোস্টার এখানে না লাগালেও কোনও ক্ষতি হয়নি। কারণ ফ্রান্সের চিত্র রসিকরা অন্তত এক মাস আগে কান-এর প্রচার মাধ্যম দ্বারা অবহিত হয়েছেন যে এবার এখানে মিস্টার রে'র নতুন ছবিটি আসছে। ২৬ বছর পর কান-এ রে। কত বড় ঘটনা। আমি 'পথের পাঁচালি' এখানেই দেখেছি। তখন ওল্ড প্যালেসে উৎসব হ'ত। 'ঘরে বাইরে'ও দেখব।



• সত্যজিৎ রায় ও ডেভিড রবিনসন

এবং সত্যজিতের ছবি



আমি ইতিমধ্যে একটা প্রবেশপত্রও সংগ্রহ করেছি।' আমরা সকলে অবাক হয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম। এত বছর পরেও ফরাসিরা সত্যজিতকে মনে রেখেছেন ? এবং রেস্তোঁরার সামান্য এক ওয়েটার পর্যন্ত ?

কানের নতুন সিনেমা প্যালেস। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। একাধিক ভিডিও ক্যামেরা সজাগ, সতর্ক। আলো ঝলমল পরিবেশ। কয়েক ধাপের সিঁড়িতে লাল কার্পেট। 'ঘরে বাইরে'-র অফিসিয়াল স্ক্রিনিং। মূল প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন উৎসব অধিকর্তা জিল জ্যাকব। 'ঘরে বাইরে'র ইউনিটের সদস্যদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। উৎসাহী দর্শকদের ভিড় ততক্ষণে নিরাপত্তাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, শাল গায়ে ষোলো আনা বাঙালি হিসাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন সৌমিত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ, স্বাতীলেখা এবং অনিলবাবু। দর্শক খুঁজছেন রে-কে, কোথায় মিস্টার রে ? দেশ-বিদেশের সাংবাদিক এবং সমালোচকদেরও তীব্র কৌতূহল, নানান প্রশ্ন। জিল জ্যাকবের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, 'মিস্টার রে আসেননি, এই অভাবটা কোনও ভাবেই পূরণ হওয়ার নয়।' পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একসময় শো শুরু হল। শো ভাঙল। শো ভাঙার পরেও বাইরে বেরিয়ে দেখি সত্যজিতের ইউনিটের সদস্যদের অভিনন্দন জানবার জন্য দর্শক তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। সৌমিত্রদের ওপর সান গান-এর আলো পড়ল। ভিডিও ক্যামেরাগুলি সচল হয়ে উঠল। এরই মধ্যে কোনও দর্শক খুঁজে চলেছেন কোথায় মিস্টার রে। শশী কাপুর বাণিজ্য বিভাগে তাঁর 'উৎসব' ছবিটির প্রদর্শনের জন্য কান-এ ছিলেন। তিনি সে-রাত্রে 'ঘরে বাইরে'-র ইউনিটকে অভিনন্দিত করার জন্য একটি পার্টি দিয়েছিলেন দূরে এক ভিলায়। সেখানে বাণিজ্য-সূত্রে কান-এ আগত আর ডি বনশল এবং কমল বনশলও গিয়েছিলেন। আমেরিকা এবং ইয়োরোপের সাংবাদিক, সমালোচক এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা তো ছিলেন'ই। সেখানেই 'ঘরে বাইরে' নিয়ে আমার সঙ্গে কথা হল খ্যাতিমান বৃটিশ চিত্র সমালোচক ডেভিড রবিনসন, জন গিলে, ডেরেক ম্যালকম প্রমুখের সঙ্গে। সত্যজিতের ছবির সঙ্গে এঁদের তিন জনেরই সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। পাশ্চাত্যে সত্যজিতের ছবির প্রসারে এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। 'ঘরে বাইরে' প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি জনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কীভাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি পাশ্চাত্যে গৃহীত হয়েছে ? একেবারে প্রথম দিকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আপনি লক্ষ্য করেছেন ? কেন আজও সত্যজিতের ছবির প্রতি আপনাদের এত উৎসাহ ? জন একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলেন। বলে চললেন, 'সত্যজিতের প্রথম দিককার ছবিগুলো সম্পর্কে অনেক বলা হয়েছে। নতুন করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। সামগ্রিক বিচারে আমি কেবল এটাই বলতে পারি, পাশ্চাত্যে তাঁর ছবি বারবার গৃহীত হয়েছে কারণ একটাই, সত্যজিতের ছবিতে এক আশচর্য মানসিকতা প্রতিবিম্বিত হয়, যে প্রতিবিম্বে আমরা নিজেদের ভিতরটা দেখতে পাই। একেবারে পথের পাঁচালি থেকে যদি শুরু করি তাহলে আমরা দেখি ছবিটির মধ্যে শুধু পারিবারিক ট্রাজেডি নয়, গ্রামীন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, হতাশা, আনন্দ—সব কিছু ফুটে উঠেছিল নিখুঁতভাবে। পথের পাঁচালি-র আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ বিচূর্ণ হল 'অপরাজিত'-তে। তবুও কিন্তু চূড়ান্ত কোনও অসহায়তা লক্ষ্য করা গেল না। দেখা গেল ছবিটির মধ্যে দানা বেঁধেছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা। আশ্চর্য এক জীবনের উত্তাপ সত্যজিতের প্রথম দিককার ছবিগুলির সম্পদ।' ডেভিড রবিনসন বললেন, 'ভারতীয় জীবনের সত্যতা, বাস্তবতা বর্ণনায় সত্যজিৎ সৎ বলেই তাঁর কৃতিত্ব এত বেশি।' ডেরেক ম্যালকম সত্যজিতের প্রথম দিককার ছবিগুলি নিয়েই বেশি মুখর হয়ে থাকেন। 'ঘরে বাইরে' প্রসঙ্গ



● সত্যজিৎ রায় ও আকি'রা কুরোসাওয়া

সেখানে বার বার ফিরে এলে তিনি এটুকুই বলেন, 'সত্যজিতের মেজর ছবিগুলির সঙ্গে ঘরে বাইরে-কে আমি মেশাতে পারি না। এখানে, আমার যেটা মনে হয়, প্রত্যাশিত সত্যজিৎ অনেক জায়গায় অনুপস্থিত। তবু পাশ্চাত্যের সাধারণ দর্শকদের কাছে ঘরে বাইরে 'আশাভঙ্গ' হিসাবে চিহ্নিত হবে না।'

পেনিলোপ হাউসটনের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ফ্রাসোয়াঁ ত্রুফো কান-এ 'পথের পাঁচালি' দেখতে দেখতে উঠে চলে গিয়েছিলেন। ভারতীয় দারিদ্র নিয়ে তৈরি কোনও ছবি দেখার মতো স্পৃহা হয়ত তাঁর ছিল না। তারপর ছবিটি যখন কান-এ শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসাবে স্বীকৃত হয় তখন তীব্র সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি ত্রুফো। সেটা কোথাও লিখেছিলেন বিখ্যাত ফরাসি চিত্র সমালোচক মিশেল সিমোঁ। তিনি পরে একটি লেখায় সত্যজিতের ন'টি ছবি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন, (অপুর সংসার প্রসঙ্গে) 'সত্যজিতের শিল্প প্রকৃত পক্ষে এক কাব্যিক সত্যের অন্বেষণ। তির্যক সংলাপের অথবা পল্লবিত কাহিনী নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রেম নিজেকে প্রকাশ করে না। বরং নারীর গুণ্ঠন সজ্জিত মস্তকের ঈষৎ সঞ্চালনে কিংবা তার ইতস্তত কটাক্ষে অথবা তার ভঙ্গিল কলহাস্যের ভিতর দিয়ে সত্যজিতের জগতে প্রেম আভাসিত হয়। অথচ এই বলিষ্ঠ প্রতীকী কাহিনীর মধ্যে নিও রিয়ালিজমের ব্যাপার নেই। সারাদিনের সমগ্র কর্মকাণ্ডকে তিনি ত্রিশটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে সংহত করতে পারেন, আর জানেন নিপুণ ক্যামেরার সঞ্চালনে কী করে বিরাট এক প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুলতে হয়।... আমাদের সচেতন করে তোলে যে কী উদ্দেশ্যে এবং কী শৈলীতে এর মধ্যে পুরাতন সিনেমাটোগ্রাফিক ঐতিহ্য এবং অতি আধুনিক নিরীক্ষার সমন্বয় ঘটেছে। সত্যজিতের মাধ্যমে আমরা এমন একজন পরিচালকের পরিচয় লাভ করি যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের বলে সর্বদা আমাদের আগ্রহকে জাগিয়ে রাখেন।'

'অপরাজিত'-র জন্য ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'স্বর্ণসিংহ' পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। অপ্রতিহত তখন তাঁর জয়যাত্রা। কান-এ 'পথের পাঁচালি'-র স্বীকৃতি, ভেনিসে বড় মাপের পুরস্কার প্রাপ্তি। ১৯৫৯-এ এল সত্যজিতের তৃতীয় ছবি 'অপুর সংসার', আবার ভেনিসে। ততদিনে সেখানে সত্যজিতের তৃতীয় ছবিকে কেন্দ্র করে ইতালিতে একটি বিরোধী চক্র তৈরি হয়। ইতালির দুই প্রযোজক ভেনিস উৎসব কর্তৃপক্ষের নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইতালির একাধিক ছবির অন্তর্ভুক্তির দাবিও জানালেন। তারপর দেখা গেল, রহস্যজনকভাবে 'অপুর সংসার' ভেনিসের প্রতিযোগিতায় স্থান পাচ্ছে না। মনোনীত হল প্রতিযোগিতার বাইরে দেখাবার জন্য। বিরক্ত সত্যজিৎ ভেনিসের এই মনোনয়ন মেনে নিলেন না। ছবিটি তুলে নিলেন উৎসব থেকে। তৎক্ষণাৎ বিশ্বের চলচ্চিত্র সাংবাদিক এবং সমালোচকরা উৎসব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সোচার হয়ে উঠলেন। ১৯৫৯, ১০ সেপ্টেম্বর 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ লেখা হল, 'দ ইন অ্যাডিকোয়েসি অফ দ্য অফিশিয়াল সিলেকশন ওয়জ মেড ইভন মোর অ্যাকিউট বাই দ্য অ্যাবসেনস অফ দ্য থার্ড পার্ট অফ সত্যাজিৎ রে'জ বেঙ্গলি ট্রিলজি, দ্য ওয়র্ল্ড অফ অপু হুইচ ওয়জ ডিনাইড অফিশিয়াল এনট্রি অ্যাপারেন্টলি বিক'জ দ্য কমিটি ফেল্ট—ইট ওয়জ র‍্যাদার সিমিলার টু প্রিসিডিং পার্টস। দ্য এক্সট্রিম ইল-লজিকালিটি অফ দিস অ্যাটিচুড বিকেম অ্যাপারেন্ট হোয়েন আ স্মল গ্রুপ অফ জার্নালিস্টস অ্যান্ড ফিল্ম মেকারস স দ্য ফিল্ম প্রাইভেটলি অ্যাট আ লিটল ডাউনটাউন সিনেমা।' দ্য অবজারভার-এ প্যাট্রিক বেকার লিখলেন, 'দ্য বেস্ট ফিল্ম অফ দ্য ফেস্টিভ্যাল ওয়জ রিফিউজড বাই দ্য ফেস্টিভ্যাল কমিটি।' লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব 'ফেস্টিভ্যাল আ ফেস্টিভ্যালস' নামে অভিহিত। ভেনিস, বার্লিন, কান এবং মস্কোতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি তখন সেখানে ঠাঁই পেত। এবং এটাই ছিল অলিখিত নিয়ম। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল 'অপুর সংসার'-কে কেন্দ্র করে। দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত হল 'অপুর সংসার'। কেবল লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে স্থান পেল, তা নয়, পেল বিশেষ স্বীকৃতি মাদারল্যাণ্ড ট্রফি।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলেও ইংলন্ডের সমালোচকরা বিস্মিত হতেন না। অন্ততঃ সানডে টাইমসের পিটার গ্রেহাম। বার্লিনে ছবিটি শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎকে এনে দেয় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান। অথচ এই 'চারুলতা' কান-এ জায়গা পায়নি। গ্রেহাম তখন বলেছিলেন, 'কান উৎসবে ছবিটি জায়গা পায়নি, কথাটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য।' ডেলি টেলিগ্রাফের এরিক শর্টারের মনে হয়েছিল, 'বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের হরেক রকম চেঁচামেচি আর ধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে মত্ততার ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ ভারতের স্বর শোনা গেল। ধীর, শান্ত এই স্বর—অথচ অর্থপূর্ণ।' মারি সিটন সত্যজিৎ রায়ের গুণমুগ্ধ। তিনি সত্যজিতের বহু ছবির প্রশংসা করতে অন্যের বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন বার বার। তাতেও পিছপা হননি মারি। একবার তিনি বলেও ছিলেন, 'প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা করে অজস্র বিপদবরণে আমি রাজি আছি। জীবনে কয়েক বার আমি এরকম অবস্থায় পড়েছি, প্রত্যেকবারই প্রমাণিত হয়েছে আমি ভুল করিনি।'

১৯৯০। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। ১৯৫৭-তে ভেনিসে প্রদর্শিত হয়েছিল 'অপরাজিত'। সম্ভবত তার পরে ভেনিসে প্রতিযোগিতায় কী প্রতিযোগিতার বাইরে সত্যজিতের কোনও ছবি দেখান হয়নি। তার অর্থ হল ৩২/৩৩ বছর পর আবার ভেনিসে সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'আগন্তুক'। এখানেও এক দৃশ্য দেখি। উৎসবের কেন্দ্রে বা তার আশে পাশে কোনও পোস্টার বা হোর্ডিং চোখে পড়ে না। প্রচার মাধ্যমকে প্রায় অবহেলা করেই প্রদর্শিত হয়ে যায় 'আগন্তুক'। প্রথম

প্রদর্শনী ছিল ভেনিসের নবনির্মিত আড়াই হাজার আসন বিশিষ্ট প্যালা গ্যালিলিও প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে গিয়ে আমি বিস্মিত। আমার চোখের সামনে মিনিট পনেরোর মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় ভরে যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমালোচক, চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজকদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। আমার পাশেই বসে ছিলেন রুশ চিত্র পরিচালক নিকিতা মিখালকভ। ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায়। ঠিক যে যে জায়গায় বাঙালি দর্শক হিসাবে আমি রি-অ্যাক্ট করি, দেখি মিখালকভও করছেন। প্রেক্ষাগৃহ শুদ্ধ প্রায় সকলে। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে। সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে করতালিতে অভিনন্দন জানাতে থাকেন সত্যজিতকে। এক নাগাড়ে তিন মিনিট ধরে করতালি অব্যাহত থাকে। প্রেক্ষাগৃহের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন উৎসব অধিকর্তা নিউগিয়েলমো বিরাগি। তিনি বলেন, 'আমি ছবিটি নির্বাচন যখন করি তখনই জানতাম এ-ছবি দর্শক উপভোগ করবেন। ইতালিয়ন সাবটাইটেল দেন এন এফ ডি সি। ইংরেজি সাবটাইটেল-এ ছবি দেখে ইতালির দর্শকও এভাবে ছবিটি গ্রহণ করবেন, সেটা আমি ভাবিনি। আগন্তুক অসাধারণ বিষয়। ছবিটি দেখার পর দর্শকের মননকে স্টিমুলেট করতে বাধ্য।' প্রবীণ ইতালিয়ান চিত্র সমালোচক লিনো মিচোকে সত্যজিতের গুণমুগ্ধদের একজন। 'অপুর সংসার'-এর প্রত্যাখ্যানের সময় তিনিও সরব হয়েছিলেন। 'অপরাজিত'-র স্মৃতি এখনও ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারেননি মিচিকে, যায় না বলে। বললেন, 'সত্যজিৎ অপরাজিত। সময়ের কাছেও তাঁর প্রতিভা হার মানেনি!'



• সত্যজিৎ রায় ও দেপার্দিউ
• সত্যজিৎ রায় ও বার্গম্যান



নিমাই ঘোষ

• সত্যজিৎ রায় ও পিটার সেলার্স



নিমাই ঘোষ

বিদেশী সমালোচকদের কিছু মন্তব্য

এডওয়ার্ড ও গারগ্যান

[নিউ ইয়র্ক টাইমস]

বুনুয়েল বা রেনোয়া বা ডি সিকা কিংবা ফেলিনি কী কুরসাওয়ার মতো সামগ্রিক ভাবে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রকর্ম সবসময় চিন্তাশীল মানুষদের উজ্জীবিত করে, ভাবায়, মহত্তর জীবনের সন্ধানে নিয়ে যায়।

ড্যানিয়েল ট্যালবট

[প্রগ্রেসিভ]

হলিউডের ছবি ক্রমশই স্থূল থেকে স্থূলতর হচ্ছে। 'অপুর সংসার'কে মাস্টারপিস বললে কোনওরকম অত্যুক্তি হয় না। বাইসাইকেল থিফ-এর পর অন্য কোনও ছবি আমাকে এইভাবে নাড়া দেয়নি।

আর্থার নাইট

[স্যাটারডে রিভিউ]

'অপারাজিত' ছবিতে গোড়া থেকেই দেখা যায় চরিত্রের প্রতি সত্যজিতের একটা ভাবনা রয়েছে। সাধারণ ঘটনাকে তিনি এমনভাবে শিল্পায়িত করেন যে তা মুহূর্তে ইমেজধর্মী কবিতায় পরিণত হয়, কিন্তু বাস্তববোধ এতটুকু মলিন হয় না।

পলিন কেল

['আই লস্ট অ্যাট দ্য মুভিজ' গ্রন্থে]

অপুর গল্প তিনটি মাস্টারপিস এবং বহু প্রশংসিত। এই ছবি তিনটি আমেরিকান দর্শকরা খুব কম দেখেছে। ওরা বোধহয় 'ডেনিস অ্যান্ড লিসা' অনেক বেশি দেখেছে। 'দেবী' হয়ত আরও কম দেখেছে। বার্গম্যানও প্রথম দিকে আমেরিকান দর্শকদের মন জয় করতে পারেননি, কিন্তু শেষ অবধি জয় করে ছেড়েছেন। সত্যজিৎ পারবেন না কেন?

পেনিলোপ হাউসটন

[সাইট অ্যান্ড সাউন্ড]

চারিদিকে যখন নিও-রিয়ালিজমের ছড়াছড়ি তখন সত্যজিৎ রায়ই ছবিতে মানবিকতা সম্পন্ন পুনরুজ্জীবন এনেছেন। যদিও 'পথের পাঁচালি'-তে সার্বজনীন ট্রিটমেন্ট আছে, কিন্তু তাঁর পরের ছবিগুলি বেশ জটিল। 'জলসাঘর'-এর জমিদার, যিনি স্বার্থপর, কুটিল, কিন্তু সৌন্দর্যের পূজারী। নিজের হৃতসর্বস্ব জমিদারি, একটি মাত্র হাতীর জমিতে পদচারণা যেন আগামী দিনের জমিদারের কাছে হাস্যকর হয়ে ওঠে। আর লরিগুলো বিকট শব্দ করে যান্ত্রিক সভ্যতার যে ঘোষণা ক'রে রাস্তার ওপর দিয়ে চলে যায়!

জন রাসেল

[ফিল্ম অ্যান্ড ফিল্মিং]

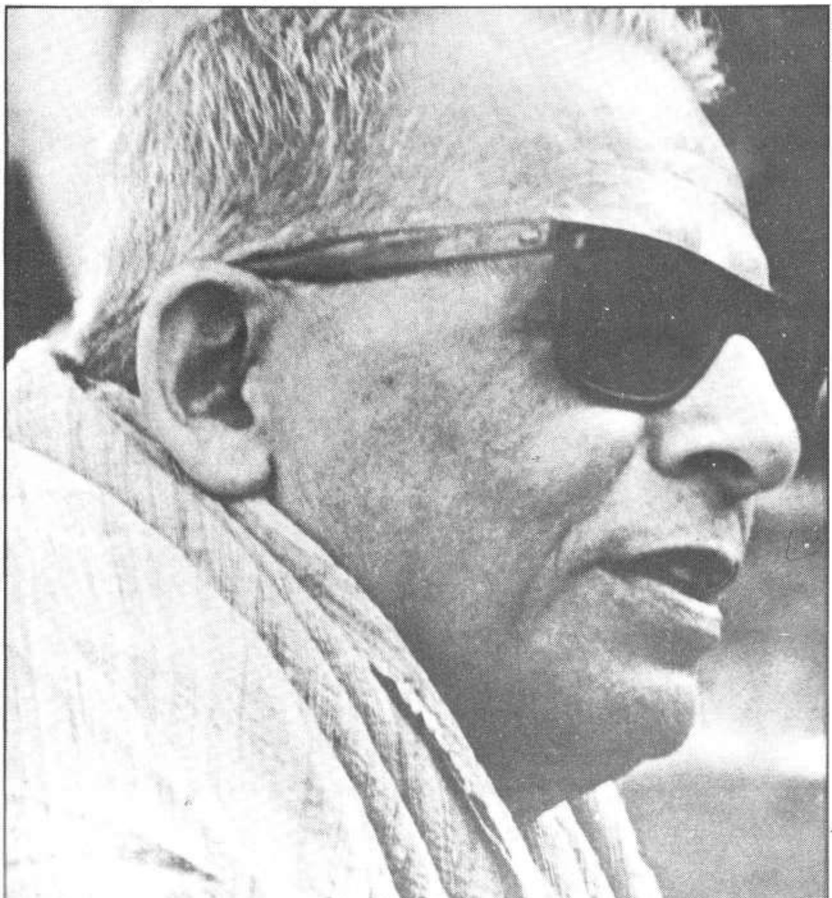
পাশ্চাত্যের পক্ষে সত্যজিৎ রায়ের ছবি বোঝা একটু শক্ত। অনেকে এও মনে করেন তাঁর ছবিগুলি ধীরগতিসম্পন্ন। যদিও আমি মনে করি, সত্যজিতের ছবির মূল সুরটি সবসময়ই জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। অনেকে বলেন, উনি অপু ট্রিলজির মতো আর কোনও ভাল ছবি করেননি। আমি বিশ্বাস করি না। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আমাকে সেকথা বিশ্বাস করতে দেয় না!



শুধু তথ্যচিত্র করলেও বিশ্বে

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার সর্ম্পক ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। কখনও কফি হাউসে। কখনও ওঁর বাড়িতে। আবার কখনও আমার বাড়িতে। ফলে ওঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি বা জেনেছি। তাঁর বরাবরের ইচ্ছে ছিল একটি ফিচার ফিল্ম তৈরির। শুধু ইচ্ছে বলব না— বলা উচিৎ স্বপ্ন! আমাদের যেমন গোড়াতে তথ্যচিত্র তৈরির ঝোঁক ছিল ওঁর সেটা ছিল না। যদিও উনি পরে কয়েকটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন এবং প্রত্যেকটিই অসাধারণ চিত্র বলে মনে হয়েছে আমার— এর মধ্যে 'ইনার আই' আমাকে মুগ্ধ করেছে।
যাই হোক্ গোড়া থেকেই বলছি। ছবি তৈরির নেশাতেই প্রথমদিকে সত্যজিৎ রায় তথ্যচিত্রের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে পরিচালনা নয়। ডক্যুমেন্টারির চিত্রনাট্য ও সঙ্গীতের দায়িত্ব নিতেন উনি। মানে আমি উনিশশো আটচল্লিশ সালের কথা বলছি। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে সিনেমাটোগ্রাফি কোর্স শেষ করে সবে দেশে ফিরেছি। তখন আমি কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের কাউকেই প্রায় চিনতাম না। আমাদের বাড়িতে পড়াশোনা ছাড়া ফিল্মের কথা কেউ ভাবতেই পারত না। তখন আমার ছোটবেলার বন্ধু অসিত সেন (পরিচালক) আমায় বলল "এখানে কয়েকজন উৎসাহী ছেলে আছে যাঁরা. সিরিয়াস ছবি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। তুই হলিউড থেকে এসেছিস জেনে ওরা তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" এই সূত্রেই একদিন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মিটিং-এ গেলাম। সেটা হয়েছিল সত্যজিতের বালীগঞ্জ গার্ডেন্সের ছোট্ট বাড়িতে। মিটিং-এ যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, বংশী চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ। সেদিন প্রথম আলাপেই সত্যজিতের ব্যক্তিত্ব, চেহারার ডিগনিটি, গলার আওয়াজ, কথাবলার ভঙ্গি সবকিছু দেখে আমি ভীষণ ইমপ্রেসড হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ। আর সত্যজিৎবাবুর সম্ভবত সাতাশ। তারপর থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমাদের দুজনেরই হাতে খড়ি হল একটি তথ্যচিত্র

● বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : 'ইনার আই'



নিমাই ঘোষ

● 'বালা' তথ্যচিত্রের দৃশ্যগ্রহণের আগে বালা সরস্বতী ও স



ঝড় তুলতে পারতেন

'এ পারফেক্ট ডে' । এটি একটি অ্যাড ফিল্ম হলেও আমরা এটা ডক্যুমেন্টারি স্টাইলে করেছিলাম । সকালবেলায় এক প্যাকেট সিগারেট কেনার পর সারাদিনে সেটা কিভাবে শেষ হল তার গল্প । ছবিটা আমরা পুরোটাই আউটডোর— মানে, রাস্তা, অফিস— রেস্তোরায় শুটিং করি । গোটা আইডিয়াটা ছিল সত্যজিৎবাবুর । একটি সিগারেটকে নিয়ে তখন এমন অ্যাড-ফিল্ম কেউ ভাবতেই পারে না । এটা উনিশশো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের ঘটনা । এবং আমার মনে হয় সর্বপ্রথম এই তথ্যচিত্রে এমন নিও-রিয়ালিজম এর মূল সুর ছবিটি ঠিক ধরতে পেরেছিল । এতে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় । ক্যামেরার দায়িত্বে ছিলেন অজয় কর । মিউজিক দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র । আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত । চিদানন্দ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রোডাকশান কন্ট্রোলার । আমি ছিলাম পরিচালক । পরে অবশ্য শুনেছিলাম উনি 'এ পারফেক্ট ডে' ছবিটি করার আগে টিবোর্ডের একটি তথ্যচিত্রে নাকি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তবে এর সত্যতা আমার জানা নেই । এরপর থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল । সত্যজিৎ রায় তখন ডি জে কীমারে কর্মাশিয়াল আর্টিস্টের চাকরি করেন । আমি প্রায় ওঁর অফিসে যেতাম তারপর দুজনে মিলে কফি হাউসে আসতাম । মজার ঘটনা হল উনি এত লম্বা যে ওঁর পাশে হাঁটতে বা কথা বলতে

মেয়েকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়



নিমাই ঘোষ



শুধুমাত্র কাহিনীচিত্র নয়, তথ্যচিত্রের পরিচালক হিসাবেও সত্যজিতের অনন্যতার কথা বলেছেন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত ।



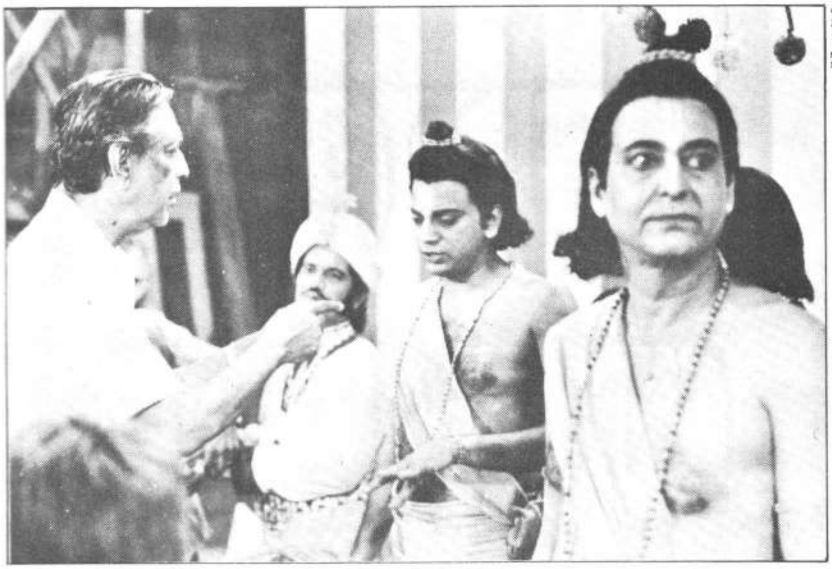
প্রাকৃতিক রূপ-পিপাসা
রমণী রূপ-পিপাসা

যখন আপনি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা মনের মত রমণীর রূপ দেখতে দেখতে হয়ে পড়েন ক্লান্ত ও পিপাসার্ত, তখন আইসোটনিক লবণযুক্ত ও পুরোপুরি কীটাণুমুক্ত লিমকায় চুমুক দিন, দেহ-মন জুড়িয়ে নিন।

লিমকা — পিয়াসী পছন্দ



CONTAINS ADDED FLAVOUR. CONTAINS NO FRUIT JUICE/PULP. NO BVO USED.



নিমাই ঘোষ

● 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রের সেটে সত্যজিৎ, বিমল দেব, চিরঞ্জিৎ ও সৌমিত্র



নিমাই ঘোষ

● 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রের একটি দৃশ্য

আমার খুব অসুবিধা হত । ব্যাপারটা সহজ করার জন্য তাই উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন আর আমি ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাঁটতাম ।
এরপর আমি তথ্যচিত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । আর সত্যজিৎবাবু তখন ফিচার ফিল্ম 'পথের পাঁচালি' নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন । যদিও গোড়া থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ছবিটা করার । কাস্টিং ফাইনাল ছিল । কিন্তু টাকার জন্য আটকে গিয়েছিল । যাই হোক্ সম্ভবত 'পথের পাঁচালির' আগেই আমার আরও একটি একঘন্টার তথ্যচিত্র 'দ্য স্টোরি অফ স্টিল' এর চিত্রনাট্য করেন সত্যজিৎবাবু ।

তারপর আমার আরও কয়েকটি তথ্যচিত্রে চিত্রনাট্য ও মিউজিক দেন তিনি । পরে উনিশশো একষট্টিতে সত্যজিৎ রায় নিজের পরিচালনায় 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি তৈরি করেন । আমি ছবিটি দেখি— সত্যই অসাধারণ ।

সত্যজিৎবাবুর চিন্তাধারা, কল্পনাশক্তি ছিল প্রবল । একটি দৃশ্য নিয়ে নানাভাবে ভাবতেন । গল্প করতে করতে একবার উনি বলেছিলেন উদয়শংকরের 'কল্পনা' ছবিটি নাকি কুড়িবার দেখেছেন । আমার সবচেয়ে ভালোলাগে তাঁর 'ইনার আই' (১৯৭৪) তথ্যচিত্রটি । চিত্রকর বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ওপর ছবিটি । দৃষ্টিহীন অবস্থায় তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতি— স্পর্শ দিয়ে এক অসাধারণ অনুভব শক্তির মাঝে কাজকর্মের ঘটনাকে সেলুলয়েডে গেঁথেছিলেন সত্যজিৎবাবু । যদিও তাঁর ছাত্র ছিলেন তিনি । শান্তিনিকেতনে বিনোদবাবুর কাছে বেশ কিছুদিন শিক্ষানবিশ্ ছিলেন সত্যজিৎ রায় । ফলে তাঁকে গভীরভাবে জানা ও তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধার ফলেই এমন প্রাণবন্ত তথ্যচিত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে । এটি যেন সত্যজিৎ নিজের ইনার আই দিয়ে দেখেছেন । তারপর ওঁর 'বালা' (১৯৭৬) দেখেছি । ভারত নাট্যম নৃত্য শিল্পী বালা সরস্বতীর উপর ছবি । তাছাড়া কয়েকদিন আগে করেছেন বাবাকে নিয়ে তথ্যচিত্র 'সুকুমার রায়' (১৯৮৭) এটি আমার দেখা হয়ে ওঠেনি । দেখিনি ওঁর 'সিকিম' (১৯৭১) ছবিটিও । ওটা অবশ্য অনেকেই দেখেননি । তবে আমার যতোদূর ধারণা সত্যজিৎ রায় প্রথম কোন জীবিত মানুষের উপর তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন যেটি 'ইনার আই' ।
তাঁর তথ্যচিত্রের ইতিহাস আলাদা করে না বললেও চলে কারণ সত্যজিৎবাবুর প্রতিটি ফিচারফিল্মই হাই ডকুমেন্টারি স্টাইলে করা । উনি প্রথমদিকে যতগুলি ছবি করে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন তার বেশিরভাগই এই স্টাইলে তৈরি । অপুর ট্রিলজি ছাড়াও 'তিনকন্যা', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-প্রত্যেকটি কিন্তু তথ্যচিত্রের আদলে এক নাটুকে ঘটনা আঁকা । যারজন্য তখনকার সময়ে এই ছবিগুলি এক নতুনধারার ছবির জন্ম দিয়েছিল । আবার তীব্র নাটুকে ঘটনা তেমনি দার্জিলিং-এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ডকুমেন্টশন-এ দুই-য়ের সমান । মিলমিশ দেখেছি—, 'কাঞ্চনজঙ্ঘায়' । কিছুটা ছিল অরণ্যের দিনরাত্রিতেও । হয়ত সেজন্যই সেই ছবিগুলি আমাকে ভীষণ টানে ।
সেইভাবে সত্যজিৎ রায় তথ্যচিত্র খুব কমই করেছেন । কারণ ছবির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া । তবে আমার ধারণা-সত্যজিৎবাবু তাঁর তথ্যচিত্র তৈরির মনটা ও কল্পনির্ভর চোখজোড়াকে সর্বদাই তাঁর ছবির নাটকে গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই-জায়গা করে দিয়েছেন । তাঁর এক একটি তথ্যচিত্র নি:সন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শিক্ষার বিষয় । তবে আমরা যাঁরা তথ্যচিত্র জগতের মানুষ বিশেষত আমার ধারণা যদি সত্যজিৎবাবু আরও কিছু তথ্যচিত্র তৈরি করতেন তবে তথ্যচিত্র জগতেও ঝড় তুলে এক নতুনধারা আনতে পারতেন ।





নিমাই ঘোষ

টেলিফিল্মের ক্ষেত্রেও এক নতুন



টেলিফিল্ম তৈরির ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ রায়ের দক্ষতা যে কতখানি সে বিষয়ে আলোচনা করছেন **বিভাস চক্রবর্তী** ।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কলকাতা দূরদর্শনের নাড়ীর যোগাযোগ আছে বলা চলে । একটু বুঝিয়ে বলি । ১৯৭৫-এর ৯ আগস্ট কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র (তখন অবশ্য দূরদর্শন বলা হত না, নাম ছিল টি.ভি. সেন্টার) চালু হয় । তার জন্য আগের বছরের মাঝামাঝি সময়ে এক বিশাল পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মী বাছাই চলে । সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগপত্র দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে টি.ভি. অনুষ্ঠান প্রযোজনার ট্রেনিং নিতে । আগে এই ট্রেনিং হতো মাণ্ডি হাউসে । ৭৪-এর ২ অক্টোবর থেকে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের শাখা হিসেবে চালু হল এই টি.ভি. উইং, ইনস্টিটিউটের নাম পাল্টে রাখা হলো এফ. টি. আই. আই., অর্থাৎ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিসন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ।

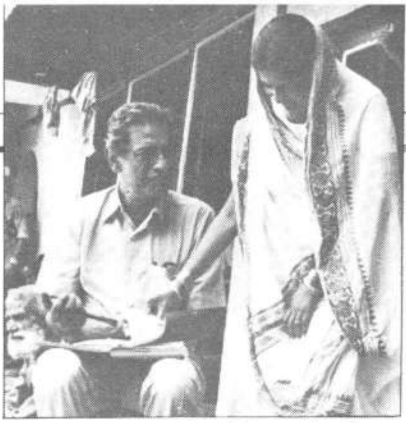


● 'পিকু' : অর্জুন গুহঠাকুরতা ও সত্যজিৎ

নিমাই ঘোষ



'সদ্‌গতি'-র একটি দৃশ্যে সত্যজিৎ নির্দেশ দিচ্ছেন



• 'সদ্‌গতি'-র সেটে পরিচালক সত্যজিৎ ও গীতা সিদ্ধার্থ

ঘরানার প্রবর্তন

কলকাতা থেকে আমরাও পৌঁছলাম, আর পৌঁছলেন সত্যজিৎ রায়—টেলিভিসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে। আমরা সবাই থ্রিলড।
কলকাতা দূরদর্শনের শুরু থেকেই মানিকদার প্রবল উৎসাহ এবং কৌতূহল। প্রথম কেন্দ্র-অধিকর্তা মীরা মজুমদার মানিকদার বিশেষ পরিচিত, ওঁকে ডাকনামে অর্থাৎ আইলীন বলে ডাকেন। পরিচয় ছিল মকাইবারির মেয়ে অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে—ফেলুদা, মকাইবারির চা খেতে ভালোবাসে, সবাই জানে। ওঁর ইউনিটের মেকআপ শিল্পী অনন্ত দাসও টি.ভি.-তে চাকরি নিয়ে ঢুকলেন। আর আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার নাটক দেখার সুবাদে। মীরাদির প্রবল ইচ্ছে, মানিকদা যেন আমাদের কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আমি মাঝে মাঝে মানিকদার বাড়ি গিয়ে জানাই আমাদের ইচ্ছ'র কথা। মানিকদা টি.ভি.-র খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করেন, জানতে চান, কিন্তু কখনোই 'হ্যাঁ' বলেন না। বলেন, দাঁড়াও, কিছুদিন যাক। এখন কত লোক দেখছে তোমাদের প্রোগ্রাম ? কত সেট বিক্রি হয়েছে বাজারে ? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কিন্তু টি.ভি.-র ক্যামেরায় প্রথমে 'জনঅরণ্য', তারপর 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'-র শুটিং ধরে রাখলাম।
শতরঞ্জ-এর কাজ শেষ করার পর মানিকদা রাজি হলেন টি.ভি. সেন্টারে এসে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। এ পর্যন্ত কলকাতা দূরদর্শনে রেকর্ড করা মানিকদার এই একটি প্রোগ্রামই আছে—গত ১৭ মার্চ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে 'গ্রেট মাস্টার্স' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আবার দেখানো হল। ২৮ মার্চের 'দেশ'-এ প্রকাশিত তথ্যপঞ্জিতে অবশ্য এর উল্লেখ নেই।
মীরাদির প্ররোচনায় আমি এবার লেগে রইলাম, যদি মানিকদা দূরদর্শনের হয়ে কোন স্বল্প-দৈর্ঘের কাহিনীচিত্র করেন। করবেন না-ইবা কেন ? এর আগে তো টি.ভি.-র জন্য ছবি করেছেন উনি। আমেরিকান তেল কোম্পানি ESSO-র জন্য—তখন কলকাতায় এসো-র পেট্রোল পাম্প অনেক দেখা যেত। ওরা বোধ হয় খুবই একটা ছোট ছবি (কত মিনিটের মনে নেই) করতে বলেছিল আমেরিকার কোন টি.ভি. চ্যানেলে দেখানোর জন্য। মনে আছে, সেই 'টু' নামের ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম এক নম্বর নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-র প্রিভিউ থিয়েটারে। ১৯৬৪-৬৫ হবে বোধহয়, মানিকদার সঙ্গে তখন পরিচয় নেই। দূর থেকে দেখি—ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির শো-তে আসতেন—ফিলিপস ক্লাব হলে, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে ইউ. এস. আই. এস-এর হলে। আমি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার। মানিকদা এই সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তখনও। সেই সূত্রেই প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। নির্বাক ছবি, কোন সংলাপ নেই। বড়লোকের বাড়ির একটি ছোট ছেলে—দুপুরে বাবা-মা কেউই বাড়ি থাকে না। কাজের লোকের সঙ্গে বিরাট বাড়িতে একা-একাই থাকতে হয় তাকে। কোন বন্ধু নেই, কথা বলার কেউ নেই। একমাত্র সাথী কিছু খেলনা—অত্যাধুনিক যান্ত্রিক খেলনা। তার মধ্যে ট্যাংক আছে, রোবোট আছে, বন্দুক আছে। বন্দী শিশু

• 'সদ্‌গতি' : স্মিতা পাটিল ও পরিচালক সত্যজিৎ রায়



লক্ষ্য করে বাইরের আকাশে ঘুড়ি উড়ছে। নীচে তাকিয়ে দেখে খোলা মাঠে ওদের মালি বা দারোয়ানের ছেলেটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। দেখে কেন জানি রাগ হয় ওর, এয়ার গানটা এনে ঘুড়িটা ফুটো করে দেয় সে। ছবির শেষে, মনে আছে, খেলনার রোবোট (অথবা ট্যাংক ?) খেলনার তৈরি বাড়ি ভেঙে এগিয়ে চলে।

খুবই ছোট ছবি। কাহিনীটা যেভাবে ছবিতে বলা হয়েছে, তাই বলার চেষ্টা করলাম। এরপর কি আর ছবির মর্মার্থ, প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন রয়েছে ? আসলে এখানেই সত্যজিৎ রায়ের ছবির সাফল্য এবং গভীরতা, সৌন্দর্য এবং ব্যঞ্জনা। আর দূরদর্শনের ছোট পর্দায়, এরকম গল্প বলার ঢং-ই বোধহয় বেশি কার্যকর। পরে আমরা যখন 'সদ্গতি' ছবিটি দেখব, তখন এই বৈশিষ্ট্যটি আরো বেশি এবং স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

যাই হোক, কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ছবি তৈরির ব্যাপারে মানিকদা তেমন উৎসাহ দেখালেন না। আমরা যখন প্রায় হাল ছেড়ে বসে আছি, হঠাৎই একদিন অনন্ত দাস এসে বললেন, মানিকদা আপনাকে একবার যেতে বলেছেন। আমি তো একলাফে গিয়ে হাজির। 'দ্যাখ, অনেকদিন ধরেই তোমরা বলছ, আমি ভাবছি তোমাদের জন্য কয়েকটা ছবি করা যায়।' এ তো হাতে স্বর্গ ! তা-ও আবার একটা নয়, 'কয়েকটা'। তারপর বললেন ওঁর ভাবনার কথা—ছ'টা ছোটগল্প নিয়ে ছ'টা ছোট ছবি উনি করতে চান। কয়েকটা গল্পের কথাও বললেন আমাকে, যেমন বিভূতিভূষণের দ্রবময়ীর কাশীবাস, কিংবা শিবরাম চক্রবর্তীর একটা গল্প (রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা ঠাকুর নিয়ে, নামটা মনে পড়ছে না)। শরৎচন্দ্রের 'সতী'র কথাও বলেছিলেন, আর বলেছিলেন টি.ভি.-তে প্রযোজিত (শেখর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত, রবীন মজুমদার অভিনীত) নাটক 'আচার্য'-র কথা। মীরাদি শুনে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিতে লেখালেখি শুরু করে দিলেন। তবে এ কথা সত্যি, প্রথমে যতটা উৎসাহ ওদের দেখানো উচিত ছিল, দিল্লি ততটা কিন্তু দেখায়নি। পরে, অতিরিক্ত ডিরেকটার জেনারেল কমলেশ্বর এবং মূলত অমল দত্তর উৎসাহ এবং তৎপরতায় মানিকদার সঙ্গে দূরদর্শন চুক্তি করে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বাংলা ভাষায় ১৬ মি.মি. সাদা-কালো ছবি, তারপর ১৬ মি.মি. রঙিন, তারপর ৩৫ মি.মি. রঙিন, ছবির সংখ্যা ছয় থেকে কমে একে, ভাষা বাংলা

নিমাই ঘোষ



• 'পিকু' : অপর্ণা সেন



• 'টু' : নিজের হাতে মেক-আপ

থেকে হিন্দিতে। দূরদর্শন সবতাতেই তখন রাজি। এই পুরো সময়টা সমস্ত যোগাযোগ কথাবার্তা আমাকেই করতে হয়েছে। শেষের দিকে অবশ্য আমার কাছ থেকে অভিজিৎ দাশগুপ্ত দায়িত্ব বুঝে নেয়। ইতিমধ্যে মীরাদিও বদলি, কেন্দ্র-অধিকর্তা রূপে এসে গেছেন শিব শর্মা।

মানিকদার ১১/১১/৮১ তারিখে লেখা একটা চিঠি :

বিভাস,

সদ্গতির কাজ এখন শেষ পর্বে। পুনু সমেত আমার কয়েকজন ছেলে ১২ই বম্বে চলে যাচ্ছে মালপত্তর নিয়ে, আমি নিজে যাব ১৭ই। ...

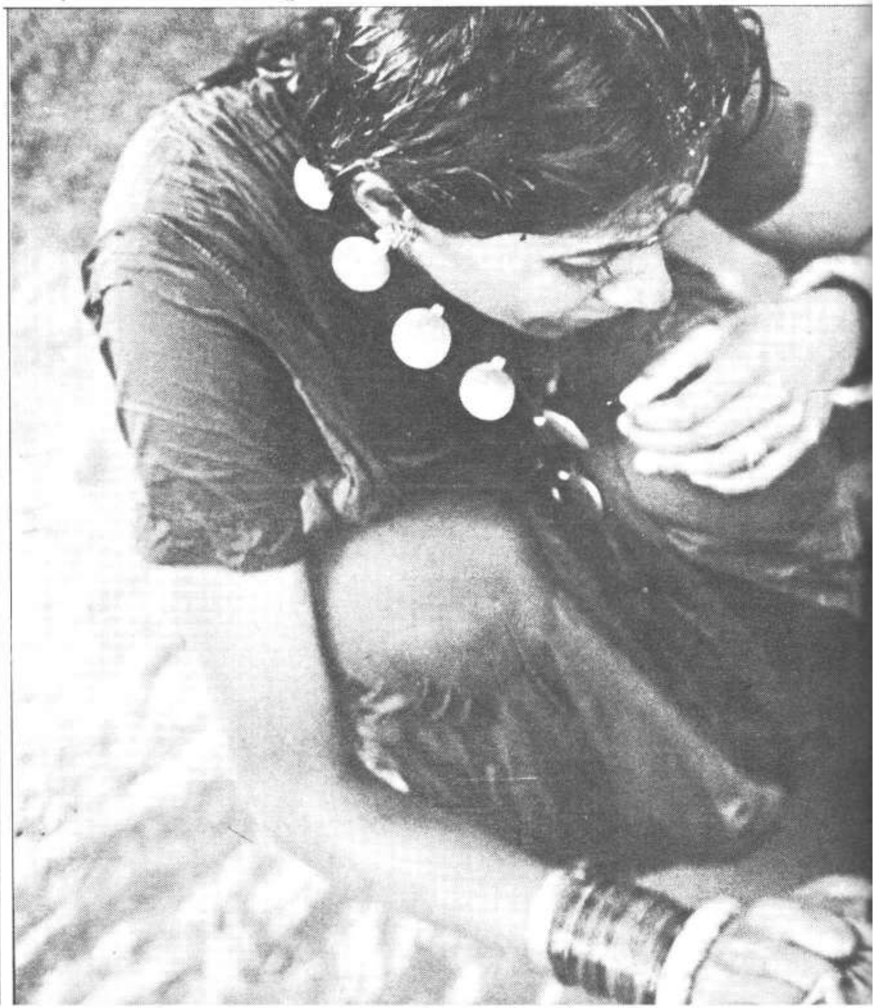
রি-রেকর্ডিং সেরে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। বাকি পাওনার ব্যাপারটাও তখনই ফয়সালা হবে। ছবি ৫২ মিনিটের চেয়ে তিন মিনিট কম হয়েছে এটা জানিয়ে রাখলাম।

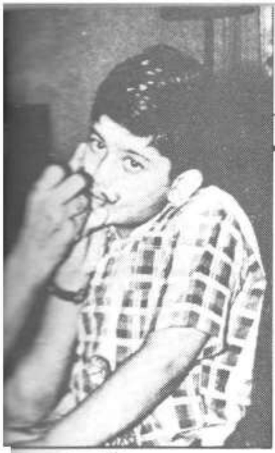
শুভেচ্ছা নিও।

মানিকদা

কিছুদিন বাদেই মানিকদা খবর পাঠালেন ছবি রেডি। দেখার ব্যবস্থা হলো আমাদের টি.ভি. সেন্টারের (রাধা ফিল্ম স্টুডিও) পাশেই ফিল্ম সার্ভিসে। দূরদর্শনের তরফ থেকে শিব শর্মা, অভিজিৎ এবং আমি। ছবি দেখে সবাই মুগ্ধ, বাক্যি সরে না। সলজ্জভাবে শিব

• 'সদ্গতি' : স্মিতা পাটিল ও ওম পুরী



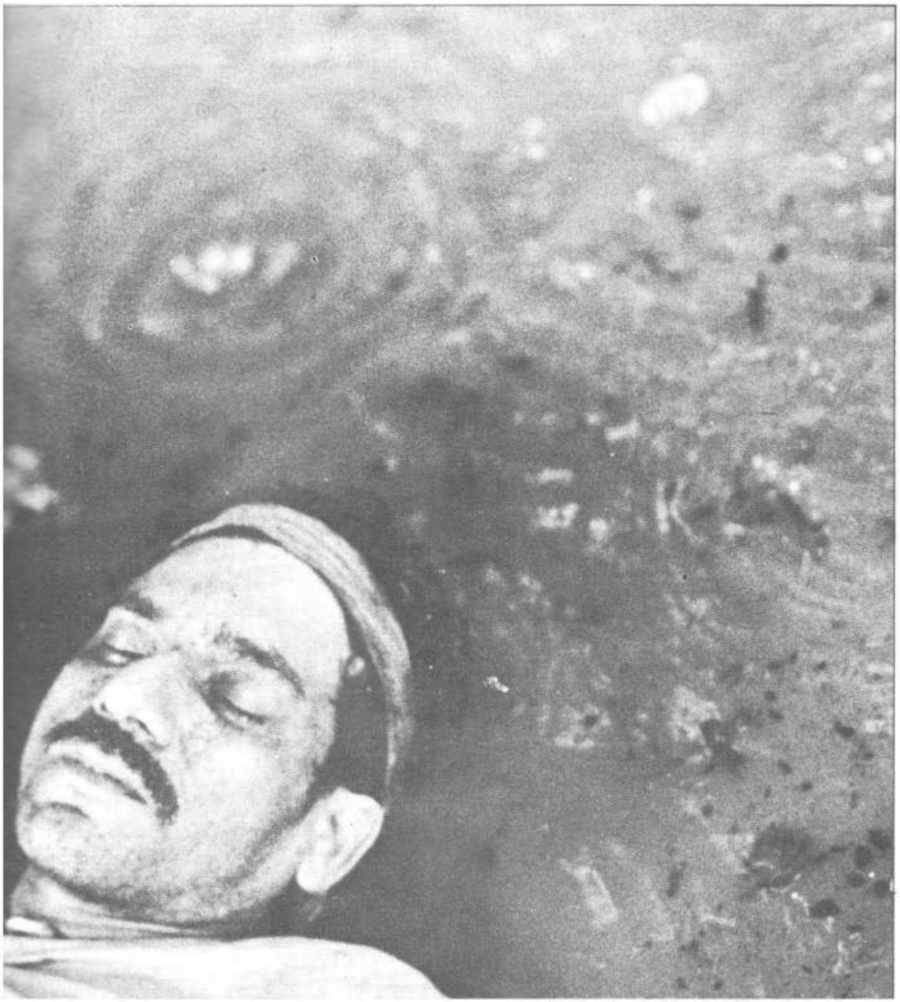


[illegible] সত্যজিৎ



• 'পিকু' : প্রমোদ গাঙ্গুলি ও অপর্ণা

শর্মা বললেন, চুক্তি অনুযায়ী প্রিভিউ কমিটি ছবি approve করলে final payment দেওয়া হয় । ত' আমরা এখানে প্রিভিউ কমিটি হিসেবে আসিনি, এসেছি ভক্ত দর্শক হিসেবে—দূরদর্শনকে আপনি ধন্য করেছেন । সেদিন আমাদের আরও একটা বাড়তি লাভ ঘটল । ফরাসী টি.ভি.-র জন্য তৈরি বাংলা ছবি 'পিকু'-র প্রিন্টও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মানিকদা আমাদের দেখাবার জন্য ।
'সদ্‌গতি' যেদিন দেখানো হলো দূরদর্শনে, আমার মনে আছে, রাস্তাঘাটে সেই সময়টা লোকজন বিশেষ দেখা যায়নি । মনে হলো, সবাই যেন ছবিটা দেখছে । আবারো সেই কথায় ফিরে আসি, আপামর জনসাধারণ—সবারই ভালো লেগেছিল ছবিটা । কেন ? নির্মাণে কোন প্যাঁচ ছিল না, ছিল না সহজকে দুর্বোধ্য করার চেষ্টা । সংলাপও খুব একটা বেশি ছিল না, ছবি ধরেই কাহিনী বলা হয়েছে—কিন্তু সে ছবি কলমের চেয়েও ক্ষুরধার, শক্তিশালী । বিষয়বস্তু যেখানে জ্বলন্ত বাস্তব, আপাত-অনাটকীয় কাহিনীর নীচে যেখানে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ভায়োলেন্সের ফল্গুস্রোত বহমান, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যখন পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাহিনীর এক-একটি চরিত্র হয়ে উঠছেন, তখন প্রয়োজন কোথায় আন্ডারলাইন করার ? সংলাপের কচকচি দিয়ে 'বক্তব্য' তুলে ধরার ?



প্রকৃতি পরিবেশ ঘটনা যেখানে এতই বাঙময়, সেখানে প্রয়োজন কোথায় সঙ্গীতের সাহায্যে কোন সিচুয়েশন বা মুহূর্তকে আলাদাভাবে জোরালো করে তোলার ? কিছু বিদেশী টি.ভি. ফিল্ম দেখে ধারণা জন্মেছিল, এতে সংলাপের ভাগটা ফিল্মের থেকে একটু বেশি থাকবে, একটু নাটকীয় হবে, শটগুলি সাধারণত মিড-ক্লোজআপ এবং ক্লোজ-আপ হবে । কিন্তু প্রচলিত সব ধারণা ভেঙে দিয়ে এ কী টেলিফিল্ম ? আমার মনে হয়েছে 'সদ্‌গতি' বহিরঙ্গে টেলিফিল্মের ধর্ম মানেনি, কিন্তু তার অন্তরাত্মা টি.ভি.-র দর্শকের কাছে পৌঁছয় মোক্ষমভাবে ।

'টু' কিংবা 'সদ্‌গতি'-তে আপাত-নিস্তরঙ্গ বিস্তারের পর অনিবার্য ধাক্কাটা আসে—ঘুড়িটা ফুটো করে দেওয়া, বাড়ি ভেঙে যান্ত্রিক খেলনার চলে যাওয়া, কিংবা দুখী চামারের গাছের গুঁড়ি কাটতে কাটতে পড়ে মরে যাওয়া এবং মৃতের ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়া—'পিকু'-র শুরুটাই কিন্তু নাটকীয় । প্রথম থেকেই দমবন্ধ পরিবেশটা ধরিয়ে দেওয়া হয় ।

কাহিনীকে কেটেকুটে বিন্যস্ত করা হয়েছে ২৬ মিনিটে শেষ বিন্দুতে পৌঁছনোর জন্য, বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ দেবার জন্য । একদিকে প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী সরল শিশু, অন্যদিকে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ, মাঝখানে স্বামী-স্ত্রী-প্রেমিকের ত্রিভূজ—এমন নাটুকে উপাদান নিয়ে একটি দীর্ঘ ছবিও হয়ত করা যেত, কিন্তু 'পিকু' আবারও প্রমাণ করলো সত্যজিৎ রায় বিশ্বখ্যাত পরিমিতিবোধ—অল্পের মধ্যে দিয়ে বেশি কথা বলার আর্ট ।

'পিকু' দেখে মানিকদাকে আমি বলেছিলাম, একটা বড় ছবি (full-length) দেখার অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি হলো । মানিকদা বলেছিলেন, তাই তো হওয়া উচিত ।
এসো-কোম্পানির জন্য তৈরি 'টু'-ই হোক, আর ভারতীয় বা ফরাসী টেলিভিসনের জন্য তৈরি 'সদ্‌গতি' বা 'পিকু'ই হোক, মানিকদা কিন্তু টেলিফিল্মের ক্ষেত্রে এক নতুন ঘরানার প্রবর্তন করলেন । জানি না, মানিকদার এই ঘরানাকে অনুসরণ করে সত্যিকারের ভালো টেলিফিল্ম তৈরি করার ক্ষমতা ক'জনার আছে । ভাবতেও অবাক লাগে, অর্থপূর্ণভাবে গল্প বলার জন্য যে মাধ্যমেই হাত দিয়েছেন এই মহান শিল্পী, সেখানেই সার্থক হয়ে উঠেছেন ।



সত্যজিৎ রায়



সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি বাঙালি। খ্যাতি তাঁকে বদলাতে পারেনি। বাঙালিয়ানার ধারাবাহিকতায় তিনি যে একটি দিকচিহ্ন সেই কথাই লিখেছেন শংকর।

অবিশ্বাস করে, সন্দেহ করে, 'ও কিসসু নয় স্ট্যাম্প লাগিয়ে নিজের মানুষকে নস্যাৎ করতে বাঙালিরা চিরকালই তুলনাহীন। আরও একশ্রেণীর বাঙালি আছেন যাঁরা কীর্তনীয়া। সুরবেঁধে দিলে খোল করতাল জোগাড় করে চলবে অষ্টপ্রহরী সংকীর্তন। এই কীর্তনীয়াদের বুকে ভক্তি থাকে না, কিন্তু কণ্ঠে এমন সুর ও জোর থাকে যে অন্য কোনো শব্দ কানে প্রবেশ করে না।
বাঙালি চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধিতার আবর্তে ঘূর্ণিপাক খেয়েও বিজয়ী হয়েছেন সত্যজিৎ রায়—বাঙালির এযুগের ইতিহাস যখন ভালভাবে লিপিবদ্ধ হবে তখন বিষয়টি নিশ্চয় বিশেষজ্ঞদের কৌতূহলের উদ্রেক করবে। যা আমাকে বিস্মিত করে, যাঁরা এতোদিন সুযোগ পেলেই সত্যজিতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতেন, এখন তাঁরাও গোলে হরিবোল দেবার জন্যে অষ্টপ্রহরী কীর্তনে যোগ দিয়েছেন। অজস্র লেখা, অজস্র প্রশস্তি দিকে-দিকে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে—কিন্তু তবু যেন মন ভরছে না, কোথায় যেন ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। দুধপুকুরে সবাই দুধ ঢালছে কিনা সে বিষয়েও একটু নজর রাখার প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে।
এহেন পরিস্থিতিতে কলম ধরতে ভয় হয়। ভাবি, যাঁকে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে হৃদয়সিংহাসনে আসন দিয়েছি, পরবর্তীকালে যাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি—তাঁর সম্বন্ধে, হঠাৎ লিখতে যাওয়া কেন? এই লেখা প্রকাশ করে বিশ্বসংসারের কী উপকার হবে? সত্যজিতের খ্যাতি বৃদ্ধি করার মতন সামর্থ্য আমার নেইমানুষটাকে ঠিক মতন বুঝিয়ে দেবার মতন সময় এখনও আসেনি। শুধু আরও ভিড় বাড়ানো।
একটা মজার কথা বলে রাখি এই সুযোগে। যাঁরা পত্রপত্রিকায় সত্যজিৎ সম্বন্ধে প্রশস্তি প্রকাশ করতেন তাঁরাও আড়ালে আবডালে বলতেন, প্রশংসা পেতে ও হজম করতে এই মানুষটির ক্ষমতা সীমাহীন। আর সমালোচনা? কে ওই হ্যাপা সামলাবে? এমন স্পর্শকাতর মানুষ কম নাকি দেখা যায়, সুতরাং ইট পাটকেল শুধু প্রাইভেটে ছোড়ো, কাগজ কলম নিয়ে হাঙ্গামা বাড়িও না। যে দু'একজন হোমওয়ার্ক না করে অসাবধানে ঢিল ছুঁড়েছেন তাঁরা সিংহের মুখে পড়ে গিয়েছেন— এঁদের সমালোচনা যুক্তিতর্কের ধোপে টেকেনি। সম্প্রতি এক সায়েব সত্যজিৎ অনুরাগীর সঙ্গে কলকাতার বাইরে আচমকা দেখা হয়ে গেল। তিনি চুপি চুপি জানালেন, সত্যজিৎ একবার চিঠি লিখে তাঁর মনোভাব জানিয়েছিলেন: "প্রশংসা আমার কাছে একঘেয়ে লাগে, আর নিন্দায় আমার বিরক্তি হয়। প্রেজ বোর্স মি, ক্রিটিসিজম ইরিটেস মি।" মানুষটাকে খুলে ভিতরে ঢুকবার চাবিকাঠি পাওয়া গেলো। প্রশস্তিতে ভিজিয়ে এঁকে নরম করা সম্ভব নয়—আবার অহেতুক নিন্দা করে পালাবার পথ নেই। এমন মানুষ সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখা কত কঠিন তা ভেবে দেখুন। রামভক্ত বা রাবণভক্ত কেউ এঁর কুলকিনারা পাবেন না। এঁর মাপজোক করতে গেলে ত্রিনয়ন চাই—এঁর ব্যক্তিত্বকে ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের মতন ফ্রেমে ফ্রেমে ধরে রেখে মহাকালের প্রেক্ষাগৃহে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ নিজেরাই আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন।
মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, আমার জীবনই আমার বাণী। মহাপুরুষরা এই দাবী করলেও করতে পারেন, কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে অন্য কথা। তাঁরা চান, আমার সৃষ্টির মধ্যেই আমার বাণীকে খুঁজে নাও, আমার জীবন নিয়ে বেশী সময় ব্যয় কোরো না। কারণ, গাছ দেখে প্রায়ই ফল বোঝা যায় না। অমন যে অমন বিশাল বটবৃক্ষ তার সাইজ দেখুন। আর সেই সঙ্গে ছোট পেঁপে গাছ বা লতানে কুমড়ো গাছ দেখুন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু ফলের কী সাইজ।

সত্যজিতের সৃষ্টি সম্বন্ধে অজস্র ছেঁদো লেখা হলেও এখনও খুব খুঁটিয়ে দেখা হয়নি তাঁর চলচ্চিত্র মালা—যা নদীর মতন দুর্গমপর্বত থেকে নেমে এসে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সাগরে মিশবার জন্য মোহনায় উপস্থিত হয়েছে। শখের শিকারী নয়। পেশাদার জেলে তার জাল, ফেলে-ফেলে এই নদীর প্রতিটি বাঁক থেকে শিল্পীর বাণীটিকে সংগ্রহ করতে পারেন। এই কাজ করতে হলে, দেশের সেরা কয়েকজন সৃষ্টিশীল মানুষকে বছর দশেক ধরে তাঁর ছবিগুলিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তারপর হয়তো কিছুটা

বাঙালিয়ানার দিকচিহ্ন



ছেলে সন্দীপ এবং পুত্রবধূ ললিতা : সনাতন বাঙালি প্রথায় নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করছেন সত্যজিৎ রায়

নিমাই ঘোষ

তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের সেই ধৈর্য নেই। সত্যজিৎ রায় নিজেই কতবার দুঃখ করেছেন। এদেশের সমালোচকরা স্রেফ একবার দেখেই কেমন ছবি সম্বন্ধে ফতোয়া জারি করেন, অথচ বিদেশে সমালোচকদের একটা ছবি তিন চারবার দেখাটা কোনো ব্যাপারই নয়। অর্থাৎ, সত্যজিতের ছবি এবং সত্যজিতের সহিত্যের মধ্য থেকে মানুষটাকে ছেঁকে বার করবার মস্ত কাজ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। এই কাজ তেমনভাবে করলে, আমরা উপকৃত হবো এবং সেই সঙ্গে হয়তো বিস্মিত হবো, যে আমাদের এতো কাছে থেকে মানুষটা আমাদের কাছে ধরা দিয়েও কেমন ধরা দিলেন না। অথবা, তিনি ধরা দেবার সুযোগ দিলেও আমরা তাঁকে খুঁজে বার করবার হাঙ্গামায় গেলাম না—স্রেফ নিন্দা অথবা প্রশস্তি করেই সময়টা কাটালাম এমনভাবে যে তিনি হয় একঘেয়েমির হাই তুললেন অথবা 'ইরিটেশনে' ভুগলেন।

এখন, দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। মানুষটাকে বুঝে ও জেনে তাঁর শিল্পকর্মকে হৃদয়ঙ্গম করা ? না শিল্পকর্মের স্রোতে অবগাহন করে মানুষটাকে অবশেষে অনুভব করা অথবা আবিষ্কার করা ? শিল্পীর সমকালের মানুষ প্রথমে শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই সঙ্গে মানুষটাকে কাছেপিঠে ঘুরে বেড়াতে দেখে—ফলে বিচারে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। সমকালের অবসানে মানুষটা হাতের গোড়ায় থাকে না কিন্তু রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধানে ভরা সোনারতরী হাতের গোড়ায় উপস্থিত থাকে। তখন প্রশ্ন জাগে, তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মানুষটা মহান ছিল কিনা ? শুরু হয় মানুষটা সম্বন্ধে অন্বেষণ। এই অন্বেষণের পাথেয় জোগাতে পারে একমাত্র শিল্পীর


নিখুঁত রঙরূপ যখনই চাই, পারফেক্ট স্কিন লাগিয়ে নিই আমি।
পারফেক্ট স্কিন। ল্যাকমের এক অনুপম সৃষ্টি। হাল্কা, মৃদু এই মেকআপ, অন্যান্য মেকআপের চমকদমক থেকে একেবারে আলাদা। তাই, কেউ বুঝতেই পারবেনা যে আপনি মেকআপ লাগিয়েছেন। সামান্য একটু নিয়ে সারামুখে সমানভাবে লাগান আর পান নিখুঁত ত্বকের সেই অপূর্ব অনুভূতি। ময়শ্চারাইজার সমৃদ্ধ পারফেক্ট স্কিন বজায় রাখে আপনার ত্বকের কমনীয়তাও। ফেয়ার, ফেয়ার টু হুইটিশ, হুইটিশ, হুইটিশ টু ডার্ক, ডার্ক–পাঁচ রকমের পারফেক্ট স্কিন থেকে বেছে নিন আপনার উপযুক্ত শেডটি। আপনার ত্বক যেমনই হোক না কেন, এবার বিশ্বকে দেখান তার নতুন উজ্জ্বল রূপ। কারণ, আপনার সাথী এখন পারফেক্ট স্কিন।
PERFECT SKIN
NATURAL MAKE-UP
Lakmé
ল্যাকমে
Trikaya Grey LL 1.92 BEN

সমকালের মানুষদের স্মৃতিচিত্র— কখনও লিখিত, কখনও মৌখিক ।

এইখানেই সমস্যা । প্রায় চার দশক খ্যাতির আর্কল্যাম্পের সামনে উপস্থিত থাকলেও সত্যজিতের জীবন সম্বন্ধে আমরা জেনেছি খুবই কম । তাঁর পরিবারের বাইরে খুব কম মানুষই দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাছাকাছি আসতে পেরেছে একথা স্বীকার করে নেওয়া বোধ হয় অন্যায় হবে না । যাঁরা ভিড়ের মধ্যে লং শটে ওঁকে ধরেছেন তাঁরা প্রশংসা করেছেন অথবা নিন্দা করেছেন, ফলে মানুষটার ভিতরে আমরা ঢুকতে পারিনি । যাঁরা ক্লোজ আপে দেখেছেন তাঁরা যদি তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ভাবীকালের জন্যে রেখে যান তাহলে আমরা কিছু পাবো ।

আমরা অর্থে আমি স্বার্থপরের মতো বাঙালিদের কথা ভাবছি । কারণ, বিশ্বভুবনের তো কত ঐশ্বর্য আছে ; কত বিচিত্র ধনে ধনী পৃথিবীর নানা দেশ । বিংশ শতকের শেষ পর্বে অভাগা বাঙালির তো সত্যজিৎ ছাড়া আর কিছুই তেমন নেই । সত্যি কথা বলতে কি, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আসামান্য মানবসম্পদে বাঙালি যেমন চরম ধনী ছিল । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা তেমনই দেউলিয়া । বিংশ শতকের প্রথমার্ধে আমাদের ছিল বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র— আর দ্বিতীয়ার্ধে একমাত্র সত্যজিৎ । সত্যজিৎ তাই বিধবার শিবরাত্রির সলতে । আমাদের বড় বেশি আদরের, আমাদের বড় বেশি প্রয়োজনের । নিবিড় ঘন আঁধারে সত্যজিৎই হলেন বাঙালির দীপশিখা, অন্ধ বাঙালির যষ্ঠি ।

হ্যাঁ, সত্যজিৎ অবশ্যই বিশ্ববন্দিত ; কিন্তু আমরা বাঙালিরাই তো বিশ্বকে এই উপহার দিয়েছি ভাবতে ভাল লাগে । এখন প্রশ্ন সত্যজিৎ কি বিশ্বনাগরিক না বাঙালি ? পাঁচশ বছর আগে জন্মানো এক বিশ্বনাগরিক সম্বন্ধে কবি দাবী করেছিলেন 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া ।' এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে । তৃতীয়বার সেই অঘটন ঘটলো সাত দশক আগে । আমরা সত্যজিৎকে পেলাম । এ এক অসাধারণ কাহিনী— দারিদ্র্য নিপীড়িত অকালে বৈধব্যযন্ত্রণায় জর্জরিত রমণীর চোখের মণি । বন্দে মাতরম । দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠুক বাঙালি মায়ের । এই আপাত অসহায় জননীরাই বিশ্বভুবনকে সত্যজিতের মতন সন্তান উপহার দিতে পারেন ।

বাঙালির বসবাস জরাজীর্ণ পর্ণকুটিরে— দরজা-জানালা আকারে ছোট হলেও তার মধ্য দিয়েই বিশ্বভুবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন সত্যজিতের মত বাঙালিরা । বিলেত না গিয়েও সেরা বাঙালি সাহেব হবার শক্তি ধারণ করে বাঙালিরা । কিন্তু সেরা বাঙালিরা হারিয়ে যান না । নিজের শক্তিতে বিশ্বভুবনকে জয় করেও সত্যজিতের মত বাঙালিরা নিজেদের বাঙালীত্ব বিসর্জন দিতে রাজী হন না ।

• সত্যজিৎ রায়



সেরা বাঙালি রবীন্দ্রনাথ যেমন চিৎপুরের এঁদো গলি থেকেই বিশ্ববাসীর বারতা সংগ্রহ করেছিলেন, ঠিক তেমনই অঘটন ঘটালেন সত্যজিৎ । মনে বাঙালি, প্রাণে বাঙালি, কিন্তু কাজে পশ্চিমী । পরণে ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, কিন্তু মগজে আঁটসাঁট সুটপরা সায়েব । ছোট জায়গায় জন্মেও বাঙালী ঝট করে দুনিয়াকে বগলদাবা করে নেয়—বাঙালীর এইটাই বিশেষত্ব । পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সেতুবন্ধন ঘটাতে বাঙালী তুলনাহীন । আপনি রামমোহন রায়, দেখুন, অরবিন্দ দেখুন, রবীন্দ্রনাথ দেখুন । এমনকি গেরুয়াপরা সিমুলিয়ার নরেন দত্তকে দেখুন— ঠাকুরের নাম জপতে জপতে ঝপ করে ভারতবর্ষকে দুনিয়ার কাছে এবং দুনিয়াকে ভারতবর্ষের কাছাকাছি টেনে এনে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন । তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সত্যজিতের জীবনে । ঘরের ছেলের চোখেই আমরা বিশ্বভুবনের ছবি দেখলাম । সত্যজিৎ রায় বাঙালির হয়ে আর একবার প্রমাণ করলেন, বিশ্বনাগরিক হবার জন্য নিজের পাশপোর্ট পুড়িয়ে ফেলতে হয় না । নিজের বৈশিষ্ট্যে অটল থেকেই বিশ্ববাণীর বরপুত্র হওয়া যায়, কারণ পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বিশ্বময়ী বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা নেই ।

সত্যজিৎ রায় অবশ্যই বিস্ময়, সত্যজিৎ-এর জীবন অবশ্যই আলো-আঁধারে অস্পষ্ট, কিন্তু তিনি কোনোক্রমেই ব্যতিক্রম নন । বরং বাঙালিয়ানার ধারাবাহিকতায় তিনি আর একটি মর্মস্পর্শী দিক্‌চিহ্ন ।





আনন্দলোক

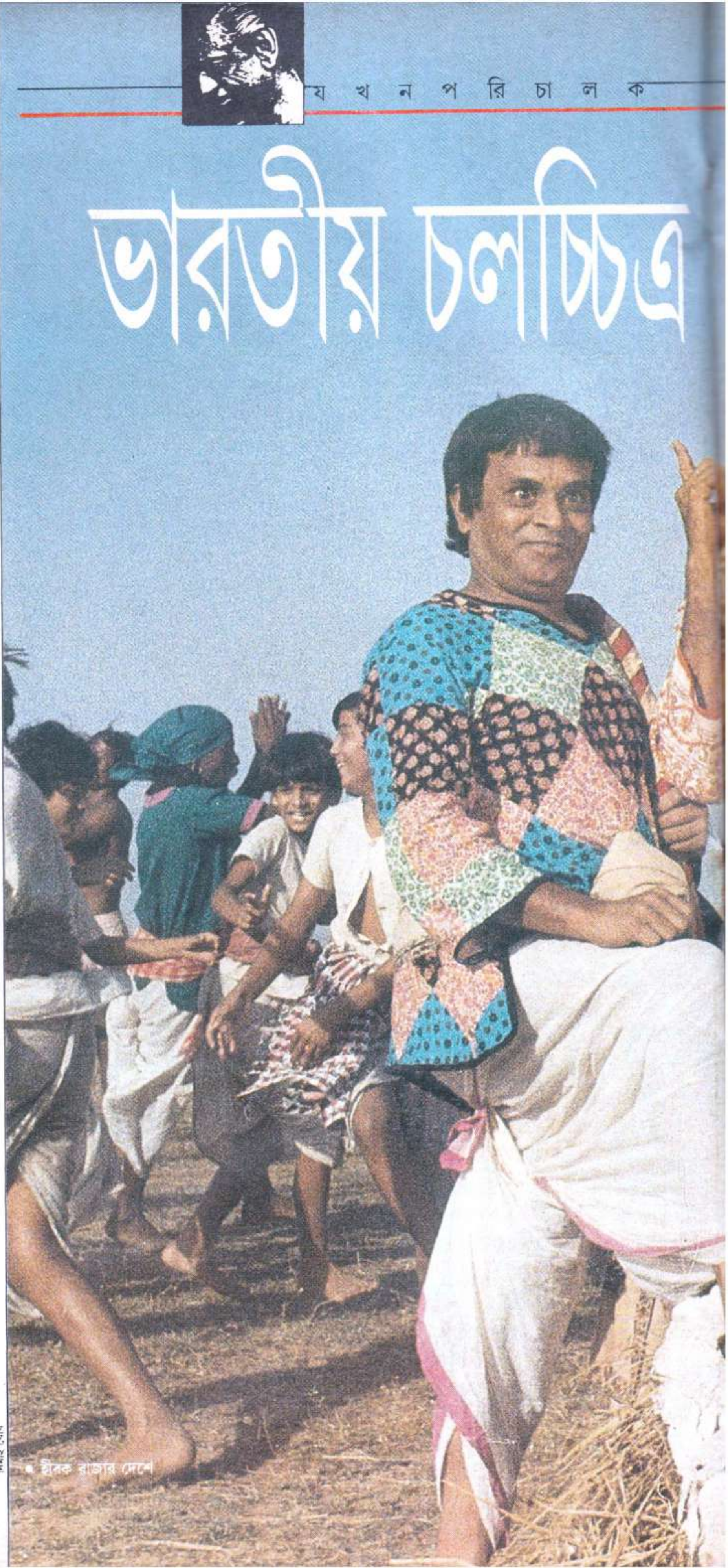
সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায় :
ঘরোয়া জীবনের এই ছবিটি এখন শুধুই স্মৃতি

ফটো : নিমাই ঘোষ

ভারতীয় চলচ্চিত্র



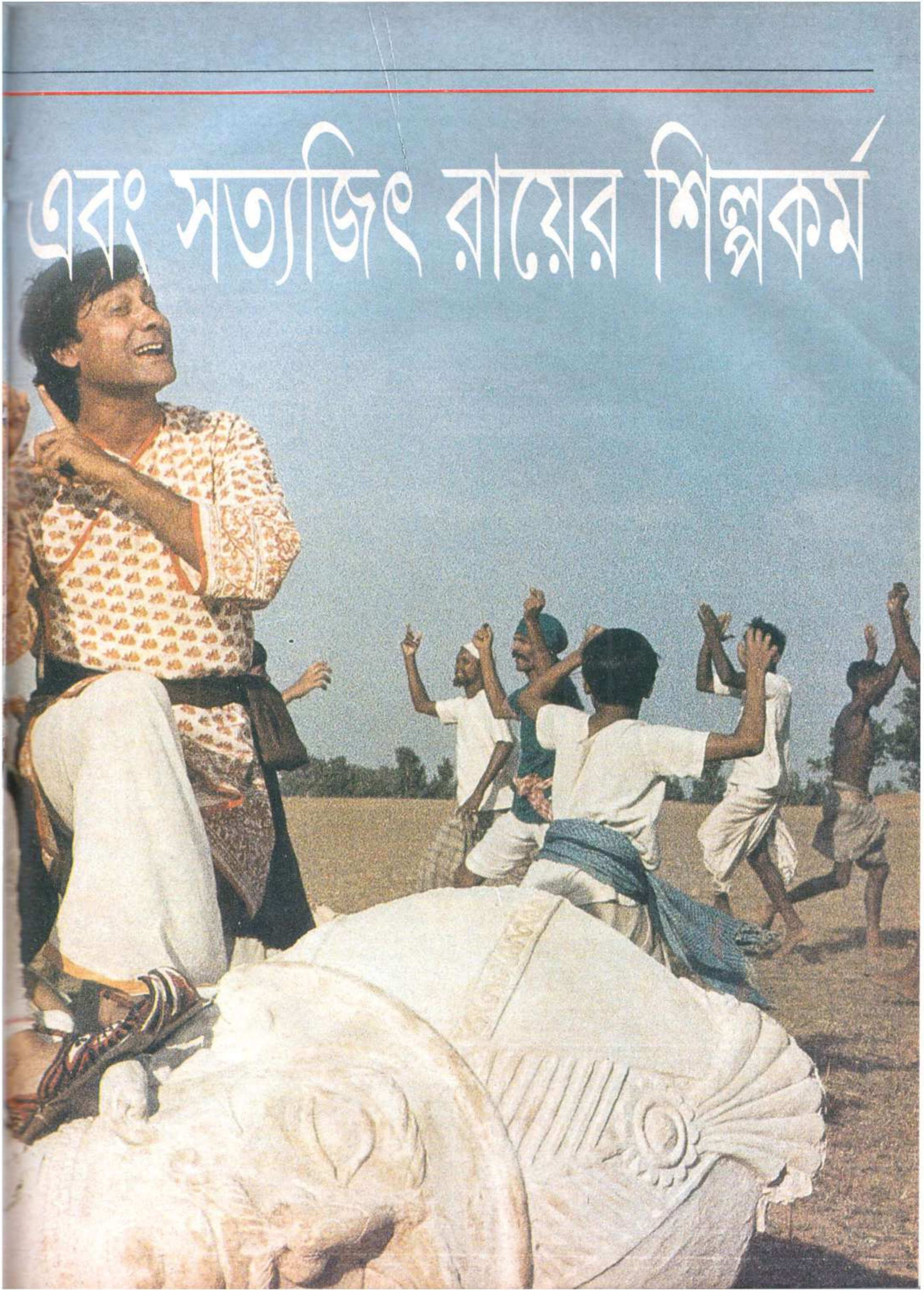
ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে সত্যজিৎ রায়ের আগমন কেন একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং তাঁর ছবি আমাদের শিল্পমানসে কতদূর পরিবর্তন ঘটাল তারই আলোচনা করেছেন **চিদানন্দ দাশগুপ্ত**।

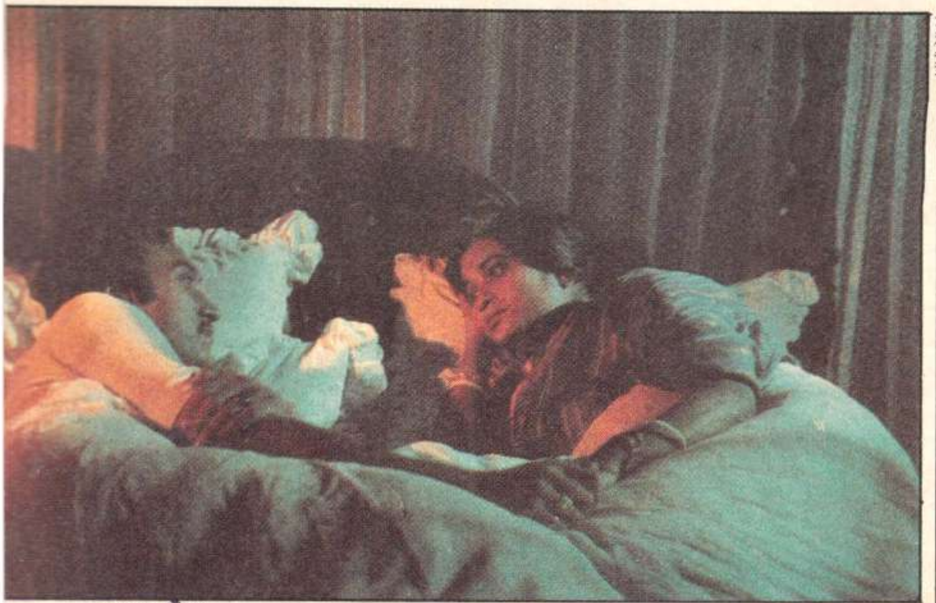


নিমাই ঘোষ

• হীরক রাজার দেশে

এবং সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্ম





• ঘরে-বাইরে



• গণশত্রু

• আগন্তুক



গোড়াতেই একটা কথা বলি, সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মের প্রায় গোটাটাই বাংলায়। সুতরাং আমরা বাঙালিরা সত্যজিৎ রায়কে যেভাবে চিনি সেভাবে বাকি ভারতবর্ষ চেনে না। বাংলার বাইরে যখন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখানো হয়, তখন সেটা ইংরেজি সাবটাইটেল সহযোগে দেখানো হয়, যে সাবটাইটেলগুলি বিদেশি ফিল্মফেস্টিভ্যালে দেখানোর জন্যে তৈরি। আমাদের দেশের অধিকাংশ দর্শক সাবটাইটেল সহ ছবি দেখতে অভ্যস্ত নয়। তার ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারা বাঙালির কাছে এবং বিদেশিদের কাছে সত্যজিৎ রায়ের বিরাট খ্যাতির কথা শোনে, কিন্তু নিজেরা বুঝতে পারেনা এই খ্যাতি কীসের জন্যে। কাজেই সত্যজিৎকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গেলে এই ঘটনাটা মনে রাখতেই হয়। এটা অনেক সময়ে বিদেশিরাও ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন যে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা লোকে দেখেনা। তা তো ঠিক নয়, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র বাঙালিরা যথেষ্টই দেখেন। সারা ভারতবর্ষে দেখেনা অবশ্যই, এবং এর কারণ বিদেশিরা বোঝেন না। এই কারণটা হল ভাষাগত ব্যবধান।
বিদেশিরা মনে করেন সত্যজিৎ রায় যদি বিখ্যাতই হন, তাহলে হ্যামবার্গার যেমন পৃথিবীর সবজায়গায় পাওয়া যায় সেরকমভাবে সত্যজিতের সিনেমাও সব জায়গায় দেখানো হবে। এটা যখন হয় না তখন নিশ্চয়ই, এবং অবাঙালি ভারতীয়দের অধিক সংখ্যক লোক, এমনকি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকও, মনে করেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গভীর রহস্য আছে। এর কারণ তাঁরা বুঝতেই পারেন না এত খ্যাতি কীসের জন্যে? কিছুলোক 'পথের পাঁচালি' শুধু দেখেছেন। বোম্বাই বা মাদ্রাজে যাঁরা ফিল্ম নির্মাতা তাঁরাও শুধু হয়ত 'পথের পাঁচালি' দেখেছেন, এর বেশি এগোননি। এবং সেইখান থেকে তাঁদের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে আছে বিদেশে আমাদের দেশের দারিদ্র্য দেখিয়ে সত্যজিৎ রায় নাম করেছেন। এখন এই অসঙ্গতিটা একটা বিশেষ সময় কালের ঘটনা। এটার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রকর্মের প্রসাদগুণ বা তার মূল্যায়নের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। সেই মূল্যায়ন যদি আমরা করতে চাই তাহলে একেবারে অন্য ধরনের কথা বলতে হবে।
ভারতীয় চলচ্চিত্র বলতে স্বাধীনতার

পূর্ববর্ত্তী বা পঞ্চাশ দশকের পূর্ববর্তী যে-সমস্ত ভারতীয় চলচ্চিত্র, তার রীতিনীতি, তার শিল্পগত গুণমান আর স্বাধীনতার পরবর্তী বিশেষ করে পঞ্চাশ দশকের পরবর্তী ভারতীয় সিনেমার সেই সমস্ত দিক থেকে যে বিচার দুয়ের মধ্যে একটা আসমান-জমিন ফারাক আছে। কেননা, আমরা জানি যে এ-দেশি চলচ্চিত্রের মধ্যে শিল্পগত চলচ্চিত্র এবং ব্যবসায়িক চলচ্চিত্রের মধ্যে ও-ধরনের ব্যবধান ছিল না। এই ব্যবধানটা না থাকার কারণটা হচ্ছে তখন প্রধানত মধ্যবিত্তের জন্যেই সিনেমাটা তৈরি হত। দু-রকমের ছবি তৈরি হত। একটা ধরন হল পৌরাণিক, আর আর একটা হল সামাজিক। সামাজিকের মধ্যে যতরকমের বিভেদ থাকুক প্রধান ভেদটা ছিল পৌরাণিক এবং সামাজিকের মধ্যে। কারণ পৌরাণিকের মধ্যে অনেক নতুন সিনেমার দর্শক অর্থাৎ যারা প্রথম সিনেমা দেখছে, গ্রাম্য দর্শক, অশিক্ষিত দর্শক, এই ধরনের দর্শকের সমাগম ছিল। মেয়েদের সমাগম ছিল। ধর্মভারত একটা সম্প্রদায়, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে এই ছবিগুলি ছিল। আধুনিক ভারত বলতে যাকে বোঝায় তার সঙ্গে ওই সব পৌরাণিক ছবির সম্পর্ক ছিল অনেক কম। বরং সামাজিক ছবির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি। কিন্তু সেই সামাজিক ছবির মধ্যে



• পথের পাঁচালি



• অপরাজিত

দেখা যায় যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং ভারতকে স্বাধীন করার যে আবেগ, যেটা সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারকদের মধ্যে ছিল, তার প্রকাশ। তার মধ্যে নারী-স্বাধীনতা, জাতিভেদ অবলোপ, পণপ্রথা তুলে দেওয়া, ইংরেজকে দেশ থেকে দূর করা, নিজেদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা, নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করা—এইসব ছিল। সামনের দিকে এগোনোর একটা মনোভাব ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে একটা বিরাট পরিবর্তন এল। সেই পরিবর্তনে দেখা গেল যে, এই ছবি আর মধ্যবিত্ত কেন্দ্রীক রইল না। ছবির দর্শক-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল নতুন শ্রমিক শ্রেণী এবং গ্রাম থেকে শহরে আসা যে-সমস্ত অশিক্ষিত লোক যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে এসে কাজ না পেয়ে এখানে-সেখানে আছে। এই শ্রেণীই হয়ে দাঁড়াল দর্শক মহলের কেন্দ্র। এই দর্শকের জন্যে প্রধানত ছবি তৈরি হতে শুরু করল এবং এটা এমনই পঞ্চাশ দশক থেকে বদলাতে-বদলাতে আজকের দিনে সম্পূর্ণই ওই ধরনের দর্শকের দিকে চলে গিয়েছে। এই দর্শকের মধ্যে, যাকে 'লুম্পেন' বলে, সেই ধরনের দর্শকের সংখ্যা বেশি। হিন্দিভাষী

বা তামিলভাষী বা তেলুগুভাষী মধ্যবিত্ত, সেই মধ্যবিত্ত বাধ্য হয়ে যেহেতু এই ছবি দেখতে পাওয়া যায় অন্য ছবি দেখতে পাওয়া যায় না, সেহেতু ওই শ্রমিক-কেন্দ্রীক ছবি, অশিক্ষিতকে উদ্দেশ্য করে যে-ছবি তারই গ্রাহক হয়ে দাঁড়াল। এর প্রধান কারণ অর্থনীতিক। এর ফলে নতুন মনোভাবসম্পন্ন, সমাজসংস্কারক, সমাজের প্রগতিশীল যে-অংশ, তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল অন্য আর একধরণের ছবি যে-ছবি আমাদের দেশে তৈরি হত না। ঠিক এই সময়ে দেখা দিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সময় আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই সেটা হচ্ছে অন্যান্য যে-সব শিল্পে যতরকমের নতুন আন্দোলন দেখা দিচ্ছিল, উদ্ভাবন দেখা দিচ্ছিল তার সঙ্গে তখনকার চলচ্চিত্রের প্রায় কোনও সম্পর্কই ছিল না। চলচ্চিত্র যে শিল্প হিসেবে একটা মাধ্যম এই ভাবনাটাই তখন গড়ে ওঠেনি। চলচ্চিত্র তখনও পর্যন্ত সেলুলয়েডের ফিতের ছাপা এই হিসেবে চলচ্চিত্র। ফলে মনোবৃত্তির সঙ্গে যা পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছিল। একটা ফাঁক হল অর্থনৈতিক, এবং দ্বিতীয় ফাঁক হল শিল্পগত। কেননা, চলচ্চিত্র যে তৈরি হল



● জলসাঘর



● পরশপাথর

এর ফলে নতুন মনোভাবসম্পন্ন, সমাজ- সংস্কারক, সমাজের প্রগতিশীল যে-অংশ, তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল অন্য আর এক ধরনের ছবি যে-ছবি আমাদের দেশে তৈরি হত না। ঠিক এই সময়ে দেখা দিলেন সত্যজিৎ রায়।

সেটা কোথায় তৈরি হল ? সেকি কৃষিপ্রধান সমাজে তৈরি হয়েছিল ? হয়েছিল শ্রমশিল্পপ্রধান দেশে । যেখানে যখন চলচ্চিত্রের উদয় হয়, সেখানে তখন শতকরা পনেরো থেকে কুড়িভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল । আজকে সেখানে হয়তো পাঁচভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে । ভারতবর্ষে আশি ভাগ লোক কৃষি নির্ভর । শ্রমশিল্পের দেশে যদি একটা শিল্প উদ্ভব হয় এবং সেটাকে যদি কৃষি প্রধান দেশের মধ্যে নিয়ে এনে ফেলা যায় তাহলে তার চেহারাটা এক হবে না । যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের, তখন থেকে ভারতের শ্রমশিল্পের চেহারাটা বদলাতে শুরু করেছে । এবং নতুন ধরনের সমাজ, নতুন ভারত, শ্রমশিল্পের জগতের দিকে এগোচ্ছে, সেই ভারতের গোড়াপত্তন হয়েছে । এখন চলচ্চিত্রের সঙ্গে শ্রমশিল্পের সম্পর্কটা কী ? কেবল কি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হয় এবং রাসায়নিক দিয়ে পরিস্ফুটন হয় ? সেখানে আসল ব্যাপারটা হচ্ছে চলচ্চিত্রের একটা প্রয়োজন ছিল সেই সমাজে । আমাদের সমাজে সেই প্রয়োজনটা ছিল না । ওদের প্রয়োজনটা কী রকম ? শ্রমশিল্পের জগতে নতুন যে-অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেই নতুন অভিজ্ঞতাকে রূপ দেবার জন্যে একটা নতুন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়েছিল । এই যে দুটো জগৎ, এই দুটো জগতের জন্যে দুটো চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হল । একটা ছিল, আর একটা নতুন করে তৈরি হল । একটা চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্র হচ্ছে খুব কাছে গিয়ে তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা আছে । আর একটা হল ছোট্ট একটা জিনিসকে বিরাটভাবে দেখিয়ে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখানো । এই ব্যাপারটা শুধুই চলচ্চিত্র পারে, আর কেউ পারে না । ছবি আঁকায় এটা বোঝানো যাবে না, স্থিরচিত্রে হয়তো আয়তন বোঝানো যেতে পারে কিন্তু গতিটা বোঝাতে পারে না । সমস্ত বস্তুজগতের প্রকৃত চেহারা দেখাতে পারে একমাত্র চলচ্চিত্র । ক্যামেরার সামনে যে-জিনিসটা আছে চলচ্চিত্র সেই ছবিই তুলতে পারছে । এবার অন্য একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে । শিল্পই যদি চলচ্চিত্রকে হতে হয়, তাহলে সে-ক্ষেত্রে তো শুধু বস্তুর প্রতিফলন করলে তার চলবে না । তাঁর অন্তরালে কী আছে সেটা দেখানোর ক্ষমতা থাকা দরকার । এখন সত্যজিতের ছবিতে আমরা কী দেখতে পাই ? অপু যখন দীঘির পাড়ে কাঠকয়লা দিয়ে দাঁত মাজছে, তখন দাঁত মাজতে-মাজতে জলের দিকে তাকিয়ে তার আঙুলটা



• অপুর সংসার



• দেবী

থেমে গেল। অপু কী ভাবল সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই যে মানুষ কী ভাবছে, সে কথা না বললেও আমরা বুঝতে পারছি এই জিনিসটা আদৌ ছিল না। মরবার সময় বক্তৃতা দিয়ে যেতে হয় যে আমি মরছি। এবং এটা হচ্ছে কোন দেশে? যে-দেশে আমরা যাত্রায় দেখছি একটা লোক মরে গেল, এবং দৃশ্য শেষে সে উঠে চলে গেল। এখানে চলচ্চিত্রে যদি দেখানো হয় সে উঠে চলে গেল তাহলে তো চলবে না। এখানে অবশ্যই একটা ইলিউশন অব রিয়েলিটি তৈরি করতে হবে। অথবা তার অন্তরালও দেখাতে হবে। সেটার কৌশল আয়ত্ব করতে পারলে তবেই চলচ্চিত্র শিল্প হয়ে উঠবে। যেমন, ধরা যাক একজন লোক জলের ধারে বসে আছে। এটা দেখলে কতরকম জিনিস আমাদের মাথায় আসতে পারে। সে কি আত্মহত্যা করতে এখানে এসেছে? সে কি মাছ ধরছে? সে কি কিছু একটা ভাবছে? সত্যিই যদি সে কিছু ভাবে তাহলে কী ভাবছে? প্রাত্যহিক জীবনে এইভাবেই আমরা বিচার করি। ঠিক সেই বিচারটাই চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে হয়। সেই জন্যই

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সব সময়েই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। এবং যখন সেটা ঘটছে তখন মনে হচ্ছে এটাই তো প্রত্যাশিত। এটাই তো ঠিক। তখন একটা অমোঘতা আসছে তার মধ্যে।



● কাঞ্চনজঙ্ঘা



● পোস্টমাস্টার

মানুষের চেহারার অন্তরালে কী আছে সেটাই হল চলচ্চিত্র। সত্যজিতের ছবিতে যেটা হল সেটা হচ্ছে আজকের শ্রমশিল্প জগৎ এবং ফ্রয়েড-মার্ক্স-এর পরবর্তীকালের যে-জগৎ, সেই জগতের মানসিক বিশ্লেষণ, বস্তু বিশ্লেষণ সমস্ত রকমের বিশ্লেষণ যার মধ্যে আছে, সেই বিশ্লেষক ক্ষমতা যে-শিল্পের মধ্যে আছে সেই শিল্পের স্তরে চলচ্চিত্রকে তিনি নিয়ে এলেন। এমন একটা স্তরে নিয়ে এলেন যে-স্তরে অমৃতা শেরগিল আছেন, রবীন্দ্রনাথ আছেন, প্রেম চন্দ আছেন, তারাশঙ্কর আছেন। এই ব্যাপারটা বড় সুন্দর করে রমেশ সিপ্পি বলেছেন, 'সত্যজিৎ চরিত্রকে যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেন সেটা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বোঝবার ক্ষমতা নেই। সেই জন্যই সত্যজিৎ শিল্পী, ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র-শিল্পী। এবং সেই শিল্পে তিনি যা করতে পারেন আমরা তা কখনও করতে পারি না।' চলচ্চিত্রকে এই যে শিল্পের জায়গায় তুলে দেওয়া এটা সত্যজিতের মাধ্যমেই প্রথম হল। আমি বলব না যে তাঁর আগে কোনও শিল্পগুণান্বিত ছবি ছিল না। 'দুনিয়া না মানে' আমার খুবই ভাল লেগেছে। তবুও আমি বলব শিল্পভাষা হিসেবে সত্যজিৎ যে-ভাষা আমাদের সামনে





• সমাপ্তি



• অভিযান

উপস্থিত করালেন তার সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয়ই ছিল না। পরিচয় না থাকার একটা কারণও ছিল। আমরা হলিউড ছাড়া অন্য কোনও জায়গার ছবি দেখতে পেতাম না। অন্য কোনও দেশের ছবির সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও পরিচয় ছিল না। সত্যজিতের নিজের পরিবর্তনটাও হয় বিদেশি ছবি দেখার ফলে। 'বাইসাইকেল থীফ' দেখা কিংবা রেনোয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ঘটনাতো সকলেই জানেন। হলিউড থেকে শেখবার ছিল না তা নয়, তিনি অনেকবার বলেছেন কাজ শিখেছেন হলিউডের ছবি দেখে। এবং এটাও বলেছেন হলিউড থেকে কী-কী নিতে হবে সেটাও আমি বুঝেছি, কী-কী বাদ দিতে হবে সেটাও আমি বুঝেছি। সুতরাং হলিউড থেকে শেখা এবং না-শেখা দুটোই আছে। এই দুটো উপায়তো আমাদের সামনে ছিল না। আমাদের সামনে ছিল হলিউড। এবং সেটাকে আমাদের নিজস্ব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া ছিল না। মিলিয়ে নেওয়া কী ভাবে ? যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, নৌটঙ্কির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলাম আমরা।

চলচ্চিত্রের প্রধান ধর্মটা কী ? সত্যজিত রায়ের ছবিতে সব সময়েই একটা

অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে । এবং যখন সেটা ঘটছে তখন মনে হচ্ছে এটাই তো প্রত্যাশিত ! এটাই তো ঠিক ! তখন একটা অমোঘতা আসছে তার মধ্যে । যেন সত্যি-সত্যিই জীবনে এটা ঘটেছে । এটা যে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হচ্ছে, একজন লোক যে বলছে 'কাট', সেটা তখন আর কারও মনে থাকে না । মনে হবে যেন আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং আমার মধ্যে একটা অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে । 'পথের পাঁচালি' ছবিতে ওই জন্যেই ইন্দিরঠাকুরুণের মৃত্যু দৃশ্যে একটা ঘটি ব্যবহার করা হয়েছিল । জীবন আর মৃত্যুর তফাৎ যে-দুটি শিশু বোঝে না, ডেকে-ডেকে তারা যখন বুঝতে পারেনি তখন ধাক্কা দিয়েছে, তখন সে উল্টে পড়ে গেল 'ঠাস' করে । এই যে 'ঠাস' করে উল্টে পড়ে যাওয়াটা এখানে একটা আওয়াজ আছে । স্বভাবত যতটা জোরে এই আওয়াজটা হওয়া উচিত তার চেয়েও অনেক জোরে, সেটা একটা ধাক্কা দেওয়ার জন্যে । এটাই হল চলচ্চিত্রের উদ্ভাবনের ক্ষেত্র । সিনেমার শিল্পগত উদ্ভাবন । এবং তারপরে ঘটিটা গড়িয়ে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল । এই ব্যাপারটাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন । ওই সময়ের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত একটি মারাঠি ছবির নাম 'শ্যামকি আই', অর্থাৎ শ্যামের মা । ছবিতে শ্যামের মাও মারা যায় । শ্যাম ছোট ছেলে । কিন্তু দুটো শিল্পরীতি একেবারে আলাদা । সেই ছবিতে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে-কাতরাতে মা মারা যাচ্ছে । আর ছোটছেলে মার কাছে যাবে বলে ছুটতে-ছুটতে আসছে । তার মা-মা ডাক সারা আকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । এই হল দুটো মৃত্যুদৃশ্যের তফাৎ । দুটি মৃত্যুর একটিতে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, অন্যটিতে রয়েছে সঙ্কেত । দ্বিতীয়টিতে প্রত্যক্ষতার অভাব রয়েছে । প্রত্যক্ষতার ব্যবহারই হল সিনেমার ধর্ম । সেই স্বধর্মকে সত্যজিৎ তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়ে ব্যবহার করেছেন । 'অপু ত্রয়ী'তে যে তিনটি মৃত্যু রয়েছে, তার প্রতিটিই আলাদা, স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল এবং অসাধারণ । 'অপুর সংসার'-ছবিতে অপর্ণার মৃত্যুর আগে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাওয়ার দৃশ্যে যখন আলোর একটা রেখা এসে অপর্ণার মুখে এসে পড়ে তখন আমরা বুঝে নিই এই মুহূর্ত কত ভঙ্গুর, এই মুহূর্ত যে এক্ষুণি আছে এক্ষুণি নেই, নশ্বরতার বোধটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় একটি দৃশ্যের মাধ্যমে । এই হল



● মহানগর



● নায়ক

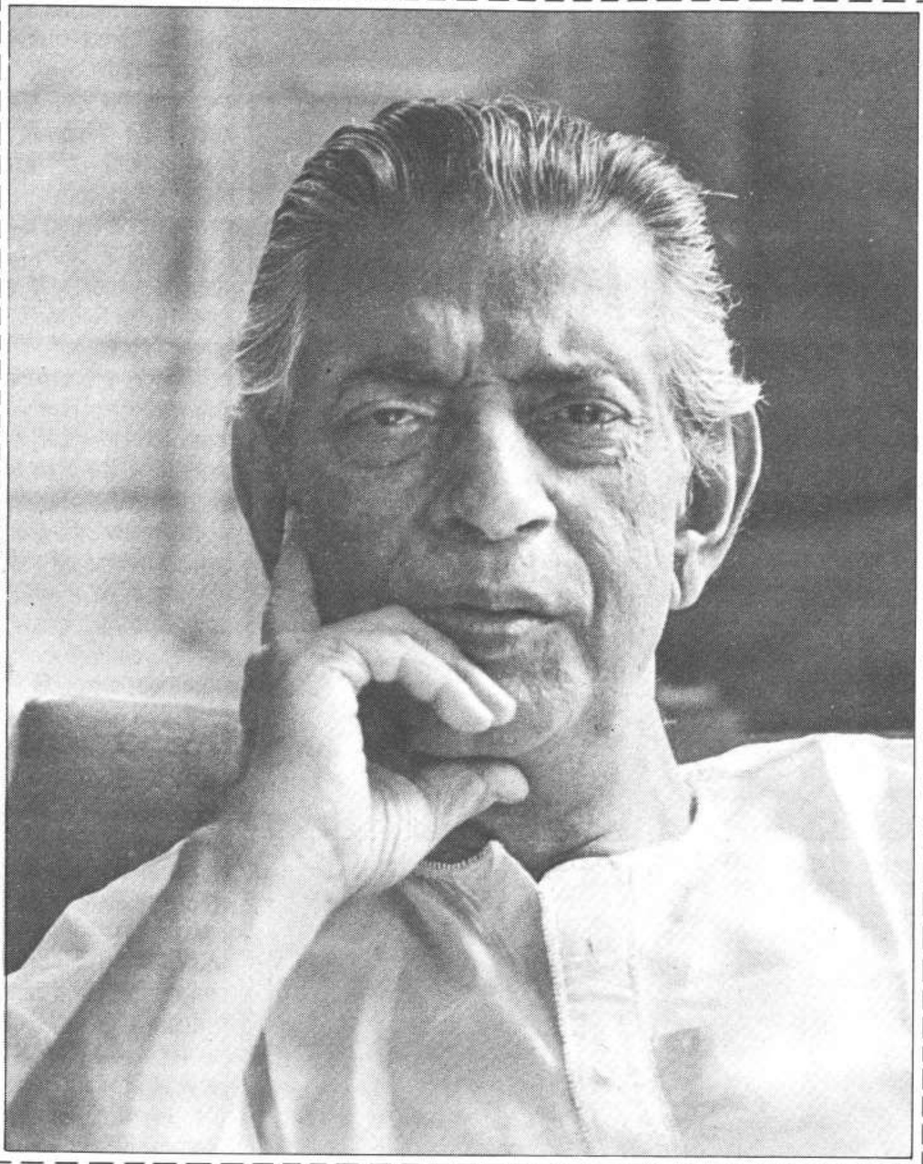


• চারুলতা



• গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সত্যজিৎ রায়ের অবদানের কথা। 'পথের পাঁচালি' যখন শতকরা চল্লিশভাগ শেষ হয়েছিল তখন সকলেই দেখতে চেয়েছিল। সকলেরই আগ্রহ এই যে নতুন ছেলেটি, যে সিনেমা নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছে, সে কী করেছে। দেখে তাদের বক্তব্য হল, 'এতো ডকুমেন্টারি। চলবে না।' পরে ১৯৬৪ সালে 'চারুলতা' মুক্তি পেল। 'চারুলতা' সেই বছরের দ্বিতীয় হিট ছবি। অর্থাৎ, 'চারুলতা'র ব্যবসায়িক সাফল্য হয়েছিল। তার মানে অনেক লোক 'চারুলতা' দেখেছিল। সাধারণ বাঙালি 'চারুলতা' দেখেছিল, দেখে অভিভূত হয়েছিল। এর মানে হল এই ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৪র সময়ের যে-ব্যবধান এর মধ্যে দর্শক সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখতে-দেখতে তাঁর ভাষাটা চিনে নিতে সক্ষম হয়েছিল। দর্শক তখন চলচ্চিত্রের ভাষা চিনতে শিখেছে। ভাষার যে-পরিবর্তন হয়ে গেল সেই প্রবল পরিবর্তনটা আশ্চর্যের বিষয় শুধু একটা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। ছবি তৈরি করেন যাঁরা তাঁদের একটা বিশেষ গোষ্ঠী। তাঁদের মাঝে মাঝে ব্যবসায়িক সাফল্য হচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেসব ছবিকে কেউ ব্যবসায়িক ছবি বলে না। ব্যবসায়িক ছবি যদি ব্যর্থ হয় তাহলেও সেটাকে ব্যবসায়িক বলা হবে, কিন্তু শিল্পগত ছবি যদি সার্থক হয় তাহলে সেটাকে ব্যবসায়িক বলা হবে না। কেননা, দুটো ছবির জাত আলাদা। আমাদের মত গরিব দেশে সত্যজিৎ রায় যে-খরচে যে-ধরনের ছবি করেছেন সেই ধরনের ছবি করার ক্ষমতা কারও ছিল না। এ-ক্ষেত্রে তিনি পথপ্রদর্শক। আজকের দিনে এই পথপ্রদর্শনটা পুরনো হয়ে গেছে। এখন এটা অনেকেই করে। অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা ছবিতে যদি বত্রিশটা গল্পাংশ থাকে তাহলে হয়ত সত্তরটা গল্পাংশ তাঁরা টেক করেন। ছবি এডিটিং-এর সময় বাকি গল্পাংশ ফেলে দেন। ভাবা যায় না। একবার সত্যজিৎকে জিগ্যেস করেছিলাম তিনি কখনও কোনও গল্পাংশ এই ভাবে ফেলে দিয়েছেন কি না ? খুব ম্রিয়মান হয়ে আমাকে তিনি বলেছিলেন, 'একবার হয়েছিল। 'পথের পাঁচালি'তে নেকলেসের সিনটায় ওরকম করতে হয়েছিল।' খুব দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন। এইরকম দুঃখপ্রকাশ হলিউড বা বোম্বাইয়ের কেউ কোনওদিন করবেন কি না সন্দেহ। সামান্য কিছু টাকা যে নষ্ট হয়েছে এটা তাঁর কাছে খুব





● অরণ্যের দিনরাত্রি



● জন অরণ্য



● প্রতিদ্বন্দ্বী

বেদনাদায়ক। কেননা যতটুকু টাকা পাওয়া যায় ততটুকুই সার্থক শিল্পের সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে হবে এই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় মূলধারার ছবির সঙ্গে এটা যে কতবড় বৈপরীত্য ভাবা যায় না। বোম্বাইয়ের কোনও নামজাদা ছবি করিয়ে আর সত্যজিৎ রায়কে পাশাপাশি বসালে যে তফাৎটা বেরিয়ে আসবে তা আশ্চর্যরকমের। অর্থাৎ, আমাদের ভারতীয় মূলধারার চলচ্চিত্র হল রাজপথ, আর 'পথের পাঁচালি' হল গ্রাম বাংলার পথ। এই দুটো পথের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটা পার্থক্য হল শিল্পের পার্থক্য। একটা শিল্প, অন্যটা শিল্প নয়। এই প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা বলে রাখি : যেটা সত্যজিৎও পারেননি এবং এঁরাও পারেননি তা হল এই দুটো পথকে মেলানো। অর্থাৎ, আমাদের দেশে শেক্সপিয়রের মতো চলচ্চিত্রকার তৈরি হয়নি। চ্যাপলিনকে আমরা বলি সিনেমার শেক্সপিয়র। তিনি শিল্প এবং ব্যবসাকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। সেই ক্ষমতা আর কারও মধ্যে নেই। সত্যজিৎ রায়ের মধ্যেও নেই। সত্যজিতের অবদান হল শিল্প কী ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এ-ছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পে যে একক সৃষ্টির একটা ব্যাপার আছে, একটি মানুষেরই চিন্তা, ভাবনা-অনুভূতি-বোধ মন্থন করেই যে এই শিল্প সৃষ্ট হয়, যেভাবে কবিতার সৃষ্টি হয়, একক-অনন্যতা বলতে যা বোঝায়, তা তিনি প্রমাণ করে দিতে পেরেছেন।



সত্যজিতের



সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে নারী চরিত্রগুলি কেমনভাবে উপস্থিত করতেন ? নারীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কেমন ছিল, অন্তত তাঁর ছবিতে তাই আলোচনা করছেন **রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** ।

চাপা যৌনতা । আগুন-পড়ে-যাওয়া আঁচের মতো । সত্যজিতের ছবির অধিকাংশ নারীর কথা ভাবতে এমনি এক চিত্রকল্প মনের মধ্যে ভেসে ওঠে । সেক্স নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের ছবির একটি জরুরি বিষয় । এবং এই বিষয়টির প্রতীক কিংবা বাহক সত্যজিতের নারী । এমন কী 'মহানগর' ছবির আরতি (মাধবী)-র মধ্যেও ছাই চাপা আগুনের মতো যৌনতা । যে রাত্তিরে বা যে-দৃশ্যে সে সুব্রতর পাশে ঘুমিয়ে আছে, সেখানে নয় । যখন সে বাড়ির বউ থেকে 'কেজো' মেয়ে, আপিস যাওয়ার জন্য সাজগোছ করছে, তখন ক্রমশ স্পষ্ট এই শরীরী দ্যোতনা । আরতির সেক্স অ্যাপিল চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে সেই মোক্ষম দৃশ্যে যেখানে জলের মতো পাতলা ব্লাউজের তলা থেকে প্রজাপতি ব্রেসিয়ার প্রায় উড়ুক্কু । আরতির পিঠ মিড-ক্লোজ-এ । এইভাবে কাজটা সেরেছেন সত্যজিৎ । নারীর শরীরী আবেদনের এমন উত্তেজক অথচ কাব্যিক ব্যবহার ভারতীয় সিনেমায় হায় কত কম দেখা যায় !

বক্ষ-বন্ধনীর এই সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীতে এক বণিতার (শেফালি) ব্রায়ের হুক খুলে দেওয়ার আবেদন প্রায় আলোকবর্ষের পথ, মেজাজে পরিবহে । নারীর শরীর আর অস্পষ্ট নয় । সত্যজিৎ রায়-ও যেন অনেক বেশি 'সিনিকাল' । অন্তত চারুলতার পেলব রোম্যান্টিকতা আর নেই । অবচেতনার তাড়না থেকে সোচ্চার যৌনতা দ্বিধাহীনভাবে অকপট । ব্রা-নারী-নারীর হাতে সিগারেট-আগুন-পিঠের ওপর নিতম্ব পর্যন্ত এলো চুল : সব মিলিয়ে আরও এক প্রচণ্ড প্রতীক । যৌনতার । যে-যৌনতার কোনও ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় নেই ।

এরই পাশাপাশি প্রতি তুলনায় রাখা যায় 'জনঅরণ্য'র আরতি ভট্টাচার্যকে । কলগার্ল-এর চরিত্রে আরতি । সামান্য কোণাকুণিভাবে একটি দৃশ্যে এই মধ্যবয়সী নারীর ভারি বুক । ইচ্ছাকৃত যৌনতা অথচ এতদূর বাস্তব যে অশ্লীলতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । মেয়েটির শাড়ি যা ঢেকে রাখে তার চেয়ে ঢেকে রাখে না অনেক বেশি । বেশি কথা নেই এই দৃশ্যে । আছে শরীরের সংরাগ । কিংবা সংলাপ । আমি দেখি যৌনতার এই উচ্চারণে বাস্তবধর্মী সিনিসিজম । সত্যজিৎ রায় কিন্তু আমার কাছে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন : 'মেয়েদের প্রতি আমি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হারিয়েছি ভেবে নেওয়াটা ঠিক হবে না । আমার মধ্যে একটা সনিসিজিম এসেছে হয়তো । এ পর্যন্ত বলতে পার । কিন্তু মেয়েদের প্রতি আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে ভাবাটা ভুল হবে । না, আমি মিসোজিনিস্ট হয়ে পড়িনি (হাসতে-হাসতে), সে অবস্থা থেকে এখনও অনেক দূরে আছি । মেয়েদের সততা, সিনসিয়ারিটিটা এখনও আমার কাছে খুবই বড় ব্যাপার । তার প্রমাণ 'জনঅরণ্যেই' পাবে । একটা ঘুণধরা সমাজে টিকে থাকতে গিয়ে তারা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে । কিন্তু তখনও তাদের অনেকের মধ্যেই একটা আশ্চর্য মানসিক জোর এবং এক ধরনের সততা রয়েই যাচ্ছে । যেমন ধরো, ওই মেয়েটি যাকে সোমনাথ একটি সেক্স-স্টারভাড় প্রৌঢ় ব্যবসায়ীর কাছে একটা অর্ডার পাবার জন্য ট্যাক্সিতে তার বন্ধুর বোন বলে চিনতে পারছে । এবং চিনতে পারার পর সে মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে যেতে চাইছে । কিন্তু আসল কথাটা হল, সোমনাথ খুব জোরের সঙ্গে ফিরে যেতে চাইছে না । অন্য ধারে মেয়েটি কিন্তু একবারও সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছে না । সোমনাথের মতো সামাজিক মর্যাদার কোনও প্রিটেশানস্ তার নেই । এখানেই তার সততা ।

'আমার ছবিতে অবিশ্যি কলগার্লস এবং বেশ্যারা কখনও কখনও গল্পের প্রয়োজনে এসেছে । সাধারণত বাংলা ছবিতে এ ধরনের চরিত্রকে সেন্টিমেন্টালাইজ করা হয় । আমি সেটা করি না । তার মানে এই নয় যে আমি খুব সিনিকাল । বলতে পারো, আমি বাস্তববাদী । কোনও মেয়ে

ছবির নারীরা



● মাধবী চক্রবর্তী : 'চারুলতা'-র চারু

যখন কলগার্ল বা বেশ্যা হয়ে যায়, সে সব সময়ে যে দুঃসহ অভাব থেকে সেটা হচ্ছে তা কিন্তু নয়। সাইকোলজিকাল ও বায়োলজিকাল কারণেও তো একটি মেয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে যেতে পারে।
কোনও-কোনও মেয়ের মানসিক গঠনই তাকে ওই পথে নিয়ে যায়। এবং তাদের বুঝতে গেলে ওইভাবেই বুঝতে হবে, সেন্টিমেন্টালাইজ করা চলবে না।
'জনঅরণ্য'-তে আমি আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের রূপটা দেখাতে চেয়েছি। এবং যতদূর সম্ভব ভাবপ্রবণতা এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে মেয়েদের মনের, তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক আজও আমাকে মুগ্ধ করে না। আমি এখনও বিশ্বাস করি আমাদের চারপাশের মেয়েদের অনেকেই আমাদের ইমোশনালি বাঁচিয়ে রাখে।'
নায়ক-এর অদিতি (শর্মিলা) এমনই এক মেয়ে। উগ্রভাবে শরীরী নয় অদিতি। বরং মূলত রোমান্টিকতার আবেদন। কিন্তু শরীর যে একেবারেই অনুচ্চারিত, তা-ও নয়। অদিতি যেন পুরুষের অবচেতন মনের স্বপ্ন। চাপা যৌনতা অনস্বীকার্যভাবে উপস্থিত। ব্লাউজের মধ্যে তার কলমটি গুঁজে রাখে অদিতি—ব্যস, ওইটুকুই। আরও কোনও বড়, গোঁত্তামারা, কর্কশ প্রতীকের প্রয়োজন হয় না সত্যজিতের। কলম ভাষার ব্যঞ্জনাকে বহন করে। এক্ষেত্রে সে-ভাষা নারী-শরীরের। সত্যজিতের ব্যাখ্যায় অদিতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইভাবে :
'ম্যাটিনি আইডল অরিন্দম ও অদিতি বলে ওই মেয়েটির মধ্যে ট্রেনে যেতে-যেতে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠুক, এটা আমি চেয়েছিলাম। ওই সময়টুকুর মধ্যে রোমান্স-এর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমি ওদের সম্পর্কের একটা চিত্তাকর্ষক ক্রমবিকাশ চাইছিলাম। মনে হল, এক ধরনের অনীহা বা নিঃসাড়তা থেকে কীভাবে ওরা দুজনে পরস্পরের প্রতি ক্রমশ সংবেদনশীল হয়ে পড়ল সেটা দেখাতে পারলে তার মধ্যে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আছে। সুতরাং আমি অদিতিকে কিছুটা উন্নাসিক, যুক্তিবাদী, তার্কিক স্বভাবের করে সৃষ্টি করেছি। ফলে, অদিতি নায়কের গ্ল্যামারে সহজে ভোলে না। অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ না সে বুঝতে পারছে এই পুরুষটি কোনও এক জায়গায় নিঃসঙ্গ, অসহায়, যার পক্ষে বন্ধুতার প্রয়োজন আছে। যে মুহূর্ত থেকে অরিন্দম নিজেকে অকপটে প্রকাশ করে মনের ভার হালকা করতে শুরু করল তখন থেকেই অদিতি বুঝতে পারল ওই পুরুষটির ওপরের রূপটি দেখার আর কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা তার অন্তর্নিহিত জীবনের আভাস যে ইতিমধ্যে পেয়েছে। প্রথমে পুরুষটির প্রতি তার মনোযোগ একান্তভাবে সাংবাদিকের কিন্তু কিছু পরেই অরিন্দমের স্বীকারোক্তি এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যে অদিতি বুঝতে পারে এরপর সেটাকে সাংবাদিকতার কাজে লাগানো অনৈতিক হবে। অদিতির দিক থেকে এবার যেটা আসছে তা হল সংবেদনশীলতা এবং সাহায্য করার ইচ্ছে।'
এক কথায়, অদিতি সত্যজিতেরও স্বপ্নের মেয়ে। এমন কিছু গুণ আছে তার মধ্যে যা সত্যজিৎ নারীর মধ্যে পেতে চান। অদিতি সংবেদনশীল। তার মধ্যে শীলিত সমবেদনার অভাব নেই। অথচ সে ভাবপ্রবণ কিংবা নির্বোধ নয়। সে তলিয়ে দেখে। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে

● 'সীমাবদ্ধ' ছবির দুই নারী চরিত্রে পারমিতা ও শর্মিলা



কোথাও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে গভীরতার বিরোধ নেই। সে অরিন্দমের প্রতি সাড়া দেয় বুদ্ধি ও বোধ থেকে। ভাবালুতার বশে নয়। তার চরিত্রের গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত সংহতির মধ্যেই তার আধুনিকতা। বলা যেতে পারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আধুনিক নারী তার সম্পূর্ণতা পেয়েছে অদিতির মধ্যেই। কিন্তু যে ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল অদিতির এই ভাবালুতাহীন অনুচ্ছ্বাস তাকে কোনওভাবেই মানুষ হিসেবে জুড়িয়ে দেয়নি। অরিন্দমের প্রতি তার মায়া, মমতা, ভালবাসা, উষ্ণতা ক্রমশই বেড়েছে। অদিতির সাজপোষাকের এবং ব্যবহারের ঋজুতার সঙ্গে তার সহজাত লাবণ্য এবং নম্রতার কোনও ঝগড়া বাধেনি কোথাও।

'সীমাবদ্ধ'র সুদর্শনার (শর্মিলা) সঙ্গে নায়ক-এর অদিতির আত্মীয়তা খুবই স্পষ্ট। সুদর্শনার ভূমিকাতেও যে শর্মিলাই থাকবেন, তা প্রায় স্বাভাবিক মনে হয়। অদিতিই যেন অন্য নামে সত্যজিতের ছবিতে আরও একবার ফিরে এল। কিন্তু মেয়েটি এক হলেও তার পুরুষটি এক



● 'কাপুরুষ' ছবির করুণা চরিত্রে মাধবী

● 'অরণ্যের দিনরাত্রি' : আদিবাসীকন্যার চরিত্রে সিমি



নয়। সত্যজিৎ তার স্বপ্নের নারীকে অন্য এক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন সীমাবদ্ধতে। নায়ক-এর কাহিনীতে অরিন্দম আর অদিতির মধ্যে একটি সহজ বন্ধুত্বকে ক্রমশ আরও কাছে সরে আসে। ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে সীমাবদ্ধতে। শ্যামলেন্দু আর সুদর্শনার মধ্যে সম্পর্কটা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যায়। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় ওরা। এটা ঘটে শ্যামলেন্দু বিষয়ে সুদর্শনার স্বপ্নভঙ্গের সূত্র ধরে। অরিন্দম তার মিথ্যাশ্রিত পৃথিবী থেকে পালিয়ে আসতে চাইল বলেই অদিতির ভালবাসা ও সমবেদনার মধ্যে আশ্রয় পেল। আর শ্যামলেন্দু তার কাজের জগতের মিথ্যাশ্রিত সাফল্যের বোঝাটাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারল না বলেই সুদর্শনার বন্ধুতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অদিতি এবং সুদর্শনার মধ্যে, তাদের চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে সেই সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে যা আমাদের বলে দেয় কেমন মেয়ে সত্যজিতের চোখে সুন্দর। এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তরও একবার তিনি দিয়ে ছিলেন আমায়।

আমার কাছে মেয়েদের সৌন্দর্যের রূপটি মূলত ইন্টেলেকচুয়াল। এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যও বলতে পার। অর্থাৎ আমার কাছে সৌন্দর্যটা পুরোপুরি দেহের ব্যাপার নয়। বুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পর্কটা গভীর। মেয়েদের যে গুণগুলো আমার



● 'ঘরে-বাইরে' : বিমলার চরিত্রে স্বাতীলেখা



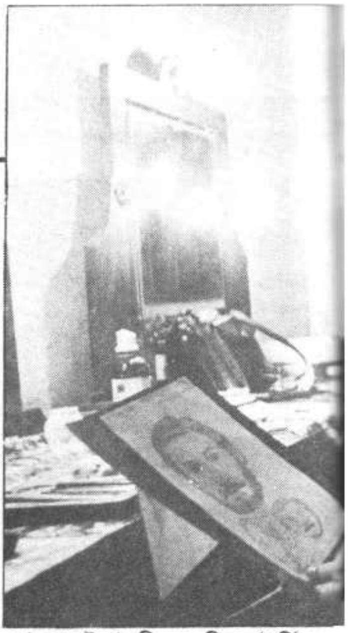
● 'প্রতিদ্বন্দ্বী' : শেফালী ও কল্যাণ চ্যাটার্জি

'জনঅরণ্য'-তে আমি আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের রূপটা দেখাতে চেয়েছি। এবং যতদূর সম্ভব ভাবপ্রবণতা এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে মেয়েদের মনের, তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক আজও আমাকে মুগ্ধ করে না। আমি এখনও বিশ্বাস করি আমাদের চারপাশের মেয়েদের অনেকেই আমাদের ইমোশনালি বাঁচিয়ে রাখে।

বিশেষভাবে ভাল লাগে সেগুলো হল, ইনটেলিজেন্স, গ্রেস আর সফিস্টিকেশন। তার মানে এই নয়, যে আমার ছবির সব মেয়েরাই কালচার্ড বা লেখাপড়া জানে। যেমন ধর, অভিযান-এ গুলাবী (ওহায়িদা রেহমান) কিংবা অরণ্যের দিন-রাত্রি-তে ওই সাঁওতাল মেয়েটি (সিমি)—ওরা তো একেবারেই লেখাপড়া জানে না। ওদের মধ্যে কোনও রকম শহুরে সফিস্টিকেশনও নেই। কিন্তু ওদের ফিলিংগুলো খাঁটি, জেনুয়িন। এবং ওরা যেভাবে ভালবাসা, প্রেম, ঘৃণার প্রতি একেবারে স্বাভাবিকভাবে রেসপনড করে, সেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়। আর এই রেসপন্সের মধ্যেই ওদের চরিত্রের সৌন্দর্যটা প্রকাশিত হয়।
'আবার চারুলতার মতো মার্জিত, সেনসিটিভ মেয়ের সৌন্দর্যের মূল ব্যাপারটাও কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল। চারুর সৌন্দর্যের অনেকটাই তার মনের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আমার ছবিতে চারুলতার মনটাকে যতটা পেরেছি খুলে দিয়েছি। সেটা দেখাতে গিয়ে অমলের প্রতি তার অবৈধ প্রেমটাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হয়েছে। অমলের সঙ্গে চারুর ভালবাসার সম্পর্কটা অসামাজিক। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই চারুর মনের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে।
'আমার মনে হয় মেয়েদের সৌন্দর্যর অনেকটাই তাদের ধৈর্য আর সহনশীলতার মধ্যে ধরা দেয়। মেয়েদের প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুতার মধ্যে তাই আমি একটা বেসিক অনেস্টি দেখতে পাই। মেয়েদের চেয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষরা অনেক বেশি ভঙ্গুর। সেখানে মেয়েরাই পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে। নারীর চেয়ে পুরুষের সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি অনেক বেশি, অন্তত আমাদের সমাজে। সেক্ষেত্রে পুরুষ যে নারীকে প্রোটেক্ট করবে সেটা আমার কাছে খুব কিছু ইন্টারেস্টিং লাগে না। তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর মেয়েদের অন্তরের ঐশ্বর্য, যেখানে তার আসল সৌন্দর্য, যা দিয়ে সে পুরুষকে প্রোটেক্ট করতে পারে, প্রেরণা দিতে পারে।'
কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের অন্তরের সৌন্দর্য কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে পারে? স্ত্রী-স্বাধীনতার কঠিন জেহাদের মধ্যেই বা নারীর মনের সৌন্দর্য কতটুকু ফুটে ওঠে? এই অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি কি অন্য কোথাও, অন্য কোনও সামাজিক পরিবহে? মূল্যবোধে? সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক ছবি আগন্তুক-এর ওই গৃহবধূটি (মমতাশঙ্কর) যে শেষ পর্যন্ত তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এমন কি সন্তানের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তা কি তার অন্তরের সহজাত তাড়নার জন্যই নয়, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ধরনের কঠিন সততা। যে সততা সৌন্দর্যের আধার।



১৯৬০ সালে 'জলসাঘর' তৈরির সময়ও আমি ছিলাম সত্যজিৎ বাবুর তখনকার মেক-আপ ম্যান শান্তি সেনেরই সহচর বা সহকারী। শান্তিবাবু 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'-এ সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে কাজ করে ফেলেছেন ততদিনে। সত্যজিৎবাবুর চিত্রনাট্য এবং মিউজিকে প্রযোজক বিজয় চ্যাটার্জি এবং সাউন্ড-রেকর্ডিস্ট দুর্গাদাস মিত্র একটি ছবি করবেন ঠিক করলেন এক সময়। ছবিটার নাম 'অভিযান'। ওঁরা দুজনে সত্যজিৎবাবুকে এই ছবিটার চিত্রনাট্য আর গান করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটার প্রথম দিনের শুটিংটাও তাঁকেই করতে বলেছিলেন, যাতে ছবি তৈরির শুরুটা ওঁর হাত দিয়েই হয়।
দু-চারবার অনুরোধের পর সত্যজিৎবাবু রাজিও হলেন। কিন্তু প্রথম দিনের শুটিং দেখার পর বিজয় চ্যাটার্জি আর দুর্গা মিত্র বুঝতে পেরেছিলেন এরপর নিজেরা এই ছবির পরিচালনার ভার নিলে ব্যাপারটা ভীষণ বেমানান হয়ে যাবে। তাই ওঁরা ঠিক করলেন ছবির পুরো পরিচালনার ভারটা যেন মানিকদাই নেন। মানিকদা এ ব্যাপারের জন্য তৈরিই ছিলেন না। তবু ওঁদের অনুরোধ-উপরোধে রাজি হলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বললেন, 'অন্যের পরিচালনার জন্য আমি এ ছবির চিত্রনাট্য করেছি। আমি নিজে পরিচালনা করলে এর চিত্রনাট্যরও বদল ঘটবে। অর্থাৎ এটাকে নতুন ছাঁচে



● 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি-র

মানিকদা পছন্দ করতেন ন্যাচারাল মেক-আপ



● 'অশনি সংকেত' : ননী গাঙ্গুলি ও সন্ধ্যা রায়



নিমাই ঘোষ

মেক-আপ করছি

নিমাই ঘোষ





সত্যজিৎ রায়কে বলা হয় কমপ্লিট ফিল্ম মেকার। ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত সব ব্যাপারেই তাঁর জ্ঞান ও গভীরতা অনেক। মেকাপ নিয়ে তাঁর ভাবনা কেমন ছিল সে কথা বলছেন তাঁরই সহকর্মী **অনন্ত দাশ**

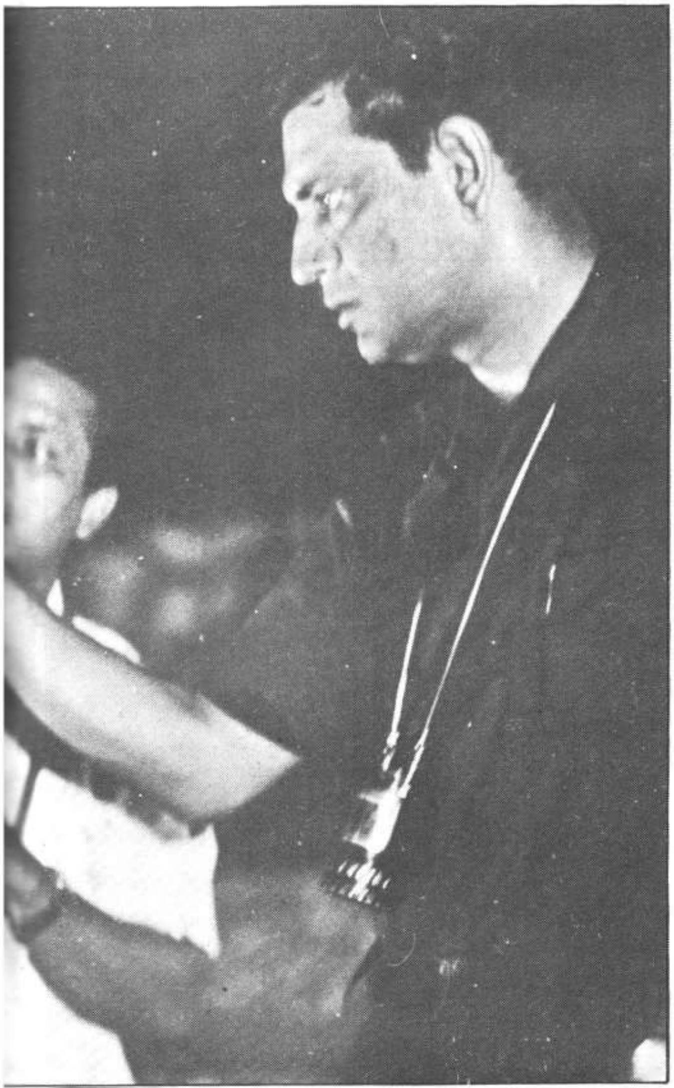
ঢালতে হবে!' তারপর অল্প দিনের মধ্যেই মানিকদা 'অভিযান'-এর স্ক্রিপ্ট নিজের মতো করে নিলেন এবং ছবিটা করলেন। আমিও সেইসময় মেক্-আপম্যান হিসেবে মানিকবাবুর কাছাকাছি এলাম অনেকটা। এরপরই মাত্র ছাব্বিশ দিনের শুটিংয়ে দার্জিলিঙে মানিকদা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটার কাজ সম্পূর্ণ করলেন। সে ছবিতেও আমি মেক-আপ ম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। তারপর মানিকদা হাত দিয়েছিলেন 'তিনকন্যা'-র কাজে। এবং আমাকে মেক-আপের পূর্ণ দায়িত্বও দিতে চাইলেন। আমি তখন 'সপ্তপদী'-র কাজ করছি। এবং পাশাপাশি আরও কয়েকখানা বাংলা ছবির কাজে ব্যস্ত। আমি পরিষ্কার করে ওঁকে আমার অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলাম। উনি মেনেও নিয়েছিলেন আমার কথা। কেননা 'তিনকন্যা'র তিনটে পর্বের গল্পে কাজের সময়টা অনেক বেশি বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু তারপর থেকে মানিকদা আমাকে আবার ডেকে নিয়েছিলেন এবং আমিও কাজ শুরু করলাম ওঁর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে। 'অশনি সংকেত' ছবিতে 'যদুপোড়া-'র চরিত্রে ননী গাঙ্গুলির মুখের পোড়া অংশের মেক-আপ ঠিক করার আগে উনি আমাকে বললেন, 'দ্যাখো অনন্ত' আগুনে ঝলসানো মুখ আমি বাস্তবজীবনে কম দেখেছি। তুমি মানুষের ঝলসানো মুখের একটা মেক-আপ কর, আমি তারপর বুঝে নেব।' এরপর আমি একটু লাউড করেই ননীর মুখের প্রোফাইলে পুড়ে যাওয়ার মেক-আপটা করলাম। উনি দেখে বললেন, 'ঠিকই আছে। একটু লাউড মনে হচ্ছে। এটাই একটু সফ্‌ট করো। আর এটা মাথায় রেখে করো যে, এই যদুপোড়ার সঙ্গেই

পেটের জ্বালায় অন্যের স্ত্রী সন্ধ্যা রায় ওর সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে । অতএব পোড়াটা যেন একেকভাবে বীভৎস না হয় । কেননা খিদের জ্বালাতে হলেও সেই মুখটাই কারো বা কোনো মেয়ের ভাল লাগছে কিন্তু...। ' এরপর আমার পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধেই হয়নি ।

'চিড়িয়াখানা' ছবিতে উত্তমকুমারের জাপানি সাজার একটা ঘটনা ছিল । উত্তমকে সেই মেক-আপটা করে দিতে মানিকদা বললেন, 'ও কে । এটাই ঠিক আছে । আমার কিন্তু মেক-আপটা নিয়ে মনে মনে একটা খুঁতখুঁতুনি কাজ করছিল । আর ব্যাপারটা মানিকদার কাছে কেনই বা ও কে হয়ে গেল—এটা ভেবে পেলাম না । কিন্তু নিজের মনে সেই খুঁতখুঁতুনিটা নিয়েই পায়ে পায়ে মানিকদার ক্যামেরার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম । কালো কাপড়ে মাথাটা ঢাকা দিয়ে মানিকদা তখন উত্তমকে লুক-থ্রু করছেন । হঠাৎ কাপড়টা সরিয়ে মাথাটা বার করে আমার দিকে তাকিয়ে পিঠের ওপর একটা আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, 'ডোন্ট ওরি ! সব ঠিক আছে । তুমি অতো ভাবছ কেন বলো তো ? আচ্ছা বলো, তোমার কি বলার আছে ?' আমি তখন কাঁচুমাচু মুখ করে মানিকদাকে বললাম, 'মানিকদা উত্তমকে যে মেক-আপটা করেছি এতে কিন্তু ওঁকে পুরোপুরি জাপানি মনে হচ্ছে না । বোঝা যাচ্ছে সাজানো ।' তখন মানিকদা বললেন, 'উত্তম তো জাপানি সাজছে—এই ব্যাপারটাই রয়েছে ছবিতে । ও তো অরিজিন্যাল জাপানি নয় । ও সেজেছে । তাতে তো নিখুঁত ম[illegible]া আসবে কেন ? তাতে কিছু খুঁত থাকবেই । আমার তো এটাই চাই ।' তখন আমার মনটা একেবারে পরিষ্কার, হালকা হয়ে গেল । কোনো ভাবনাই রইল না ।



আর একবার 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'-র সময় শাবানার মেক-আপ করেছি । শাবানা তখনও পর্যন্ত মানিকদার সঙ্গে কাজ করেননি । তাই ওঁর কাজের ধারাটা জানতেন না । মানিকদা বরাবরই 'ন্যাচারাল মেক-আপ' পছন্দ করেন । তার প্রথম পদক্ষেপটাই হল চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে শিল্পী নির্বাচনে ওঁর অসাধারণ দক্ষতা ! তারপর সেই মানুষটাকে হুবহু 'চরিত্র' হয়ে ওঠার জন্য ওঁর ডিটেল ভাবনা-চিন্তারও যেন কোনো শেষ নেই ! শাবানা মেক-আপ নেবার পর সামনের আয়নায় নিজেকে



তারাপদ ব্যানার্জী

• 'কাপুরুষ' ছবিতে দৃশ্যগ্রহণের আগে মাধবী চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায় ও আমি

আমি ঘাড় নাড়তেই, মানিকদা 'দ্যাট্স ও. কে. বলে কাজ শুরু করে দিলেন।
'চারুলতা'-র মতো বিশেষ পিরিয়ডের ছবিতে কাজ করার আনন্দটা একটা ক্লাসিক কাজের আনন্দ। আর 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর তিনটে পর্বে কাজের মধ্যে পেয়েছি ফ্যান্টাসি কাজের আনন্দ।
'গুপী গায়েন'...এ দুশো রকমের ভূত আর ভূতের রাজার মেক-আপ ছিল ফ্যান্টাসি মেক-আপের কাজ। তাতে সাহেব-ভূত, দেশী ভূত মোটা ভূত, রোগা ভূত, চাষী ভূত—এরকম নানা ভূতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মানিকবাবু বুঝিয়েছিলেন, 'ধরে নাও এ ধরনের প্রত্যেকটা ভূতই উঠে আসছে তাদের কবর থেকে। ভূত হলেও তাদের প্রত্যেকের আইডেনটিটি থাকবে তাদের চেহারার মধ্যেই। তাই বলছি, ওরা যেন কবর থেকে উঠে এসেছে, এটা মাথায় রাখবে। মনে রাখতে হবে, আমার ছবির ভূতকে দেখে কেউই যেন ভয় না পায়! ভয়ের বদলে মজা পায়! আমি ভূতকে দর্শকদের সামনে এ ভাবেই হাজির করতে চাই।' এরপর বললেন, 'আমি নেগেটিভ ছবিতে পজিটিভ কস্টিউম রাখব! নেগেটিভ প্রিন্টে মানুষের ছবি যেমন দেখায়, সেটাই হবে আমার ছবিতে ভূতের শরীর। আর তার গায়ে থাকবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পজিটিভ পোশাক!' এরপর নেগেটিভ প্রিন্টে ভূতের যা চেহারা হল, তাকে প্রসেসে আরও একটু ডিফিউস করে দিতে একটা মোম-গলা অবয়ব পাওয়া গেল।
এরপর তাদের গায়ে উঠল বিচিত্র সাজপোশাক বা ভূতের রাজার গায়ে আলোর খেলা!
'কাঞ্চন জঙ্ঘা' ছিল বাংলায় প্রথম রঙিন ছবি। এই ছবির মেক-আপের আগে মানিকদা আমাকে কালার মেক-আপ নিয়ে আমার কিছু পড়াশোনা আছে কি না বা কোনও অভিজ্ঞতা আছে কিনা—জানতে

দেখে বললেন, 'এটা আবার কেমনতর মেক-আপ? এত লাইট মেক-আপে ক্যামেরায় মুখ বিশ্রী দেখাবে!' আমি শুধু ওঁকে বলেছিলাম, আমরা এই ধরনেরই কাজ করি। ছবিতে আপনাকে কোনও খারাপ কিছুই দেখাবে না, সেটা পরে দেখে নেবেন। তবু ওঁর ঠিক স্বস্তি হল না, সেটে এসে শট্-এর আগে মানিকদাকে বললেন, 'মানিকদা এত লাইটমেকআপে আমাকে কিন্তু খুব বিশ্রী লাগবে পর্দায়। এত লাইট মেক-আপে কি করে হবে?' মানিকদা ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অনন্ত, ওঁর মেক-আপ ঠিক আছে তো?'



নিমাই ঘোষ

• 'আগন্তুক' ছবির সেটে সত্যজিৎ রায়, উৎপল দত্ত ও আমি

মানিকদাকে বললাম, 'মানিকদা উত্তমকে যে মেক-আপটা করেছি এতে কিন্তু ওঁকে পুরোপুরি জাপানি মনে হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে সাজানো।' তখন মানিকদা বললেন, 'উত্তম তো জাপানি সাজছে—এই ব্যাপারটাই রয়েছে ছবিতে। ওতো অরিজিন্যাল জাপানি নয়। ও সেজেছে। তাতে তো নিখুঁত মুখটা আসবে কেন? তাতে কিছু খুঁত থাকবেই। আমার তো এটাই চাই।

এক বৎসর	২৬ সংখ্যার জন্য ২৬০ টাকার বদলে এখন দিতে হবে মাত্র ২১৭ টাকা
দুই বৎসর	৫২ সংখ্যার জন্য ৫২০ টাকার বদলে এখন দিতে হবে মাত্র ৪৩৪ টাকা
বিদেশের গ্রাহক	বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য ৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড



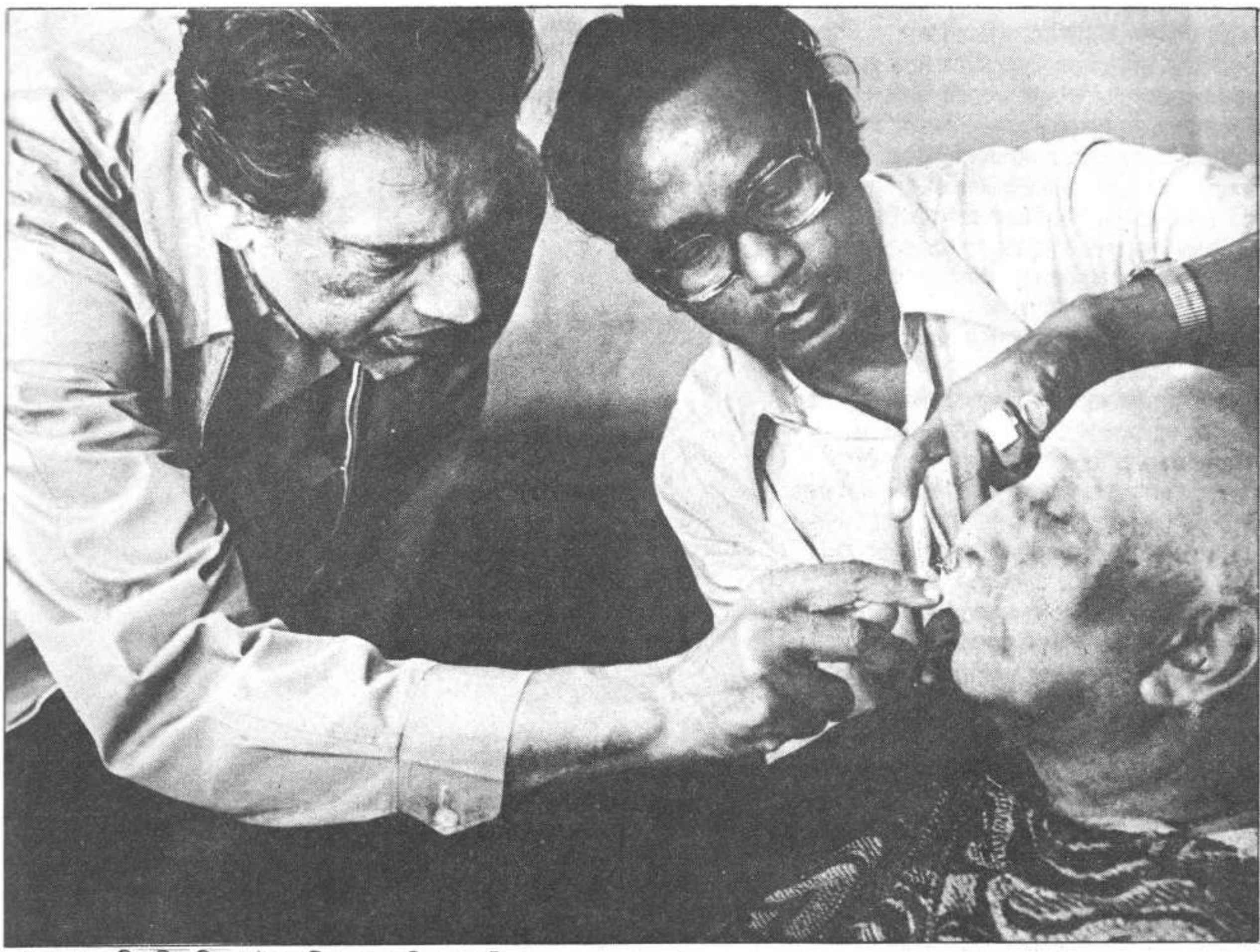
আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফ্‌ট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

ডাক মাশুল লাগবে না।

CLARION C-ABALD-1



• 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবির সেটে সত্যজিৎ রায়, ডেভিড ও আমি

চেয়েছিলেন। আমি জানিয়েছিলাম, পড়াশোনা করা থাকলেও এ দেশে কালার ফটোগ্রাফির জন্য কোনো মেক-আপ মেটিরিয়ালস নেই। যদি কালার ফটোগ্রাফিতে ছবি তুলতে হয়, তাহলে তার সরঞ্জাম আনতে হবে বিদেশ থেকে। তারপর আমরা সাদা-কালোর মেটিরিয়ালসেই কাজ করেছিলাম। এবং এখনও পর্যন্ত তাই করে থাকি। আর ক্যামেরার লেন্সের বিভিন্ন তারতম্যে প্রত্যেকটা শট্-এর প্রতিক্রিয়া বা রেজাল্ট খুঁটিয়ে বুঝে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন মানিকদা। এ ব্যাপারে নিজেও পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। আমাদেরও পড়াশোনা এবং ভি. ডি. ও বা বড় পর্দায় বিভিন্ন দেশের ভাল ভাল ছবি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যে কোনো ছবির ভাবনা মাথায় এলে তার চিত্রনাট্যে যেমন এই ঘটনার একাধিক শট্-এর ছবি এঁকে যেতেন তার পাশাপাশি তেমনি প্রত্যেকটা চরিত্রের একাধিক স্কেচ করতেন সেই চরিত্রের মেক-আপ বোঝাতে। আর সেই স্কেচের পাশাপাশি তার মেক-আপের বিস্তারিত বিবরণের নোট রাখতেন। তারপর ছিল আমাদের সঙ্গে আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর সবশেষে রায় দিতেন নিজের।

• 'সদ্‌গতি'-র সেটে সত্যজিৎ রায়, ওম পুরী ও আমি



ওঁর সঙ্গে বত্রিশ বছর ধরে টেলি-ফিল্ম 'সদ্‌গতি' আর ডকুমেন্টারিগুলো মিলিয়ে, প্রথম দিকের গোটা-তিন-চারেক ছবি ছাড়া প্রায় সব ছবিতেই কাজ করেছি। আর এই সুদীর্ঘ ও যৌথ কর্মজীবনে মানিকদা আমাদের অশেষ ঋণে ঋণী করে দিয়ে গেছেন। বিশেষ অভিজ্ঞতায় আমার মতো অনেক সহকর্মীই নিজেকে সমৃদ্ধতর করে ফেলেছেন ওঁর সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে।



মানিকদার তুলনা

আমি মানিকদার ইউনিটে সক্রিয় ভাবে 'জলসাঘর' ছবি থেকে থাকলেও বলতে পারি এক অর্থে 'পথের পাঁচালি' ছবি থেকেই আছি। এ ছবিতে কাজ না করলেও বসুশ্রী সিনেমা হলের লবিতে টাঙ্গানো কাঁচের ফ্রেমে যে ছবিগুলি ডিসপ্লে করা হয়েছিল, সেই কাজগুলি আমিই করি। ওই যেমন বৃষ্টির মধ্যে অপু-দুর্গা ছুটছে বা ওই ধরনের কাজগুলি। সেসব করা হয়েছিল পাটির ওপরে। মানিকদারই নির্দেশে। পাটি বা ম্যাট ব্যবহারের ব্যাপারটাও সম্পূর্ণই ওর নিজস্ব ছিল। এই পাটির ওপরের কাজ তখন খুব প্রশংসা পেয়েছিল।

: সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে সেই যোগাযোগটা কি ভাবে হয়েছিল আপনার ?

: আমি তখন আর্ট স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। তখন সেখানে বাঘা বাঘা শিল্পীরা আমাদের শিক্ষক। সোমনাথ হোড়, গোবর্ধন আশ, রাসবিহারী দত্ত, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কালি কিংকর ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। প্রিন্সিপাল অতুল বসু মশাই। রায় স্টুডিওর খগেন রায় একদিন কালিকিংকরবাবুকে (কাছেই অরোরা ফিলম কর্পোরেশনের কম্পাউন্ডের মধ্যে তাঁর স্টুডিও ছিল) ডেকে বললেন, 'পথের পাঁচালি' নামে একটা ছবি রিলিজ করবে, তার ছবি ডিসপ্লে করার জন্য তোমার একটি ছেলেকে দিতে পার ? স্কেচ ডিজাইন করাই আছে। ও শুধু ফিনিস করে দেবে। তবে পয়সাকড়ি প্রায় কিছুই দিতে পারবে না ডিস্ট্রিবিউটর। কাজটা একরকম বিনে পয়সায়ই করে দিতে হবে।

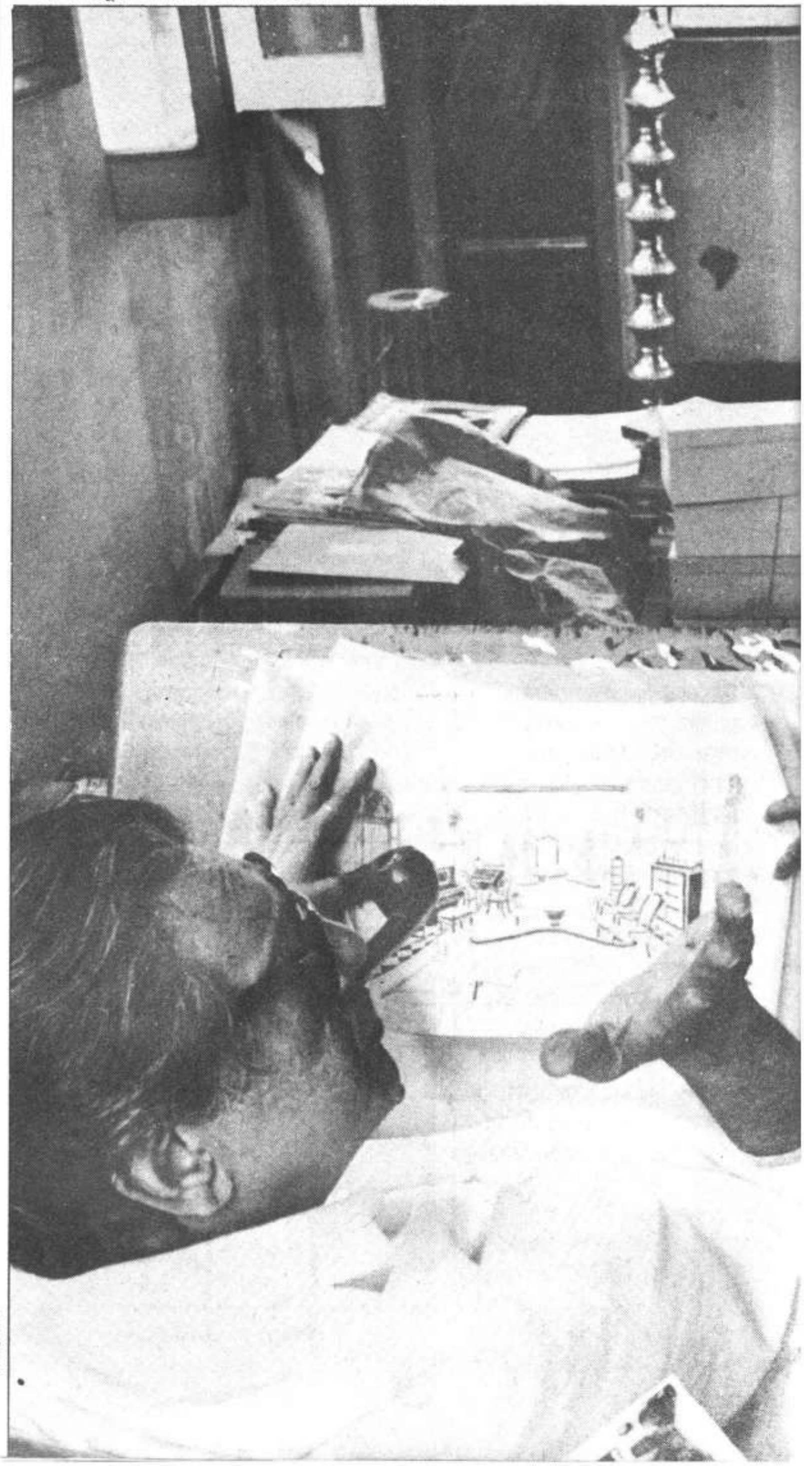
কালিকিংকরবাবুর নির্দেশে আমি তাঁর স্টুডিওয় গেলাম। সেখানেই আমার প্রথম পরিচয় মানিকদা এবং বংশীদা অর্থাৎ বংশীচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে। লে-আউট, স্কেচ ইত্যাদি সবই মানিকদার করা ছিল। আমি সেই নির্দেশ মতই কাজ করি। আমি তখন ফাইন আর্টস স্কালপচারিং এর ছাত্র। নতুন ধরনের একটা কাজ পেয়ে খুব ভালই লেগেছিল। এখনও মনে পড়ে, সেই স্টুডিওতে বসে লে আউট দেখে ছোট ছোট প্যানেলে সেই সব ডিসপ্লে করি আমি।

আর সেই থেকে যে কারণেই হোক মানিকদা এবং বংশীদার স্নেহচ্ছায়াতেই থেকে গেলাম আমি। আমি যখনকার কথা বলছি, তখনকার কথা ভাবলে আজও কত স্মৃতি মনে পড়ে।

: তখনকার ছবিতে, অর্থাৎ 'পথের পাঁচালি'র পর থেকে টাইটেলে সহকারী হিসেবে আপনার নাম থাকত ?

: না না, বংশীদার সঙ্গে আমার নাম ? আমি তখন ভাবতেই পারতাম না। সত্যি কথা বলতে কী, ভারত কেন, পৃথিবীতেই বংশীদার মত শিল্প নির্দেশক দুর্লভ। কিন্তু খুবই লজ্জা এবং দুঃখের বিষয়, বংশীদাকে সেই সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি। তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন চিরকাল। শোম্যানশিপটা আদৌ জানা ছিল না। একটা ক্ষেত্রে আমার ধারণা, বংশীদা ছিলেন মানিকদার পরিপূরক। সেই প্রথম থেকে এই জুটিকেই তো

• মানিকবাবু কেমন সেট চান নিজেই এঁকে দেখিয়ে দিতেন



নিমাই ঘোষ

মানিকদাই





সত্যজিৎ রায়ের বহু ছবির শিল্পনির্দেশক হিসাবে যিনি বিখ্যাত তাঁর নাম **অশোক বসু**। তিনি বলছেন সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার কথা।

আমি পাশাপাশি দেখে এসেছি। মানিকদার সব কাজেই বংশীদা ছিলেন অপরিহার্য। দুজনের প্রগার বন্ধুত্বও ছিল। বংশীদাই বোধহয় একমাত্র লোক যিনি মানিকদাকে নাম ধরে ডাকতেন।

: কিন্তু আমার ধারণা একটা ছবিতে বংশীবাবুর সহকারী হিসেবে আপনার নাম আছে।

'হ্যাঁ, গুপি-তে সহকারী হিসেবে আমার নাম ছিল। সেও ওই দুজনই জোর করে দিয়েছিলেন।'

: প্রথম দিকের ছবির শুটিং তো অরোরা স্টুডিওতেই হয়েছিল।

: হ্যাঁ, 'জলসাঘর' পর্যন্ত। তারপর থেকে 'দেবী' পর্যন্ত টেকনিশিয়ানে। তারপর নিউ থিয়েটার্স এক নম্বরে। যেখানে শেষ ছবি ওই গুপি। তাবপর থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে।

: সেটের প্রতি কি রকম নজর ছিল তাঁর? আপনাদের কাজ দেখতে স্টুডিওয় যেতেন কি?

: তেমন ঘটনা খুব কম। উনি কী চান, সেটা ডিজাইন করে, কখনও তার সঙ্গে মুখে বলে বুঝিয়ে দিতেন। আমরা সেটা বংশীদার গাইডেন্সে তৈরি করতাম। সেট তৈরি হলে শুটিং-এর আগের দিন বিকেলে ফ্লোরে এসে তৈরি করতাম। সেট তৈরি হলে শুটিং-এর আগের দিন বিকেলে ফ্লোরে এসে মানিকদা সেসব দেখে নিতেন। টুকটাক দরকারী সংশোধন করিয়ে নিতেন। তবে সেটা খুব প্রয়োজন হলেই।

: কোন কাজ যদি পছন্দ না হত?

: উনি কোনদিনই তা বলতেন না। তেমন প্রয়োজন হলে বড়জোর বলতেন, 'আমার মনে হয় —'। কখনই 'এটা ঠিক হয়নি, ওটা আমার মনঃপুত নয়' বলতেন না। বরং এমনও হয়েছে, টানা তিনদিনের শুটিং। সব প্রস্তুত। কিন্তু সেট রেডি হয়নি। মানিকদা হেসে বলতেন, 'খুব ঝামেলা হল। তিনদিনের কাজ দু'দিনে সারতে হবে। বড় কঠিন ব্যাপার। ঠিক আছে।' বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই তিনদিনের কাজ সত্যি সত্যি তিনি দু'দিনেই নাবিয়ে দিলেন। খুবই পরিশ্রমের ব্যাপার। কিন্তু মানিকদা যখন কাজে হাত দিতেন তখন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি হত না। কাজের সময় মানিকদা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তখন খারাপ শরীরও ভাল হয়ে যেত।

: ডিটেল কাজ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা?

: সেটা বোধহয় ফিলম লাইনে নজীরবিহীন। সেই তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'জলসাঘর'। অন্য ছবি আগে রিলিজ করলেও দ্বিতীয় তোলা ছবি 'জলসাঘর'ই। মূলত অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। এছাড়া অন্য কিছু ব্যাপারও ছিল) থেকেই দেখে এসেছি ঠিক জিনিষটি না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি কাউকেই ছাড়তেন না। ঠিক জিনিষটি করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়তেন।

: যেমন ধরুন 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবির ডিটেলের জন্য পোশাক ওয়াজেদ আলির পাশা খেলার ঘর, দরবার হল, সেই সময়কার পোশাক ও অলঙ্কার, নবাবের মাথার মুকুট থেকে তুচ্ছ জিনিষটি পর্যন্ত তাঁর অনুসন্ধিৎসায় ছিল। এমন

কী পরবর্তীকালে ওয়াজেদ আলিকে রাখা হয়েছিল যেখানে মোমিনপুরের সেই বাড়িতে পর্যন্ত আমাদের যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

'সদগতি'র স্পট দেখতে আমি মানিকদার সঙ্গে রায়পুরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের সঙ্গে 'সদগতি'র লেখক প্রেমচাঁদের পুত্র অমিত রায়ও ছিলেন। ঠিক কোথায়, কোন্ পটভূমিকায় ছবির গল্পের মানুষগুলি ছিল, তাই দেখাবার জন্যে তিনি আমাদের ছত্তিশগড়ে নিয়ে গেলেন। স্পটটা ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, চামারদের গ্রামটা ছিল দূরে। মানিকদা সেখানকার মানুষের পোষাক, তার রঙ, কাপড় পরার ঢঙ, ব্রাহ্মণ এবং চামারদের কী ধরনের ফতুয়া গায়ে থাকে, মেয়েদের অলঙ্কার, তার গড়ন, সব খুঁটিয়ে দেখলেন, তাই নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। এবং সেই অনুযায়ী সেখানকার বাজার থেকে অর্ডার দিয়ে সেসব তৈরিও করালেন। সেসব কেমন নিখুঁত হয়েছিল, ওম পুরী আর স্মিতা পাতিলের পোশাক দেখে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, ওখানকার ব্রাহ্মণদের আরাধ্য দেবতা রাবণও বাদ যায়নি। মানিকদা একটা দৃশ্যে তাকেও ব্যবহার করেছেন।

এ রকম ঘটনা কমবেশি সব ছবিতেই ঘটেছে। সেই সুবাদে ভারতের কত প্রান্তে যে বংশীদা, অনিলবাবু মানিকদার সঙ্গে ঘুরেছি, তার কোন হিসেবই নেই। রাজার বাড়ির ঘর, তার ডেকরেশন, দরজা, জানালা থেকে এমব্লেম পর্যন্ত খুটিনাটি ডিটেলের শুধু দেখা নয়, তার ছবি তুলেও আনতাম সেটের সুবিধার জন্য।

আবার অন্যদিকে 'জনঅরণ্য' ছবির জন্য আমরা ৪ নম্বর রেল ব্রিজের পাশের বিরাট বস্তিটা দেখতে গিয়েছিলাম। শুধু খুঁটিয়ে বস্তি বা ঘরের বাইরেটা দেখাই নয়, মানিকদা বস্তীবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, ঘরের অভ্যন্তর, সেই মানুষগুলির রুচি, ঘর সাজানো, ইত্যাদি দেখার জন্য ভেতরেও গেছেন।

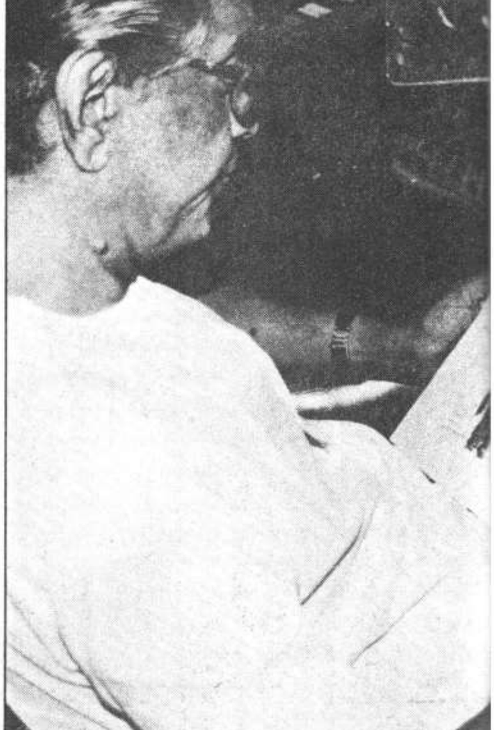
মানিকদার ডিটেলের কাজের মধ্যে একটা বড় অঙ্গ ছিল, গল্পের সময়, মানসিকতা ইত্যাদির দিকে প্রখর নজর। অর্থাৎ, যে সময়কার ঘটনা, তাকে তিনি সব দিক থেকেই সেলুলয়েডে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

মানিকদার ডিটেলের কাজের মধ্যে একটা বড় অঙ্গ ছিল, গল্পের সময়, মানসিকতা ইত্যাদির দিকে প্রখর নজর। অর্থাৎ যে সময়কার ঘটনা, তাকে তিনি সব দিক থেকেই সেলুলয়েডে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

তেমনি পটভূমি। যেমন 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে বারানসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের পরের ঘাটের কাছে ছিল দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিল্ডিং। একটা শটের স্পট হিসেবে তার নিচের অংশটা ভেবে নেওয়া হল। কিন্তু তাঁর পাশের দেওয়ালটার ওপরে রিঙ্কু সিল্ক হাউস লেখা। সেটাকে বাদ দেওয়া যায় না। তখন সেখানকার একটি ছবি নেওয়া হল। সেই ছবি অনুযায়ী সেট পড়ল। ওখানে টেক করা হয়েছিল শুধু একটাই দৃশ্য। গঙ্গার ওপর দিয়ে একটা নৌকো আসছে, আর ঘাটের টুকিটাকি কিছু। বাকিটা সবই ইনডোরে। দর্শক কি সেটা ধরতে পেরেছেন বা বুঝতে পেরেছেন ? কারুর ক্ষমতা নেই যে ওটা ধরতে



• 'দেবী'-র শুটিং-এ শর্মিলাকে চুড়ি পরিয়ে দিচ্ছেন বিজয়া রায়

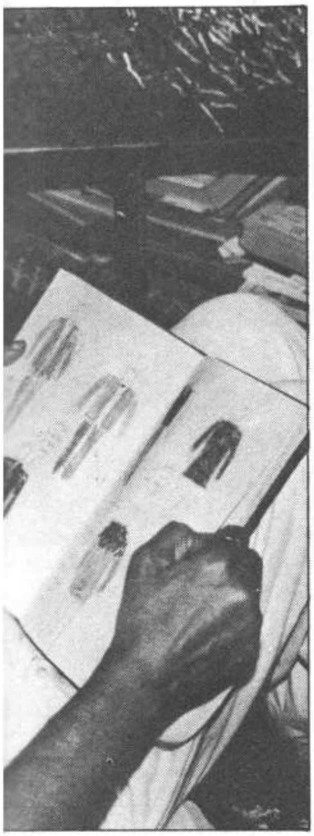


• সেটের মতন পাত্রপাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদও এঁকে রাখতেন





• 'গু-গা-বা-বা'-র গয়না পছন্দ করে দিচ্ছেন বিজয়া রায়, পাশে সত্যজিৎ ও শ্রীমান সন্দীপ



পারবে আউটডোর।

এরকম ঘটনা অজস্র। মানিকদার এই যে 'রিপ্রেজেন্টেশন' এবং আউটডোরের সঙ্গে ইনডোর মিশিয়ে দেওয়ার অভাবনীয় ক্ষমতা, বাংলা ছবির জগতে এর কোন তুলনা নেই।

এর জন্যে তিনি যেমন স্টাডি করতেন, তেমনি আমাদের সঙ্গে, আমি আর বংশীদার সঙ্গে সবসময় আলোচনাও করতেন। আউটডোরের সঙ্গে সঙ্গে ইনডোরের প্রাধান্য সবসময়ই দিতেন তিনি।

চরিত্র অনুযায়ী ঘর, তার পোষাক, গল্পের প্রয়োজনে যেমনটি বাড়ি প্রয়োজন। সেসবের পারফেকশন তো আছেই, প্রয়োজন হলে অনেক সময় আমরা যাকে বলি 'গ্রাউন্ড প্ল্যান' তাও করে দিয়েছেন তিনি সুবিধের জন্যে।

পারফেকশন-এর একটা ঘটনা বলি। সেট রেডি, সঙ্গে সব প্রস্তুতি। কিন্তু মানিকদা ফ্লোরে ঢুকেই একটা দরজা দেখিয়ে বললেন, ওটা একটু বাঁকা আছে। আমি বললাম, না ঠিক আছে। মিস্তিরিও ভাল করে দেখে-টেখে বললে, না স্যার ঠিকই আছে।

কিন্তু উনি মানবেন না। শেষ পর্যন্ত ফিতে ফেলে মাপতে কোয়ার্টার ইঞ্চির মত ফারাক ধরা পড়ল। ফলে সেট ভেঙ্গে আবার সেট তৈরি করা হল। অনেক সময় আবার এমন হয়েছে, শেষ সময় তাঁর ডিসিসন চেঞ্জ হয়েছে। তখন কুইক স্কেচ করে নতুন সেট তৈরি করা হয়েছে। আর এই সবই হয়েছে আনন্দের মধ্য দিয়ে। তখন ওঁর খুশিটাও দেখার মত ছিল।

তবে একটা ব্যাপার ছিল, উনি যেটা ভাবতেন আমরা সেটা মুহূর্তে বুঝে নিতাম।

একটা কথা জানিয়ে রাখি, মানিকদাই প্রথম ছবির সেটের প্রয়োজনে সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং প্লাস্টার ব্যবহার চালু করেন। প্লাস্টারিং-এর কত যে ঘটনা আছে। এমন কি যে রকম দেওয়ালটি চাই, সরাসরি সেই দেওয়াল থেকে ডাইস তুলে সেই রকম দেওয়াল করে দিয়েছি মানিকদার নির্দেশ বা ইচ্ছে মত। প্লাস্টারের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়েছিল 'সতরঞ্জ কে খিলাড়ী'তে।

আর 'প্রতিদ্বন্দী' ছবির জন্য ১২০টা কঙ্কাল করে দেওয়া তো আমার জীবনের এক অক্ষয় স্মৃতি। তাও মাত্র এক মাসের মধ্যে। সেগুলো যেন অরিজিনালকেও হার মানিয়েছিল। মানিকদা কী খুশি!

: সত্যজিৎবাবু কি সব সময়ই স্কেচ করে তিনি কি চান বুঝিয়ে দিতেন?

: পরের দিকে অতিরিক্ত ব্যস্ততা এবং খাটুনির জন্য সবটা পারতেন না। কিন্তু আগে সবটাই তিনি ডিটেলসে করে দিতেন। তবে একথা মুক্ত কণ্ঠে বলব, আমি 'লা নুই বেঙ্গলী'-তে তার প্রোডাকশন ম্যানেজার বিশ্ববিখ্যাত আলেকজেন্ডার টার্নার এবং 'সিটি অফ জয়' এর প্রোডাকশন ডিজাইনার রয় ওয়াকার-এর সঙ্গেও শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছি। তাঁরা খুবই বড় মাপের সন্দেহ নেই। কিন্তু মানিকদার তুলনা মানিকদাই।

আধুনিক

সত্যজিতের দুরন্ত প্রতিভায় প্রভাবিত হয়েছে এ দেশের একাধিক শিল্প মাধ্যম—এমন কি বাংলা নাটকও। বিশিষ্ট নাট্যকর্মি **অশোক মুখোপাধ্যায়** বলছেন সেই প্রভাবের কথা।



• 'বেড়া' নাটকের একটি দৃশ্য

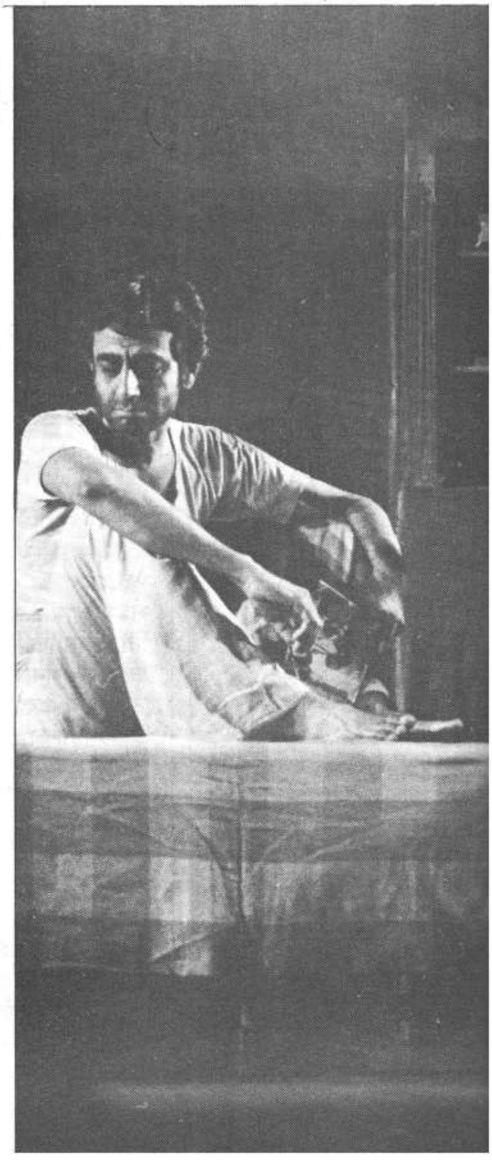
আধুনিক বাংলা নাটকের নির্মাণ ও নন্দনের ওপর তিনজন নাট্যপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব জোরালো ভাবে কাজ করেছে। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র দীর্ঘদিন হল নাট্যসৃজনকর্ম থেকে সরে আছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পরাক্রমশালী প্রতিভা থেকে আমরা হঠাৎ বঞ্চিত হয়েছি। একমাত্র উৎপল দত্ত এখনও সক্রিয়, যদিচ গত বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলি তাঁর নিজেরই সৃষ্ট সমুচ্চ মানকে আর স্পর্শ করতে পারছে না। তবু, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে এঁরা তিনজন দাপটে রাজত্ব করেছেন বাংলা থিয়েটারে। একটু-একটু করে গড়ে দিয়েছেন একালের বাংলা নাট্যের ইমারত। এঁদের হাতে তৈরি নাট্যকর্মীরাই গত দশ-পনের বছর ধরে সজীব ও অর্থময় রেখেছে থিয়েটারের ঐতিহ্যকে।

সমকালের বাংলা নাটকের ওপর এই তিনজন বড়মাপের নাট্যপ্রতিভার প্রভাব অনস্বীকার্য। এ নিয়ে কোনো তর্কেরও অবকাশ দেখি না। কিন্তু এই তিনজনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের আড়ালে আরেকজন মহাশক্তিধর শিল্পীপুরুষ বাংলা নাটক ও নাট্যকর্মীদের ওপর বিশাল ছাপ ফেলেছেন। তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্র নাটক নয়। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি নানা শিল্পরূপের ওপর তাঁর অনন্যসাধারণ দখল এখন পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি আধুনিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর অপ্রত্যক্ষ অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করা দরকার। হ্যাঁ, আমি ভারতবর্ষে নতুন শিল্পযুগের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের কথাই বলছি।

'নতুন শিল্পযুগের স্রষ্টা' এই শব্দত্রয়ীর প্রতি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মনে করি, গত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর



• 'বেলা অবেলার গল্প' নাটকের একটি দৃশ্য





বাংলা নাটক ও সত্যজিৎ রায়

ধরে সত্যজিৎ কেবল যে একের পর এক অসাধারণ চলচ্চিত্রই তৈরি করেছেন তাই নয়, শুধু যে অসামান্য সাহিত্য রচনা করেছেন তাই নয়, এই সময়ের মধ্যে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন আমাদের সামগ্রিক শিল্পবোধকে। এমনকি তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে ছাপ ফেলেছেন আমাদের জীবনবোধের ওপরেও। সমকালের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিমাত্রই আলোড়িত হয়েছেন



সত্যজিৎ দ্বারা। এমম্বিধ ঘটনা, রবীন্দ্রযুগের পরে, বাঙালি জীবনে এই বোধহয় দ্বিতীয়বার ঘটল।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সত্যজিতের প্রভাব অবশ্য শুধু ওইরকম বোধ বা চেতনার অনতিস্পষ্ট ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা নয়। আরও স্পষ্ট এলাকাতেও লক্ষ্য করা গেছে বা যাচ্ছে তাঁর প্রভাব। সেই আলোচনায় ঢোকার আগে, একটি ঘটনা মনে পড়ল, সেইটা বলে নিই। সালটা আমার ঠিক মনে নেই। তবে ষাটের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে হবে। তখন আমি নান্দীকারে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখছি নাটক বিষয়ে অনেক কিছু, যা-কিছু পরবর্তীকালে আমার মত সামান্য নাট্যকর্মীকে চলার দিশা জুগিয়েছে। সেই সময় একদিন সকালে কী কাজে ওঁর বাড়িতে গিয়েছি। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকের গলিতে একটি বাড়ির দোতলায় একঘরের ভাড়াটে তখন অজিতেশ। ঘরে ঢুকে দেখি, ওঁর স্নান হয়ে গেছে। পাট-ভাঙা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হাঁটু মুড়ে মাদুরে বসে দীর্ঘদেহী অজিতেশ কী একটা বই পড়ছেন। আমি একটু অবাক হলাম। কারণ অন্য দিন ওই রকম সময়ে গিয়ে দেখেছি উনি স্কুলের চাকরি করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আজ অন্যরকম ব্যাপার! 'কেন' জিগ্যেস করাতে বললেন, 'বাঃ! আজকে একটা দারুণ দিন না! আজকে সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি রিলিজ করছে। পরশু মিনার থেকে টিকিট কাটিয়ে রেখেছি। ম্যাটিনি-র। তোমাদের লিলিদি এসে পড়বেন একটু পরেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যাব।' আমি বললাম, 'ম্যাটিনি মানে দুপুরে—এই রোদ্দুরে যাবেন? ইভনিং-এ কাটলেও পারতেন।' বললেন, 'আমার বাড়ি থেকে মিনার তো দু মিনিট। তা ছাড়া, ইভনিং মানে তো আরো তিন ঘণ্টা ওয়েট করা! সকালে উঠেই চান করে নিয়েছি। পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছি। একটা ভালো বই পড়ছি। মনটা ভালো রাখছি। পরিষ্কার রাখছি। বুঝছ তো, সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবির প্রথম শো দেখতে যাব! একটা ঘটনা তো! তাই তৈরি থাকছি।'

দুঃখের বিষয়, বছরটা এবং কী ছবি আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। কিন্তু ঘটনাটায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। তখনো অবশ্য অজিতেশ বিখ্যাত হননি। তবু উনি যে অ-সাধারণ এটা তখনও ওঁকে দেখলে, ওঁর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যেত। তা উনি ওইরকম করে সত্যজিতের ছবির জন্য অপেক্ষা করছেন, শুদ্ধ দেহ-মনে, যেন অপেক্ষা করছেন কোন অলৌকিক উন্মোচনের জন্য, এই ঘটনাটা আমার মনে গভীর দাগ ফেলেছিল। আমার বয়স তখন কুড়ি-একুশ হবে। এই অভিজ্ঞতাটা পরে আমার কাছে একটা প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে গেছে। একটা দীর্ঘ সময় ধরে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে গোটা ষাটের দশক জুড়ে আমরা যারা কৈশোর থেকে যৌবন থেকে পরিণত বয়সের দিকে চলে গেছি, আমরা সবাই তখন সত্যজিতের এক-একটি নতুন ছবির জন্য ওই ভাবে অপেক্ষা করতাম। দুরু দুরু বুকে। অধীর আগ্রহে। প্রবল রোমাঞ্চ নিয়ে। এক-একটা ছবি তখন যেন এক-একটা বিস্ফোরণ। প্রতিবারেই বেড়ে যাচ্ছে শিল্পের দিগন্ত। ভেঙে পড়ছে পুরনো ধারণা। তৈরি হচ্ছে ইতিহাস। আমাদের চোখের সামনে। বছরের পর বছর ধরে। এই উত্তেজনার কথা মনে পড়লে আজও উত্তেজনা হয়। আমার ধারণা, এখন যাঁরা শিল্পের নানা বিভাগের যশস্বী মানুষ এবং যাঁদের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে, তাঁরা প্রায় সবাই এই উত্তেজনার আগুন পুইয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই বছরগুলিতে তৈরি সত্যজিতের অমর চলচ্চিত্রাবলী তাঁদের বেঁচে থাকা ও শিল্প তৈরির ওপরেও ছাপ ফেলে গেছে। এই পটভূমিটুকু মনে রাখলে, বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক কীভাবে বাংলা নাটকের ওপর এসে পড়েছিল সত্যজিতের দূরপ্রসারী ছায়া। বিশেষ করে সত্তরের দশকে এই প্রভাব লক্ষ্ণীয় হয়ে উঠতে লাগল। কেউ, কোনো দর্শক সমালোচক

বা নাট্যকর্মী, একে সত্যজিতের প্রভাব বলে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু এখন পিছন ফিরে তাকালে বোঝা যায়, তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বোধ ও ভঙ্গী কেমনভাবে আধুনিক বাংলা নাটকের চরিত্রে যোগ করে দিয়েছিল বিশেষ মাত্রা। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রযোজনা উল্লেখ করে কথাটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করি।

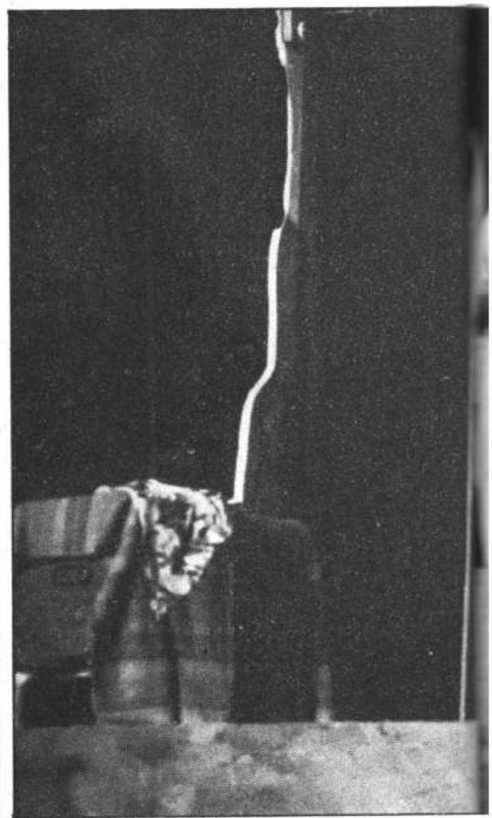
যেমন ধরা যাক, সত্তরের দশকের শেষ দিকে প্রযোজিত চেতনা-র 'জগন্নাথ' নাটকটির কথা। এটি চমৎকারভাবে তৈরি একটি নাট্যপ্রযোজনা যার প্রথম গুণ হচ্ছে মেদহীনতা। লঘুভার দৃশ্যগুলি একে অন্যের দিকে চলে যাচ্ছে এক মসৃণ

> কিন্তু আমাদের গভীরতর কৃতজ্ঞতা অন্য জায়গায়। আধুনিক বাংলা নাটককে সত্যিকারের অর্থে 'আধুনিক' হয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি তাঁর নিজের অজান্তে। যেভাবে তিনি আমূল নাড়া দিয়ে পাল্টে দিয়েছেন বাঙালির মনের জগতকে, সেইভাবেই বাংলা নাটকের বিচিত্র-ব্যাপক ছবিতে এসে পড়েছে তাঁর প্রতিভার কৌণিক আলো। আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চে সত্যজিৎ অপরিচিত আগন্তুক নন।

ছন্দোময়তায়। আলো প্রায়শই ক্যামেরার মত নির্বাচন করে নিচ্ছে মোক্ষম মুহূর্তগুলি। 'সিনেম্যাটিক' এই বিশেষণ বহু দর্শকের ঠোঁটের আগায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসতে দেখেছি 'জগন্নাথ' দেখার পর। তার মানে এই নয় যে 'জগন্নাথ'-এর নাট্যকার-নির্দেশক পরিকল্পিত ভাবে চলচ্চিত্রের গতিভঙ্গী বা ধরন আনতে চেয়েছেন তাঁর প্রযোজনায়। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, যখন উনি মঞ্চের পরিচিত প্রযোজনার ছক ভেঙে নতুন রকম কোনো মডেল খুঁজছেন, তখন তাঁর অজান্তেই তাঁর প্রয়োগভাবনাকে প্রভাবিত করছে চলচ্চিত্রের ধরন। মজার কথা হচ্ছে, বাংলা চলচ্চিত্র একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল নাটুকে। সত্যজিৎ তার নাটুকেপনা ঘুচিয়ে তাকে করে তুললেন সঠিক অর্থে চলচ্চিত্র। আবার তাঁর সৃষ্টির দশ-পনের বছরের দুর্মর প্রভাবে দেখা গেল : নাটকে চলচ্চিত্রের ছায়া!

সত্তরের দশকের আরেকটি প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা করলে আমার আরেকটু সুবিধা হয় : শূদ্রক গোষ্ঠীর 'অমিতাক্ষর'। একটি সাধারণ মানুষের অসাধারণ সঙ্কটের চিত্রণ রয়েছে এই প্রযোজনায়, অথচ আবেগ এখানে সর্বদাই অন্তর্লীন, নিয়ন্ত্রিত। আমার মনে হয়, বাঙালির স্বাভাবিক আবেগময়তাকে 'নাটুকেপনা' বলে অনেক সময় ঠাট্টা করা হয়। আবেগের প্রকাশ ভালো না খারাপ, এ নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। তবে আধুনিক নগরজীবনের নানা বিচিত্র চাপ-প্রতিচাপে শহুরে মানুষ ভুলে যায় আবেগের অনাবিল উৎসার। অনেক সময় আবেগের কাঁচা প্রকাশ দেখলে সে তাকে গ্রাম্যতা বলে এড়িয়ে চলে। এই করতে করতে আবেগ তার চামড়ার তলায় চলে যায়, বাইরে আসতে চায় না। ওইরকম নাগরিক মানুষের চাপা আবেগের ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ আমরা চমৎকার ভাবে পাই সত্যজিতের ছবিতে। বস্তুত, নিরুচ্চার আবেগের ব্যঞ্জনাময় কাব্য তাঁর বহু নাগরিক চলচ্চিত্রকে বিচিত্র সুষমা দিয়েছে। এই অন্তর্লীন আবেগের নাটকীয় প্রয়োগেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে 'অমিতাক্ষর'। ঘটনার থেকেও বড় প্রতিক্রিয়া, তার থেকেও বড় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। জগৎ-জীবন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং সঠিক পটভূমিতে লগ্ন মানব-মানবীর সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টাই যে ভালো শিল্পের কাজ, এই রকম ভাবনা শূদ্রক-এর মূল্যবান প্রযোজনাটির পিছনে কাজ করেছিল। এই ভাবনার জন্য আমরা নাট্যকর্মীরা সত্যজিতের কাছে গভীরভাবে ঋণী।

কোন্ ভাবনা ? ওই যে বলা হল, ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিদান নয়, অন্ধ রাজনৈতিকতা নয়, বরং চলমান পরিবর্তমান সময়ের পটে মানুষের জটিল মুখচ্ছবিকে দেখা, বোঝা ও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসে ব্রতী হবার প্রত্যয়, সাহস ও প্রকরণ আমাদের সামনে রেখেছেন সত্যজিৎ। তার মানে এই নয় যে পটভূমিচ্যুত কোনো অলীক মানুষের কল্পকাহিনী বলতে হবে। কিন্তু তার মানে এও নয় যে, কোনো প্রাক্-নির্দিষ্ট তত্ত্বের দম-বন্ধ-করা ল্যাবোরেটরিতে এনে ফেলতে হবে সব অভিজ্ঞতাকে, আর



● 'দায়বদ্ধ' : নাটকের একটি দৃশ্য

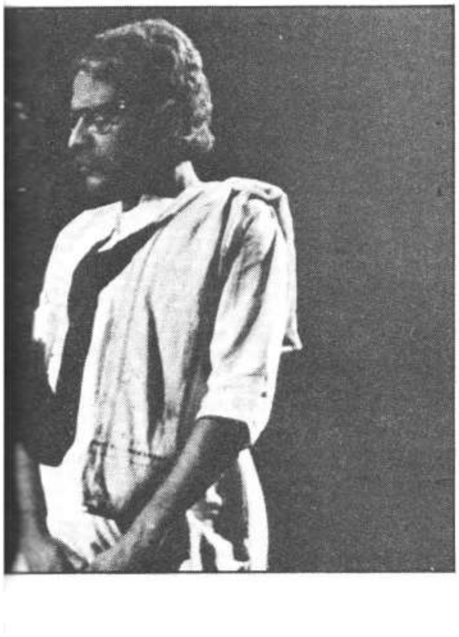
চেষ্টা করতে হবে প্রমাণ করার যে কত অভ্রান্ত ওই তত্ত্ব। তা নয়। খোলা মনে সত্যের মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। সেই সত্য আমার পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা-খারাপ লাগার বাইরের একটা ব্যাপার। তাকে সেভাবেই দেখতে হবে। যদি সত্য

● 'জগন্নাথ' : নাটকের একটি দৃশ্য





তেতো হয়, আমার পছন্দ না হয়, আমার পক্ষে সুবিধাজনক না হয়, তবু তাকে বুঝতে হবে, তার চিত্রণ থেকে পিছু হটলে চলবে না। এই সততা অপু থেকে পিকু পর্যন্ত সত্যজিতের অমর চরিত্রগুলিকে বিশিষ্ট করেছে। সত্যের এই অনুসন্ধান সত্যজিৎ করেছেন তাঁর সমস্ত জীবন



ধরে। কোথায় খুঁজেছেন তাকে ? আমার ধারণা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বাঁকে-বাঁকে। আধুনিকতম বাংলা নাটক আজ যদি সেই খোঁজার তাগিদ অনুভব করে তবে তার পিছনে সত্যজিতের মহান অনুসন্ধান নিশ্চয়ই প্রেরণা হিসাবে রয়েছে।

আশির দশকের দ্বিতীয় অর্ধে এসে বাংলা নাটকে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যই উপরের কথাগুলি বলা। কোনো বিশেষ সামাজিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বদলে, মানুষের আবেগ ও অনুভবের সত্যের নাট্যায়ন ঘটাতে এক ধরনের আগ্রহের পুনর্জাগরণ ঘটেছে। 'পুনর্জাগরণ' বলছি কারণ এই প্রয়াসের চমৎকার ও শক্তিশালী সব দৃষ্টান্ত শম্ভু মিত্র বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত সব সৃষ্টির মধ্যে জোরালো ভাবে ছিল। কিন্তু এখন তা অনেকের অনেক ভালো প্রযোজনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ছিয়াশিতে প্রযোজিত 'বেলাঅবেলার গল্প', সাতাশি-তে 'পাখি' ও 'নীলাম নীলাম', অষ্টআশি-তে 'শেষ সাক্ষাৎকার', উননব্বই-এ 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' এই নতুন প্রবণতার সক্ষম উদাহরণ। এদের প্রতিটির নির্মাণের মধ্যে আছে মেদহীনতা, মসৃণ ছন্দ, চলচ্চিত্রীয় প্রবহমানতা। এদের অন্তঃকরণে রয়েছে মানবসম্পর্কের সৎ চিত্রায়ণের সঙ্কল্প, আবেগের ব্যঞ্জনাঋদ্ধ প্রকাশ, পটভূমি ও ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মুক্তমনা বিশ্লেষণ। দৃষ্টান্তচয়ন আশির দশকেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছি। তবু, না বলে পারছি না, নব্বই-এর দশকেও দেখছি এই প্রয়াসের ধারা অব্যাহত। 'উত্তরাধিকার' বা 'শোভাযাত্রা' কিংবা 'বেড়া' কিংবা 'দায়বদ্ধ' বা 'হোলি'-র মধ্যে ঐ একই ঝোঁক সক্রিয় রয়েছে, বা মনে হয় আরো স্পষ্ট ও জোরালো হয়েছে।

এই সব কিছুর জন্য দায়ী সত্যজিৎ ও তাঁর চলচ্চিত্র, এমন সরলীকৃত কোনো বোকা-বোকা কথা আমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছি না। নিশ্চয়ই সাম্প্রতিকতম বাংলা নাটকের সাম্প্রতিকতম ঝোঁকগুলির পিছনে সমাজগত, রাজনীতিগত এবং নাট্যশিল্পগত নানা কারণ কাজ করছে। কিন্তু ভাবনা ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীরা যে সত্যজিতের মহান ঘরানা থেকে আহরণ করেছেন প্রেরণা, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যজিৎ রায় বাংলা নাটককে ভালবাসেন। ছোটো বড় বহু দলের বহু নাটক তিনি দেখতে গেছেন। তাঁর সত্যিই বহুমূল্য সময় থেকে অনেকটা দিয়েছেন ব্যাকস্টেজে বা গ্রীনরুমে নাটকের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপে। বাড়িটিতে ডেকে পাঠিয়ে উৎসাহ ও সম্মান দিয়েছেন এমন অনেক নাট্যকর্মীকে যাঁদের, নাটক দেখার আগে, আদৌ কোনোদিন চিনতেন না। তাঁর ছবির কাজে, ছোটো-বড় নানা ভূমিকায়, ব্যবহার করেছেন নাটকের জগতের বহু খ্যাত-অখ্যাত শিল্পীকে। নাট্যদলের পুস্তিকায় লেখা দিয়েছেন। নাটকের দলের পরিচয়-লিপি ও স্মারক-চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। তাঁর বহু স্মরণীয় গল্পে থিয়েটারের অভিনেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই সব কিছুর জন্য আমরা নাট্যকর্মীরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁকে কাছের মানুষ হিসেবে পেয়ে ধন্য বোধ করেছি।

কিন্তু আমাদের গভীরতর কৃতজ্ঞতা অন্য জায়গায়। আধুনিক বাংলা নাটককে সত্যিকারের অর্থে 'আধুনিক' হয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি তাঁর নিজের অজান্তে। যেভাবে তিনি আমূল নাড়া দিয়ে পাল্টে দিয়েছেন বাঙালির মনের জগতকে, সেইভাবেই বাংলা নাটকের বিচিত্র-ব্যাপক ছবিতে এসে পড়েছে তাঁর প্রতিভার কৌণিক আলো। আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চে সত্যজিৎ অপরিচিত আগন্তুক নন। বরং এক গভীরগামী প্রভাব।

ছবিগুলি তুলেছেন নিমাই ঘোষ



সত্যজিৎ :

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের আত্মপ্রকাশের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিচালক হিসাবে যাঁরা দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন এবং শিল্পী ও লেখক হিসাবে যাঁরা কাছ থেকে সত্যজিৎ রায়কে দেখেছেন তাঁদের কয়েকজন বলছেন সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে।



আমি সহকারী হতে চেয়েছিলাম : হৃষীকেশ মুখার্জি

'অস্কার' প্রাপ্তিতে সত্যজিৎ রায় কতখানি সম্মানিত হয়েছেন জানি না, আমার তো মনে হয় 'অস্কার' যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরাই সত্যজিৎবাবুকে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত হলেন। সারা পৃথিবীতে এরকম বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ ক'জন এসেছেন ? এদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এরকম একজন গুণীজনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি, এটা ভেবে আমি গর্বিত, ধন্য। আমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের যোগাযোগ বহুদিন আগে থেকে। তখন তিনি একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করেন 'পথের পাঁচালি' তৈরি করবেন—স্বপ্ন দেখেন। দেখতে দেখতে একদিন 'পথের পাঁচালি' তৈরি হয়ে গেল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ঘটনাটি ঘটে গেল। ছবিটা যখন কলকাতায় রিলিজ করল তখনই আমি দেখি। আমার পরিষ্কার মনে আছে ছবিটা দেখার পর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন দেখলেন ? আমি বললাম, প্রচন্ড গরমে ঠান্ডা জলে স্নান করলে মানুষ যে তৃপ্তি পায়, তাই পেলাম আমি ছবিটি দেখে। 'পথের পাঁচালি' বিদেশে হৈ চৈ তোলার আগে দেশেও ছবিটি নিয়ে অনেকে বেশ সরব হয়ে উঠেছিলেন। নিন্দুকরাও সারা পৃথিবীতে সব সময় কিছু না কিছু বলার জন্য মুখিয়ে থাকে। 'পথের পাঁচালি' দেখার পর এরকম কিছু নিন্দুক যখন ছবিটির বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন আমি তাঁদের মুখগুলি ভোঁতা করে দেবার তাগিদে বলেছিলাম, এই ছবিটির বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলেন তাঁরা হয় বোকা, সিনেমা বোঝেন না, না হলে তাঁরা পরশ্রীকাতর, কারুর ভাল সহ্য করতে পারেন না, দুর্নীতি পরায়ণ—তাঁদের নীতি বলেও হয়ত কিছু নেই।

'পথের পাঁচালি', তখন আমার কাছে সে তো এক আশ্চর্য ছবি। এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা, আমার মতো অনেকের, আমরা যাঁরা ছবি তৈরি করার কথা ভাবছি বা ভাবি সেসময়। আমি বলবো ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের সবচাইতে বড় অবদান 'পথের পাঁচালি'। এই আমরা প্রথম বুঝলাম, এদেশের চিত্র রসিকরা বুঝলেন, ছবিটা আমাদের বুঝিয়ে দিল সিনেমা কী ! 'পথের পাঁচালি-র আগে কোনও ভারতীয় ছবিতে আমরা কি সিনেমার মাপে অভিনয় দেখেছি ? 'যার শেকড় নেমেছে...' কাঁপা কাঁপা গলায় সংলাপ, যাত্রা বা থিয়েটারে যেমন বলা হ'ত—তাই ছিল সিনেমাতেও। 'পথের পাঁচালি' একেবারে খোলনলচে বদলে দিল। এদেশের সিনেমার ধারাটাই বদলে দিল। স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, যেভাবে আমরা বাস্তবে বলি, তার চল হল সিনেমায়। দুঃখ পাওয়া, খুশী হওয়া—সব কিছু বাস্তবে যেমন ঘটে, তেমনি। তাছাড়া আবহসঙ্গীত এবং

● সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে হৃষীকেশ মুখার্জি ও সত্যজিৎ রায়



গানের ব্যবহারেও ভারতীয় ছবিতে যুগান্তর এনে দিয়েছেন সত্যজিৎবাবু। সব মিলিয়ে এরকম বড় মাপের চলচ্চিত্রকার যে কোনও দেশে কালে ভদ্রে আসেন, যাঁর ছোঁয়ায় সব কিছু সোনা হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের কোন্ ছবিটা ছেড়ে কোন্ ছবিটার কথা বলি ? তবু আমার 'অপুত্রয়ী' বাদ দিলে সবচাইতে ভাল লাগে 'চারুলতা'। সম্প্রতি 'শাখা প্রশাখা' দেখে আমি মুগ্ধ। যদিও আজকাল অনেকে বলছেন তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলিতে তাঁকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবতে আমার অবাকই লাগে 'শাখা প্রশাখা'-র মতো ছবি তাঁদের ভাল লাগছে না ? তাহলে কার ছবি ? এই মুহূর্তে কেউ যদি ভারতের প্রথম দশজন চিত্র পরিচালকের নাম বলতে বলেন আমি কী বলবো জানেন, এক থেকে নয়—সত্যজিৎ রায়। নয় পর্যন্ত কেউ নেই। দশ নম্বরে যাকে খুশি বসিয়ে দিন।

পুনশ্চ : জীবনে একটা দুঃখ রয়ে গেল আমি সত্যজিৎ রায়ের সহকারি হতে পারলাম না। একসময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমাকে একটা সুযোগ দিন। ছবি করিয়ে হিসাবে সেসময় আমার একটু নাম ডাক হয়েছে। শুনে তিনি হেসেছিলেন। সত্যিই আমি তাঁর সহকারি হতে চেয়েছিলাম !

সমকালের চোখে



সত্যজিৎ ও অপরাজিত : মৃণাল সেন

এই তো সেদিনও কতো কথা বললেন। পুরনো কথা, নতুন কথা—কতো কি ? টেলিভিশনে, শর্মিলার সঙ্গে। সেখানেও নানা কথার ভিড়ে 'অপরাজিত'র কথাও তুললেন। নিজেই তুললেন কথাটা, কিন্তু খুব একটা প্রাণ পেলাম না যেন ওই কথায়। অথচ আমি উচ্ছ্বসিত। ওঁর সারা জীবনের শিল্পকর্মের ভেতর থেকে ওই ছবিটিকেই আমি বারবার তুলে ধরতে চাই, বলতে চাই, বলে থাকি। বলি, ভাবি, অনেক কথা। অনেক অনেক কথা। ছবির শুরুতেই 'পথেরপাঁচালি'র অতি পরিচিত জগৎটাকে যেন অনেক যোজন পেছনে ফেলে অজানা অনাত্মীয় এক পৃথিবীতে প্রবেশ করার ভয় আর বিস্ময়। ভয় আর বিস্ময় যেন চলমান রেলগাড়ি আর শব্দের ঝংকার অসামান্য স্পষ্টতা নিয়ে শরীরী হয়ে ওঠে ছবির পর্দায়। তারপর, একটু একটু করে কঠিন বাস্তব কঠিনতর হয়েওঠে। তারই মধ্যে টুকরো টুকরো ছবির মধ্য দিয়ে অপুর অপূর্ব কাশী-দর্শন, কাশীর অলি গলি মন্দির ঘাট, মায় বাঁদরবাহিনীর কীর্তিকলাপ বাঁদরামী আর দৌরাত্ম্য, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় গঙ্গার ঘাটে অচেনা পালোয়ানের শরীরী কসরৎ, গঙ্গারঘাটে নানা কিছুর সঙ্গে বাঙালী বিধবাদের নিয়মিত সমারোহ, আরো কত কি ! তারই মধ্যে এক রাত্রে, রাত্রিশেষে, হরিহরের মৃত্যু।...একদিন অপারগ সর্বজয়ার প্রাত্যহিক দুঃখদৈন্যের চাপে কিশোর অপুর হাত ধরে চলে আসা মনসাপোতায়। বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যাওয়া কিশোর অপুর ধীরে ধীরে যৌবনে পা দেওয়া, বাইরের বড় জগৎটা চিনতে শুরু করা।

এমনি করে আরো কত শত মনে পড়ে, বলি, বলতে ইচ্ছে করে। মা আর ছেলের আন্তঃসম্পর্ক। ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বদলাতে থাকে সে-সম্পর্ক, দৈনন্দিনতার নানা টানাপোড়েনে সে-সম্পর্ক কেমন করে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বিবর্তনের যাত্রাপথে কত উত্থান-পতন, কত জটিলতা, কত জাগতিক নির্দয় অমোঘ সব নিয়ম। কিন্তু

সবই যেন এ-যুগে—আমার আপনার বর্তমানের—অঙ্গ। এবং কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি চরিত্রই যেন এগিয়ে যায় নির্মম নিয়তির দিকে। যে-নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত নয়, যে-নিয়তি দৈব নয়, যা তৈরি হয় সময়ের নিজস্ব নিয়মে। ধ্বংস হয়, আবার জন্ম নেয়। আজও যেমন হয়ে চলেছে।

শেষ দৃশ্যে অপু তার গ্রামে ফিরে আসে। চারিদিকে ধ্বংসের হাওয়ায় অপু বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সব ঝড় শান্তভাবে মেনে নেয়। মায়ের মৃত্যুর খবর শোনে। বাইরের বারান্দায় বৃদ্ধ আত্মীয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে। তারপর বিলীয়মান অতীতকে মুছে নতুন এক জগতের দিকে পা বাড়ায়। পেছনে পড়ে থাকে আকৈশোর শৈশব। এরপর যে-লড়াই তা আরো কঠিন। আপাত

বললেন : একটু বসুন না, আমি খেয়ে আসছি। খাবো আর আসবো। আমি অপেক্ষা করলাম। অনেক কথা বলবার আছে আমার, বলার জন্যেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ফিরে এলেন, মা-ও এলেন একটু পরে। একটু আলগা হয়ে বসলেন। অনেক কথা বললাম, অনেক কথা, উচ্ছ্বাসে ভরাট নানা কথা। চব্বিশ ঘন্টাও হয়নি, দেখেছি। তাই নির্মল উচ্ছ্বাস ছাড়া অন্য কিছু মুখে আসেনি সেদিন। সব শেষে মনে পড়ে, বলেছিলাম, সন্দেহ হয়েছিল বলেই বলেছিলাম : সর্বসাধারণের কাছে ছবিটা পৌঁছবে এমন মনে হয় না, সযত্নে পরিত্যক্ত হলেও আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস বিশ্বের দরবারে মহৎ স্বীকৃতি পাবে 'অপরাজিত'। পেয়েছিলও।

> তাই যতোবার ভাবি দেখি, আমার মনে হয় যেন একটা ভূকম্পন হতে থাকে আমার মধ্যে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আজকের পৃথিবী ভয়াল কিন্তু অনাত্মীয় নয়। অস্বীকার করব না আজও ওঁর অন্য কোনও ছবি আমাকে এত নাড়া দেয় না, 'অপরাজিত' এখনো যেমন দেয়।

দৃষ্টিতে এ-ছবি শান্ত স্থির। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এর ভয়ঙ্কর তীব্রতা। তাই যতোবার ভাবি দেখি, আমার মনে হয় যেন একটা ভূকম্পন হতে থাকে আমার মধ্যে। আমার সামনে এসে দাঁড়ায় আজকের পৃথিবী—ভয়াল কিন্তু অনাত্মীয় নয়। অস্বীকার করব না আজও ওঁর অন্য কোনো ছবি আমাকে এত নাড়া দেয় না, 'অপরাজিত' এখনো যেমন দেয়।

তবু কেন সেদিন টেলিভিশনে ওঁর কথায় তেমন প্রাণের আন্দাজ পাইনি ? ছবিটি বাঙালী দর্শক গ্রহণ করতে পারেননি বলেই কি ? সেদিন বলেওছিলেন কথাটা, বলেছিলেন দর্শকের মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা। সেই জন্যই কি ?

মনে পড়ে অনেক বছর আগে যেদিন 'অপরাজিত' প্রথম বেরুলো, সেদিনই রাত্রে ছবিটি দেখলাম। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় লেক প্লেস-এর তেতলায় সেই ছোট্টো ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছুলাম। ঘরে তখন সত্যজিৎ রায় ছাড়া ছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হলো। তারপর ওঁরা দুজন চলে গেলেন। সত্যজিৎবাবু আমাকে

এবং আজও, এই মুহূর্তে, ছবিটি আমাকে উদ্বেলিত করে। ঠিক যেমন করেছিল অনেক বছর আগে, ছবি দেখতে দেখতে, দেখে বেরিয়ে এসেও। হয়তো এখন আরো বেশি টানে।

তবু সেদিন টেলিভিশনে কথাবার্তায় তেমন উত্তাপ পেলাম না কেন ? তখনই ভেবেছিলাম, টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করব। করিনি।

মানিককাকার প্রভাব ফিল করি : অপর্ণা সেন

মানিককাকাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। অনেকে জানেন মানিককাকা যখন ডি জি কিমার-এ ছিলেন তখন থেকে আমার বাবা (চিদানন্দ দাশগুপ্ত)'র সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমার মনে হয়, তারও আগে থেকে। অর্থাৎ খুব ছোটবেলা থেকেই আমি মানিককাকাকে দেখছি। ছোটবেলাকার কথা আমার আবছা মনে পড়ে। মনে পড়ছে, আমার ছোটবোনের জন্মদিনে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন মানিককাকা। সেই সময় আমি ফ্রক পরি। পরে শুনেছি, তিনি নাকি তখনই আমাকে দেখে 'অপুর সংসার'-এ নেবার কথা ভাবেন। বেশি ছোট দেখাচ্ছিল বলে হয়ত নেননি। ওই চরিত্রে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেন শর্মিলা। পরের ছবি 'তিন কন্যা'। 'সমাপ্তি'-র মৃণ্ময়ী খুঁজছিলেন মানিককাকা। পেয়েও ছিলেন। সুকৃতি ঠাকুর। কিন্তু কোনও

● মৃণাল সেন ও সত্যজিৎ



অসুবিধার জন্য সুকৃতি কাজ করেন না। তখন আবার আমার কথা মাথায় আসে তাঁর। একদিন হঠাৎ ফোন। ফোনটা ধরেছি আমি। অন্যপ্রান্তে রাশভারি কণ্ঠস্বর, আমার খুব চেনা, মানিককাকা। বললেন, 'চিনু আছে ?' কেন জানি না আমার ওই মুহূর্তে মনে হল তিনি আসলে আমাকেই খুঁজছেন। আমি বললাম, 'বাবা বাড়ি নেই। আমি ওঁর বড় মেয়ে বলছি।' বড় মেয়ে বলছি—কথাটা না বললেও চলত। বলে মনে হল ঠিকই করেছি। তাই তিনি আরও কয়েকটা কথা বললেন। পরে বাবাকে সব বললেন। বাবা সব শুনে অনুমতিও দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কারণ রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিক উপলক্ষে ছবি। আরও বড় কথা মানিককাকার ছবি। তখনও আমি জানি না কোন্ ছবি কী চরিত্র ইত্যাদি। বাবার



মুখে জানলাম। তার কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্পটা আমি পড়েছি। মৃণ্ময়ী আমার জানা চরিত্র। খবরটা জানতে পেরে খুব একসাইটেড হয়ে উঠলাম। বাবা তখন জানালেন, 'মানিক একটা টেস্ট নেবে। পাস করলে তবেই—।' শুরু হয়ে গেল বুক দুরু দুরু। কয়েকদিন পরে গেলাম টেস্ট দিতে। ডুরে শাড়ি পড়ে, নাকে নাকছাবি, ঝুঁটি বেঁধে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম মৃণ্ময়ী সেজে। মানিককাকা শুধু বলে গেলেন এদিকে তাকাও, ওদিকে তাকাও, এদিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাও ... ৷ টেস্ট হয়ে গেল। রেজাল্ট তখনও বের হয়নি। তবে আমি মানিককাকা, মঙ্কু মাসি, ইউনিটের লোকজনদের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম টেস্টে পাস করে গিয়েছি। এমনকী আমার নাম অপর্ণা থাকবে না বদলাবে তাও আলোচিত হল। বাবা বলেছিলেন, আমার নাম অপর্ণা না হলে হ'ত ললিতাগৌরী। সেটা বলতে মানিককাকা, মঙ্কু মাসি—সকলে খুব হাসলেন। তার কয়েকদিনের মধ্যে সুখবরটা এল। আমার নাম অপর্ণাই থাকল।

শুরু হল 'সমাপ্তি'র শুটিং, নিমতিতা গ্রামে। যাওয়ার আগে আমার খুব ভয় করছিল। বাবাকে একদিন বললাম, আমার খুব ভয় করছে, মানিককাকা ভীষণ লম্বা, ভারি গলা,বকলে—।' বাবা বললেন, 'খামোকা কেন বকবেন !' ফ্রক পরে শুটিং করতে গিয়েছি। ইংরেজি স্কুলে পড়া মেয়ে। খালি গায়ে ডুরে শাড়ি পরে শুটিং করতে হবে। ওই বয়সটাতে সব মেয়েরাই খুব লাজুক হয়। আমারও খুব লজ্জা লজ্জা করছিল। একদিন কী হল, দেখি শাড়িটা বেশ পাতলা। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। মঙ্কু মাসি সব বলে দিলেন মানিককাকাকে। তৎক্ষণাৎ তিনি শুটিং প্যাক আপ করে পরের দিন শাড়িটা বদলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমনিতে বোঝা যায় না। মানিককাকার সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে থাকলে বোঝা যায় তিনি কতখানি কাইন্ড, বোঝেন বা বোঝার চেষ্টা করেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন, করেছেন। আমার যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় তার জন্যই তো এত কাণ্ড। আমি শটের সময় বা বাইরেও শাড়িটা খুব টানতাম দেখে মানিককাকা আমাকে সহজ করে তোলার জন্য হাসতে হাসতে বলতেন, 'এখানে কেউ নেই, কেউ তোমাকে দেখছে না।' মানিককাকা কী শুটিং-য়ে, কী শুটিংয়ের বাইরে সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন।

তার ফলে কয়েকদিনের মধ্যে শুটিং করাটা আমার কাছে পিকনিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। সন্ধ্যাবেলায়, শুটিং করার পর আমরা সকলে বাড়ির বারান্দায় এসে বসতাম। কয়েকটা হ্যারিকেন জ্বেলে দেওয়া হত। সেই আলোতে আমরা 'ক্যাটাগরি' খেলতাম। মানিককাকাও এসে যোগ দিতেন। 'ক্যাটাগরি' খেলাটা হল এক একজন এক একটা ইংরেজি অক্ষর কাগজে লিখবে। সেই অক্ষর থেকে দেশের নাম, খেলার নাম, খাবারের নাম লিখতে। কে কততাড়াতাড়ি লিখতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলত। মানিককাকা সবসময় প্রথম হতেন। কবি সুভাষ মুখোপধ্যায় গিয়েছিলেন নিমতিতায়। তিনি এই খেলায় অংশ নিয়ে একটা খুব মজার কথা বলেছিলেন। ইংরেজিতে 'ই' দিয়ে লিখতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন 'ইনোস ফ্রুটসল্ট' খাবারের নাম হতে পারে? আরও কতরকম খেলা আমরা খেলতাম সময় কাটাবার জন্য। গল্প লেখা খেলা। একজন চার লাইন লিখে শেষের লাইনে কিউ রেখে দিত। সেই লাইনটা ধরে একজনকে আরও কয়েক লাইন লিখতে হত। এ ভাবে শেষমেষ সেটা গল্প হয়ে উঠত। কত মজার মজার গল্প। সবই মানিককাকা চালু করেছিলেন। মানিককাকাকে আমি কখনও দেখিনি শুটিংয়ের পর ছবির কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে। এতটাই রিল্যাক্সড হয়ে থাকতেন। শুটিংয়ের সময় চিত্রনাট্যের খাতা নিয়েও সেরকম নাড়াচাড়া করতে দেখিনি তখন। সবটাই আসলে তাঁর মাথায় থাকত। আমি একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম তাঁকে, 'স্ক্রিপ্টে ওই যে আঁকা রয়েছে ওটা তবে কিসের জন্য এবং লেখাগুলো?' মানিককাকা হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওটা সুব্রত (সুব্রত মিত্র; ক্যামেরাম্যান) কে বোঝাবার জন্য। পরিণত বয়সে কাজ করার সময়ও দেখেছি মানিককাকার কাজের স্টাইলটা একটুও বদলায়নি।

সবটাই তাঁর মাথায় থাকে। তবে পরিবেশটা বদলেছে। আগেকার পরিবেশ এখন হয়ত পাওয়া যায় না মানিককাকার শুটিংয়ে। 'জন অরণ্য'র শুটিংয়ে আমি ছিলাম। একটা ছোট্ট রোল করেছিলাম। আগে কাজ করবার সময় মানিককাকা যেমন সব দেখিয়ে দিতেন, এবার দিলেন না। বললেন, 'তোকে কী দেখাব, এত ছবিতে কাজ করেছিস—।' শিল্পীদের স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে মানিককাকাকে দেখেছি বরাবর দুরকম নীতি মেনে চলতে। কোন্ শিল্পীকে নির্দেশ দিতে হবে, কোন্ শিল্পীকে দিতে হবে না—তিনি সেটা বিলক্ষণ বোঝেন। মানিককাকা বুঝে করেন। যে ঠিক লাইনে যাচ্ছে তাঁকে তিনি কখনই ঘাঁটান না। আবার কাউকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করতেও দেখেছি। শুনেছি 'পথের পাঁচালি'র অপু-কেও সেইভাবে মানিককাকা কাজ করিয়েছিলেন। আমার ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে প্রায় তাই হয়েছিল। তিনটি ক্লোজ-আপ শট নেওয়া হয়েছিল পর পর। আলো বদলে, একই জায়গায়। একবার ছটফটে ভাব মুখে রেখে। একবার অসুস্থ। আরেকবার বলে দেওয়া হল অমূল্যর ওপর আমার (মৃণ্ময়ীর) রাগ নেই। এখন সে নারী। নারীত্ব এসেছে তার মধ্যে। শেষ শটটি নেবার সময় মানিককাকা আমাকে বলে দিলেন, 'ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুখে বুড়ো আঙুলটা দাও। আর থিঙ্ক অফ লাভলি ওয়ান্ডারফুল থিংস। এভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। কেবল একবার আমি একটা শটে কিছুটা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করেছিলাম। শটে হাত থেকে কাঠবেড়ালিটাকে ছেড়ে দিতে সে চলে যাবে। কিছুতেই যায় না। শেষে আমি কী করলাম জানালার ওপর থেকে গড়িয়ে দিয়ে বলি, 'চলে গেল, চলে গেল'। ক্যামেরা চলতে থাকে। শট শেষ হয়। মানিককাকা তখন বললেন 'একটা ব্যাপার হয়েছে কিন্তু।' তিনি কথায় কথায় 'ব্যাপার' কথাটা ব্যবহার করেন। বোঝা গেল শটটা থাকবে। আমি কোনও ভুল করিনি। তারপর মানিককাকার ছবিতে, কাজের ক্ষেত্রে অভিনেত্রী হিসাবে ধীরে ধীরে আমি স্বাধীনতা পেয়েছি। তাঁর কাজের পদ্ধতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছি।

এতখানি একাত্ম যে পরে নিজে যখন ছবি করি তখন সেটা আমাকে প্রভাবিত করে। মানিককাকার প্রভাব আমি ফিল করি। ওই 'একটা ব্যাপার' আমার কানে বাজে, মনে পড়ে যায়, সব, সব!



নিমাই ঘোষ

মানিককাকার ছবিতে, কাজের ক্ষেত্রে অভিনেত্রী হিসাবে ধীরে ধীরে আমি স্বাধীনতা পেয়েছি। তাঁর কাজের পদ্ধতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছি। এতখানি একাত্ম যে পরে নিজে যখন ছবি করি তখন সেটা আমাকে প্রভাবিত করে। মানিককাকার প্রভাব আমি ফিল করি।

উনি একের মধ্যে অনেক : অমিতাভ বচ্চন

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আমি কি বলব! ওই বিশাল প্রতিভা নিয়ে কিছু বলার সাধ্যি আছে নাকি আমার। শিল্পটিল্পর ক্ষেত্রে আমি সত্যজিৎ রায়ের ধারেকাছেও পৌছই না। সেই ছেলেবেলা থেকে ওঁর ছবি দেখে আসছি। বিদেশে দেখেছি ভারতীয় সিনেমা নিয়ে যদি কোনও আলোচনা হয়, তো একটা নামই শেষমেশ এসে পড়ে। সেটা সত্যজিৎ রায়ের। এ তো আমাদের, সারা ভারতবর্ষের গর্বের বিষয়।



• সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে অপর্ণা সেন সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন

আমার স্ত্রী জয়া সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করেছে। ওঁর সঙ্গে আমার মাঝে—মধ্যে দেখা হয়েছে মাত্র। অবশ্য বেশ কয়েকবার একসঙ্গে কাজ করার কথা উঠেছিল বটে। কিন্তু কপাল খারাপ। সেটা আর হয়ে উঠল না। একবার, শুধু একবারই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। তবে তাও অভিনয়ের নয়, ধারাভাষ্যের কাজ। রায়ের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে কমেন্ট্রি, দিতে হয়েছিল আমাকে। পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ওই একটা কাজই আমার পক্ষে বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করি।

তবে সত্যজিৎ রায় কীভাবে কাজ করেন সেটা দেখার অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার আরও অনেক আগে হয়েছিল। তখন কে এ আব্বাসের 'সাত হিন্দুস্থানী' ছবিতে কাজ করছি। সেই সময় কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের চিত্র—সম্পাদনার একটা কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই বুঝতে পারি সত্যজিতের কাজের ধরন। শুধু ফিল্ম কেন ? লেখা, সঙ্গীত আরও কতদিকে ওঁর প্রতিভা। 'অস্কার' এবং 'ভারতরত্ন'—এই দুটো বিরাট পুরস্কার ওঁর বিশাল প্রতিভারই স্বীকৃতি। ওঁর এই সম্মান শুধুমাত্র ওঁর একার নয়, আমাদের সকলেরই। বিশেষ করে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন এই পুরস্কার দুটি পেয়েছেন বলে।

ব্যক্তি সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আমি খুব কম জানি। কিন্তু ওঁর সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি তাতে খোলামনে এটুকু বলতে পারি যে ওইরকম বহুমুখী প্রতিভার সন্ধান কদাচিৎ মেলে। টু—ইন—ওয়ান বা থ্রি—ইন—ওয়ান নন, উনি একের মধ্যে অনেক কিছু। আমি আবার বলছি সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিভা হয় না। তিনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠে কাজের মধ্যে ফিরে আসবেন ভেবেছিলাম। তা আর হ'ল না। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য চিত্ররূপ দিতে পারেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হঠাৎ একদিন টেলিফোনে গম্ভীর গলায় শুনতে পেলাম, 'আমার নাম সত্যজিৎ রায়, আমি আপনার একটা বই সম্প্রতি পড়েছি—সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। কোথায় দেখা হতে পারে বলুন তো ?

খুবই চমকে উঠেছিলাম অবশ্যই। তেইশ-চব্বিশ বছর আগেকার কথা। তখন গদ্য লেখক হিসেবে আমার পরিচিতি যৎসামান্য। বই হিসেবে দুটি মাত্র উপন্যাস বেরিয়েছে। সত্যজিৎ রায় তখন জগৎবিখ্যাত, 'চারুলতা' পর্যন্ত অসাধারণ সব চলচ্চিত্রের স্রষ্টা। আমার সঙ্গে তাঁর কোনই যোগাযোগ ছিল না তখন। যদিও বেশ কিছু বছর আগে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সামান্য চিনতাম। আমার বেশ ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটা কবিতার বই ছাপাবার পরিকল্পনা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। তাঁকে দিয়ে সেই কবিতা বইয়ের মলাট আঁকাবার জন্যে। তখন তিনি বাঙলা কিংবা সারা ভারতেরই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদপট শিল্পী। আমাদের মতন সামান্য দুই কিশোরের আব্দার শুনে তিনি তাচ্ছিল্য করেননি। বরং খুবই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। সেই বই অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এরও কয়েক বছর পরে 'হরবোলা' নামে আমাদের একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি মাঝেমাঝে আসতেন। এখানে আমরা নাটকের অভিনয় করতাম, যার পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক ছিলেন সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত এবং প্রখ্যাত লেখক কমলকুমার মজুমদার। সত্যজিৎ রায় সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং দিলীপকুমার গুপ্তের অনুরোধে আমাদের থিয়েটারের মঞ্চ পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিলেন। সেই সময় তিনি বিজ্ঞাপনের জগতে এবং বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকাতেই বিখ্যাত ছিলেন। তখনও চলচ্চিত্রের জগতে তাঁর বিশাল আবির্ভাব ঘটেনি।

এরপর অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। তিনি তখন চলচ্চিত্র স্রষ্টা হিসেবে আমাদের বিশেষ প্রিয় এবং লেখক হিসেবেও সর্বস্তরের বাঙালি পাঠকের মন জয় করেছেন। এমন একটি দিনেতেই তিনি আমাকে টেলিফোন করলেন। সেদিনও তিনি অসাধারণ ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আমাকে তাঁর বাড়ি যাবার আদেশ করেননি। বরং বলেছিলেন যে, তিনি কী আমার বাড়িতে আসবেন অথবা অন্য কোথাও দেখা হতে পারে কী ? আমি তখন দমদমে একটা সামান্য ফ্ল্যাটে থাকি। সেখানে সত্যজিৎ রায়ের মত এক বিশাল ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হলে খুবই বিব্রত হয়ে পড়তাম নিশ্চয়। সেজন্য আমিই বলেছিলাম যে, আমি তাঁর বাড়িতে দেখা করতে যাব।

তিনি বললেন, তিনি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'

এস. রায়



নামে উপন্যাসটি পড়েছেন। এবং সেটা নিয়ে ফিল্ম করা যায় কি না ভাবছেন। এতেও আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' প্রকাশিত হয়েছিল 'জলসা' নামে একটি সিনেমা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। সেই পত্রিকার প্রেস থেকে আমাদের কবিতার পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' ছাপা হতো। মাঝে কিছুদিন 'কৃত্তিবাস' ছাপার জন্য ধার জমে গিয়েছিল। সেই ধার মেটাবার জন্যই আমি 'জলসা' পত্রিকায় 'অরণ্যের দিনরাত্রি' লিখে শোধবোধ করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল ওই উপন্যাসটি খুবই হেলাফেলায় লেখা। সেটা বই হিসেবে ছাপা হওয়া মাত্রই যে সত্যজিৎ রায় পড়বেন এবং চলচ্চিত্রের জন্য বিবেচনা করবেন তা ছিল আমার কাছে কল্পনার অতীত। এর আগে পর্যন্ত সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ল্যাসিক অবলম্বনেই ছবি করেছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর প্রিয়—এ ছাড়া তারাশঙ্কর, রাজশেখর বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনাও তিনি নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তো বারবার গ্রহণ করেছেন। আমার মতন কোন তরুণ সাহিত্যিকের লেখাও যে তিনি বিবেচনা করবেন এটা একেবারে আশাতীত।

সেদিনের কথাবার্তায় তাঁর আরেকটি গুণ দেখেও বিস্মিত হয়েছিলাম। যেহেতু 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র কাহিনীটি তাঁর পছন্দ হয়েছিল সেজন্য তিনি বইটা যে কতবার পড়েছিলেন যে তা ঠিক নেই। প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ বলে যাচ্ছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন,—কাহিনীর সময়টাতে কোন ঋতু, চারটি যুবক হাওড়া স্টেশনের কোথায় দেখা করল, ধলভূমগড়ের জঙ্গলে কী কী ধরনের ফুল ফোটে, মহুয়ার মদ খেতে কী রকম। এর উত্তর আমি দিতে পারিনি। কারণ আমার নিজেরই মনে ছিল না।

সবশেষে তিনি একটা বেশ মজার কথা বলেছিলেন। তিনি হেসে বললেন, আমি পাকা কথা আপনাকে সাতদিনের মধ্যে জানাব। এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবেন না। আর অন্য কেউ এর মধ্যে এই গল্পটা কিনতে এলে আমাকে একটু জানাবেন। সে সময় কোন চলচ্চিত্র প্রযোজকের আমার কাহিনী সম্পর্কে কোন আগ্রহ ছিল না। ওই সাতদিনের মধ্যেই ওই কাহিনী অন্য কেউ কিনতে চাইবে এ রকম কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। আমি তবু হেসে বললাম, কাল সকালেই যদি প্রযোজকরা আমার বাড়ির সামনে লাইন দেয় তাহলে তাঁদের আমি কী বলে ফেরাব?

সত্যজিৎ রায় খুব দরাজ গলায় হাসতে পারেন। তিনি প্রায় ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, বাজারে রটে গেলে অনেক সময় এ রকম ঘটে।

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র শুটিং আমি দেখতে যাইনি। টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে প্রথম কয়েকজনকে এই ছবিটি দেখানো হয়। সেখানে আমি ছিলাম। আমার পাশে বসেছিল আমার কলেজ জীবনের বন্ধু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাকে একসময় আমি চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম, ওই যে ডাকবাংলোর চৌকিদারের ভূমিকায় যে রয়েছে তাকে কি সত্যি সত্যি বেতলা জঙ্গলের কোন ডাকবাংলো থেকে পাওয়া গেছে? সৌমিত্র বলল, না-না উনি তো স্টুডিওর একজন নিয়মিত অভিনেতা। ছোট-খাটো অভিনয় করেন অনেক ফিল্মে। আমি প্রায় হতবাক। ওই চৌকিদারের চরিত্র এমনই বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব হয়েছিল যে তাঁকে আমি সত্যিকারের কোন চৌকিদার ভেবেছিলাম। এখানেই সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ কৃতিত্ব। ছোট-খাটো চরিত্রগুলোকে তিনি দারুণ জীবন্ত করে তুলতে পারেন। ছোট-খাটো চরিত্রের দিকে যিনি বিশেষ নজর দেন তিনিই আসলে মহৎ পরিচালক।

সত্যজিৎ রায়ের ধারণা, 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ফিল্মকে আমি পছন্দ করিনি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি এ রকম কথা বলেছিলেন। আমি কিন্তু এ রকম মন্তব্য কখনও করিনি। বিদেশে গিয়ে আমি শুনেছি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম কোর্সে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটি পাঠ্যপুস্তকের মতো দেখানো হয়। ফিল্মে ভাষা নিয়ে এতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। আমার কাছে ঠিক ভাল না মন্দ লাগার প্রশ্ন ছিল না। নির্লিপ্তভাবে এ ছবি দেখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমার কোন কল্পিত কাহিনীও নয়। আমি নিজে এবং আমার কয়েকজন বন্ধু এই উপন্যাসের আসল চরিত্র। সেইসব ভূমিকায় অন্যলোকদের অভিনয় করতে দেখলে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো অবস্থা হয়।

ঠিক এর পরেই তিনি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' কাহিনীটি বেছে নিলেন। এটাও একটা ছোট পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পত্রিকার নামটি আমার মনে নেই। এই কাহিনী নেবার সময় তিনি বলেছিলেন, কিছু বেকার ও বিদ্রোহী তরুণের গল্পই তিনি খুঁজছিলেন। কিন্তু আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ ছিল তিনি কি বেকার ও বিদ্রোহী যুবকদের চেনেন? আমি নিজে চাকরির জন্য অন্তত কয়েকশ ইন্টারভিউ দিয়েছি। ষাটের দশকে ইন্টারভিউ প্রহসনের ব্যাপারটা আমি ভালই জানি। তখন নকশাল বিদ্রোহের বীজও নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। আমার ছোটভাইয়ের মতো ছেলেরা তখন ক্ষুব্ধ মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। অহরহ তাদের দেখেছি। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের এইসব বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তিনি নিজে কখনও গ্রামে থাকেননি। শান্তিনিকেতনের বাইরে গ্রাম বেশি দেখেননি। বংশীচন্দ্র গুপ্তকে নিয়ে মাঝে মাঝে ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবারের দিকে বেড়াতে যেতেন শুনেছি। তবু তিনি 'পথের পাঁচালি'-র ওই গ্রাম ফুটিয়ে তুললেন কী ভাবে! সত্যিকারের প্রতিভাবানদের বোধহয় বেশি বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। তাঁরা কয়েক ঝলকে যা দেখেন, অনেকে কয়েক বছরেও তা দেখতে পান না। হয়ত সেই কারণে তিনি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য শিল্পরূপ দিতে পেরেছিলেন। একেবারে শেষদৃশ্যটি আমার উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। পরে আমি ভেবে দেখেছি তাঁর পরিকল্পিত দৃশ্যটি, একটা অজানা পাখির ডাক দিয়ে যার শেষ—তার আবেদন অনেক গভীর। এখানে তিনি কাহিনীটির উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

আমি ভুলিনি, একটা মুহূর্তও : ওয়াহীদা

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ঘটনাটি ঘটেছিল। এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে

একেবারে শেষ দৃশ্যটি আমার উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমে সেটা আমার পছন্দ হয়নি। পরে আমি ভেবে দেখেছি তাঁর পরিকল্পিত দৃশ্যটি, একটা অজানা পাখির ডাক দিয়ে যার শেষ—তার আবেদন অনেক গভীর।

পড়ছে না কে আমাকে সত্যজিৎ রায়ের হাতের লেখা একটি চিঠি আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল। সম্ভবত ফিল্ম-ফেয়ার পত্রিকার কেউ। তখন আমি বোম্বাইতে কমার্শিয়াল ছবিতে চুটিয়ে কাজ করছি। চিঠিটা পড়ে তো বিস্মিত। বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ করার অফার। আমি ভাবতেই পারছি না। আমার জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। তারপর একদিন সত্যি সত্যি কাজ করতে এলাম সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। 'অভিযান'। কলকাতায় পৌঁছোবার পর দেখা করলাম ওঁর সঙ্গে। দেখা করার আগে পর্যন্ত কত কী ভেবেছিলাম। ভীষণ ভয়ও করছিল। একেবারে অন্য ধরনের ছবিতে কাজ করব আর ওই একরকম পরিচালকের ছবিতে। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় এবং ভাবনা সব উঠে গেল। শুরু হয়ে গেল শুটিং। এত পরিষ্কার সব কিছু যে একটা শট বা পরিচালক আমার কাছ থেকে কী চান বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হল না। এরকম একজন পরিচালক আমি আগে কখনও পাইনি, পরেও না, যিনি ছবি তৈরির গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তিনি জানেন কী করছেন। কী করতে হবে এবং কোথায় যেতে হবে। তাই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আসা বা কাজ করা আমার জীবনের একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা! কাজের ক্ষেত্রে পরিচালক একজন শিল্পীর কাছ থেকে কী চান, সে সম্পর্কে পরিচালকের ধারণা স্বচ্ছ থাকলে শিল্পীকে সে কমিউনিকেট করতে পারে, পারেই। শিল্পী কাজ করার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে এলে, তার পক্ষেও সেই পরিচালককে কমিউনিকেট করা সম্ভব।



• ওয়াহীদা রহমান

মিস্টার রে আমিও ভুলিনি, আপনার মতো একজন মানুষের সংস্পর্শে আসা, আপনার ছবিতে কাজ করা—একটা মুহূর্তও 'আমি ভুলিনি, ভোলা যায় না!

একদিন একটি শট টেক করা হচ্ছে স্টুডিওতে। সায়লেন্ট শট। সেখানে আমার কী করা উচিৎ বুঝে নিয়েছি। সত্যজিৎ রায় বোঝাবার আগেই সেটা করে ফেললাম। তিনি তো অবাক। আমি হাসলাম। পরে বললেন, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি একজন তৈরি আর্টিস্ট। আমি সচরাচর তৈরি আর্টিস্ট নিয়ে কাজ করি না বলেই একটু অবাক হয়েছি। কিছু বললাম না, বুঝিয়ে দিলাম, এমন কী নিজে করেও দেখাই নি—এতটা নিখুঁতভাবে করলেন কী করে!

এত ছবিতে কাজ করেছি তবু সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ করার স্মৃতি আলাদা, আমার কাছে আজও অম্লান। কখনও কখনও মনে হয়, এই তো কয়েকদিন আগেই বুঝি অভিযান-এর শুটিং করে ফিরলাম। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে মাত্র একবারই আমার দেখা হয়েছিল। তখন আমি রাজকমল কলামন্দিরে শুটিং করছিলাম। তিনি তখন কী একটা কাজে এসেছিলেন। দেখামাত্র আমি বললাম, 'মিস্টার রে আপনি কিন্তু আপনার কথা রাখলেন না!' চমকে উঠলেন তিনি। হঠাৎ করে তাঁরও মনে পড়ে গেল। অভিযান শেষ হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় আমাকে বলেছিলেন, 'আমি যদি কখনও হিন্দি ছবি করি তখন তোমাকে নিয়ে কাজ করার কথা নিশ্চয় ভাবব।' সত্যজিৎ রায় তাঁর সেদিনের ওই কথার জের টেনে বলেন, 'সত্যি, শতরঞ্জ কে খিলাড়িতে আপনার মতো কোনও রোল ছিল না। কিন্তু আমি ভুলিনি। মনে আছে, থাকবে।'

মিস্টার রে আমিও ভুলিনি, আপনার মতো একজন মানুষের সংস্পর্শে আসা, আপনার ছবিতে কাজ করা—একটা মুহূর্তও আমি ভুলিনি, ভোলা যায় না!

ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে প্রাণবিন্দু : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

তখন আমার বয়স ন'দশ বছর। মনে আছে, মফঃস্বলের কোনও প্রেক্ষাগৃহে এক শীতের রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে বাবার এক সহকর্মীর সঙ্গে 'পথের পাঁচালি' দেখে বাড়ি ফিরছি। সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা করা শুরু হয়ে গেল। স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে আমার সেই রাতটির কথা সেইসময় আমি নেহাতই বালক। ভাবা পরের কথা, হঠাৎ করে স্বপ্ন-টপ্নও দেখিনি আমি সিনেমা তৈরি করছি করবো। অথবা তেমন কোনও কৌতূহলও জাগেনি আমার মধ্যে সিনেমা কী করে তৈরি হয়, সিনেমা ব্যাপারটা কী। তারপর দেখলাম 'অপরাজিত'। 'অপরাজিত' দেখার পর এক ঘোরের মধ্যে থাকলাম বেশ

কিছুদিন। বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে একাধিক বার দেখলাম 'অপরাজিত' অপুকে চিনতে পারলাম, বুঝতে শিখলাম। সর্বজয়ার সঙ্গে কোথায় যেন নিজের মা'র মিল খুঁজে পেলাম। ইতিমধ্যে 'পথের পাঁচালি' এবং 'অপরাজিত' বার বার পড়া হয়ে গিয়েছিল। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন আমার সবচাইতে প্রিয় লেখক। ক্রমে আমার বয়স বাড়তে থাকে এবং একটা সময়, এমনই একটা বয়সে এসে পৌঁছোই যখন নানান ধরনের স্বপ্ন, কল্পনা এবং ভাবনা মাথায় এসে ভিড় করে।

নিজেকে অপু বলে ভাবতেও শুরু করে দিই। 'অপুর সংসার' দেখার পর থেকে সেটা বেশি করে হয়েছিল। 'অপুর সংসার'-ও তাই আমি বেশ কয়েকবার দেখেছিলাম। বুঝতে শুরু করলাম চলচ্চিত্রের ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা এক নয়। সিনেমা যে সাহিত্যের কাঁধে ভর করে চলার কথা ভাববে না সেটা একটু একটু করে জানলাম। বুঝলাম। শিখতে লাগলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে গেলাম সত্যজিৎ রায়ের একটার পর একটা ছবি। মনে পড়ছে 'চারুলতা' দেখার কথা। দেখার পরের কয়েকটি দিনের কথা। সব সময় 'চারুলতা' নিয়ে চর্চা, আলোচনা। ছবির অসাধারণ মুহূর্তগুলোকে নিয়ে মনের মধ্যে চলে তোলপাড়, ওঠে তুমুল আলোড়ন। তাঁর বিভিন্ন ছবির নানান জায়গা আজও আমি খুব স্পষ্ট মনে করতে পারি। বুঝতে পারি চলচ্চিত্রের একেবারে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে সত্যজিৎ রায় সিনেমার কতখানি উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে চাইছেন আমাদের। এর অর্থ এই নয় সিনেমাকে শিল্প মাধ্যম হিসাবে ভারতবর্ষে আগে কেউ ভাবেননি, বা তা নিয়ে কাজ করেননি। চেষ্টা হয়েছিল, কিছু কিছু সাফল্যও এসেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, তিনিই প্রায় চলচ্চিত্রকে এক অসাধারণ মহিমায় এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন সিনেমা আসলে একটি শিল্প মাধ্যম। বলতে দ্বিধা নেই, আমি এবং আমার মতো অনেককে সত্যজিৎ রায়ের ছবি উদ্দীপ্ত করেছে। প্রভাবান্বিত হয়েছি, এমনও হতে পারে। কিংবা এও বলতে পারি, তাঁর ছবি আমার স্বপ্নকে উসকে দিয়েছিল। শিখিয়ে দিয়েছিল কী করতে হবে কী করতে হবে না। আমরা, যাঁরা পরের প্রজন্মের চিত্র পরিচালক, তাঁর কাছে আমরা নানানভাবে ঋণী। পাশাপাশি একথাও ঠিক, তাঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তা বা সব ক'টি ছবি একভাবে আমাদের আন্দোলিত করেনি, উদ্বুদ্ধ করেনি। কিন্তু যে কথা কখনই অস্বীকার করা যাবে না, তা হল, তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়কেও আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি আমার কম বয়সে। আমি তখন সবে কিশোর-উত্তীর্ণ, কলেজে পড়ি, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চলে যাই টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায়, ঢুকে পড়ি সত্যজিৎ রায়ের ছবির শুটিং দেখতে। শুটিং দেখতে দেখতে আমাকে যেটা ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল, তা হল এই যে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি শাখায়, এমনকী প্রতিটি প্রশাখায়ও তাঁর দক্ষতা, এবং তাঁর গভীর চিন্তাবোধ। একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ চলচ্চিত্র পরিচালককে দক্ষ ক্যামেরাম্যান হতে হয়, অসম্ভব দক্ষ সম্পাদক হতে হয়, অভিনেতা হতে হয় এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সমস্ত কৌশল অনায়াসলব্ধ করে নিতে হয়। তার পরেও দরকার, চেতনা, বোধ—যা একান্ত নিজের, যা কেউ কাউকে দিয়ে যেতে পারে না, দিতে পারে না। এই বোধ এবং চেতনার ওপর ভিত্তি করেই এক একজন চিত্র পরিচালক এক এক ধরনের ছবি তৈরি করেন, এক এক মাত্রার ছবি তৈরি করেন। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা নিশ্চয় বলা যায়, সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' থেকে শুরু করে বেশ কিছুকাল পর্যন্ত যে সব ছবি তৈরি করেছেন তা একজন শিক্ষানবিশ চিত্র পরিচালকের কাছে অবশ্য পাঠ্য। সময়ের বিবর্তনের ফলে আজকের চলচ্চিত্রের ভাষা হয়ত সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের ভাষার সমধর্মী নয়।

না হলেও, আমি বলব, ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের যে প্রাণ বিন্দু সেই জায়গায় যে মানুষটি বসে আছেন, বসে থাকবেন বহুকাল ধরে, তিনি আর কেউ নন, সত্যজিৎ রায়।



নিমাই ঘোষ

• সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে একটি তথ্যচিত্রের শুটিং করছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত চেয়ারে বসে সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ : গোবিন্দ

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম যে ছবিটি আমি দেখেছি তার নাম 'অপুর সংসার'। 'পথের পাঁচালি' আমি পরে দেখি। আমি তখন বাঙ্গালোর ফিল্ম ইন্সটিটিউটে পড়ছি। মাঝে মাঝে বোম্বাইতে আসি। বোম্বাইতে 'ফিল্ম ফোরাম' নামে একটি ফিল্ম সোসাইটির সদস্য। সেই সূত্রে সেবার এসে শুনি শহরে সত্যজিৎ রায় এসেছেন। রিতজ হোটেলে উঠেছেন। 'অপুর সংসার' দেখার স্মৃতি তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 'অপরাজিত'র অপুকে ভুলতে পারছি না। ঠিক এমনসময় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ঠিক হল, বন্ধু অরুণ কাউলের সঙ্গে রিতজ হোটেলে যাব, ফিল্ম ফোরামের কাজ নিয়ে।

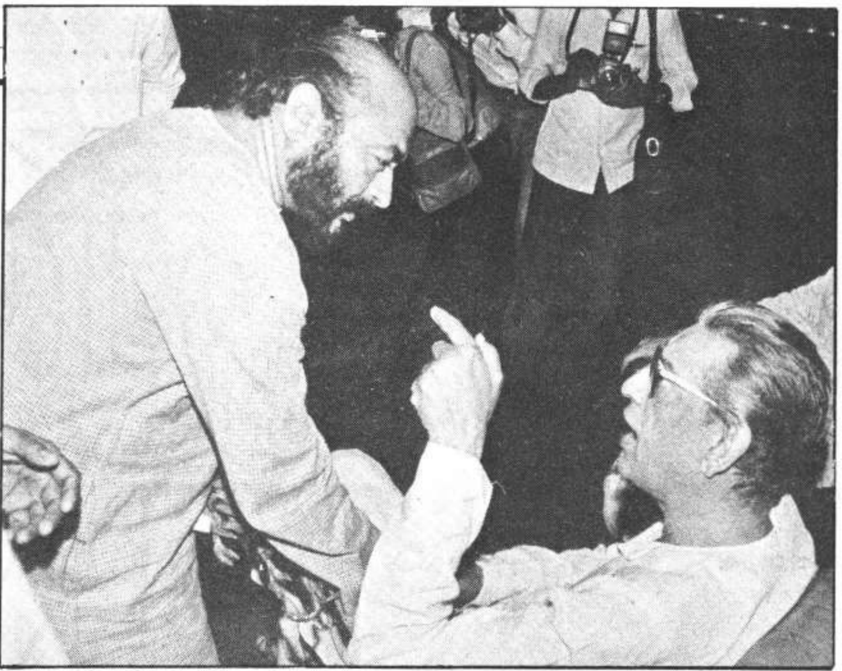
সত্যজিৎ রায় সময় দিয়েছেন। সেসময় কাছে ছিল আমার ক্যামেরা লাইকা। ছবি তোলাকে জীবিকা করার আগে ছবি তোলা ছিল আমার শখ। শখে ছবি তুলতাম। সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলা তো ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের মানুষটি আমার ক্যামেরার সামনে। অরুণ কথা বলে গেল, আমি ছবি তুলে চললাম। ছবিগুলি দারুণ হয়ে গেল। ছাপাও হল ফিল্মফেয়ার-এ। সত্যজিতের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় দেখা চিত্র সমালোচক ইকবাল মাসুদের বাড়িতে। তিনি তখন 'পিকু'-র মিক্সিং এর কাজ করতে বোম্বাইতে এসেছেন। আমি শেষ করেছি আমার প্রথম ছবি 'আক্রোশ'। ঠিক হয়েছে পরের দিন সত্যজিৎ 'আক্রোশ' দেখবেন। সেই সূত্রে দু'একদিন আগেই তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছিল। ইকবাল মাসুদের বাড়িতে ডিনার পার্টি ছিল। শহরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে বলেছিলেন ইকবাল। আসলে সত্যজিতের সম্মানে ছিল ওই ঘরোয়া আয়োজন। এবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হল। সরাসরি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম 'পিকু'-র কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডিটেলস-এ কীভাবে ছবিটা তৈরি করেছেন, সব বলে গেলেন। শট বাই শট। আমি তাঁর কথা শুনে যাচ্ছিলাম সিনেমার একজন ছাত্রের মতো। ভাবা যায়, ওইরকম একজন মানুষ, সিনেমার কোনও ছাত্রকে তাঁর ছবি সম্পর্কে এভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ সত্যজিৎ রায় সেখানেই আমার অনেকটা জানা হয়ে যায়।

মানুষ সত্যজিতের সঙ্গে সত্যজিতের সিনেমার কোনও অমিল নেই। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে যেভাবে 'পিকু'-র ছবিগুলি ফুটে উঠেছিল, ঠিক সেটাই কিন্তু পর্দায় প্রতিফলিত। সত্যজিতের কথাতে যেমন কোনও দেখানপনা নেই, তেমনি তাঁর ছবিগুলিতে। সত্যজিৎ যে কতো বড়মাপের শিল্পী তা বুঝে নেওয়া যায় এভাবে। 'এফর্টলেস, এলিগ্যান্ট, এক্সট্রিমলি রিফাইন্ড' তাঁর চলচ্চিত্র ভাবনা। সেটা সত্যজিতের ছবিগুলিতে যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি তাঁর সংস্পর্শে এলে। স্বাভাবিকভাবে, স্বচ্ছন্দে যা সত্যজিতের ভাবনায় আসে তারই প্রতিফলন ঘটে সত্যজিতের ছবিতে। একটা ছবি দেখে তার পরিচালকের সঙ্গে কথা বলে অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে এই কি এর পরিচালক ? সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে একেবারেই তা ঘটে না। তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার মনে হয় আমার, এদেশের বেশিরভাগ চিত্র পরিচালক তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে

[redacted]

> মানুষ সত্যজিতের সিনেমার কোনও অমিল নেই। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে যেভাবে 'পিকু'-র ছবিগুলি ফুটে উঠেছিল, ঠিক সেটাই কিন্তু পর্দায় প্রতিফলিত। সত্যজিতের কথাতে যেমন কোনও দেখানপনা নেই, তেমনি তাঁর ছবিগুলিতে। সত্যজিৎ যে কতো বড়মাপের শিল্পী তা বুঝে নেওয়া যায় এভাবে।

পৌঁছোতে পারেন না। ইনটেনশন থাকে এক হয় আর এক। তার ফলে ইনটেনশন এবং অ্যাচিভমেন্ট-এর মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। সত্যজিতের ক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়েছে। ইনটেনশনকে ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁর অ্যাচিভমেন্ট! সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে শ্যাম বেনেগালের যে তথ্যচিত্রটি তৈরি হয়েছিল তার ক্যামেরাম্যান ছিলাম আমি। তখন আমি সত্যজিৎ-কে আরও কাছ থেকে দেখেছি। ছবিটি তৈরির পিছনে শ্যামের উদ্দেশ্য ছিল সত্যজিৎ-কে এইভাবে প্রতিফলিত করা—হি হিজ় দ্য লাস্ট রেনেসঁস ম্যান ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমিও মনে প্রাণে তাই বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর সত্যজিৎ রায়—তার আগে বা পরে কেউ নেই!



• গোবিন্দ নিহালনী ও সত্যজিৎ রায়

জনপ্রিয় ফর্মূলা ব্যবহার করেননি : গৌতম ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের ছবি কেবল দেখার এটা আমার কখনই মনে হয়নি। যখন ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আসিনি, তখনও। তাঁর ছবি দেখার পর একটা রেশ থেকেই যায়। ভাবায়, বোধের পৃথিবীটা তোলপাড় করে দেয়, এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার বহুবার। পরিণত বয়সে এসে বা ছবি তৈরির ক্ষেত্রে এসে বুঝেছি তাঁর ছবিগুলি কীভাবে, কতদূর আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। মিনিমাম মিনস নিয়ে ম্যাক্সিমাম এফেক্ট কেমন করে তৈরি করা যায়, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। সত্যজিৎ রায়, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিককার ছবিগুলি তৈরি করেছেন অতি সাধারণ বাজেটে, অত্যন্ত সাধারণ মানের যন্ত্রপাতি দিয়ে। বিদেশের অনেকে তো সেটা বিশ্বাসই করতে চান না। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তাঁর সেনসিবিলিটি। তাঁর সেনসিবল মনের পরিচয় আমি পেয়েছি ছবিতে, ছবির বাইরেও। অল্পদিন আগে আমি সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন 'পদ্মা নদীর মাঝি'-র সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। মুখোমুখি হতেই আমি বললাম, 'মানিকদা শরীর ভাল আছে তো?' উত্তরে তিনি বললেন, 'শরীরটা একটু গণ্ডগোল করছে। ভাল কাজ করলে মনটা ভাল থাকে, শরীরটাও ভাল থাকে। ড্রাজারি ভাল লাগে না। ড্রাজারি করলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। তখন আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না।' আমার মনে হয় এসব কথায় তাঁর সেনসিবল মনেরই পরিচয় মেলে।

সত্যজিৎবাবু যে এত বড় হয়েছেন, এত প্রশংসা পেয়েছেন তার একটাই কারণ টোটাল সেনসিবিলিটি। শুধুমাত্র ফিল্ম মেকিং নয়, তাঁর অন্যান্য কাজকর্ম, চিত্তবাসনা—সব মিলিয়েই তিনি কিন্তু একজন পরিপূর্ণ শিল্পী। এতদিন ধরে এত ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন—আশ্চর্যের ব্যাপার নিশ্চয়ই। সিনেমা এত সহজ করে তিনি তৈরি করেন এবং তাঁর যে ইনটলেক্ট, সেনসিবিলিটি, সেগুলোকে জোর করে প্রকাশ করেন না, স্বচ্ছন্দে আসে তাঁর ছবিতে। পড়াশোনা, মেধা, চিন্তাভাবনা—এসব দিয়ে সত্যজিৎবাবুর ফিল্মের প্রতি অ্যাপ্রোচ আমার খুব অনেস্ট মনে হয়। জোর করে তিনি দর্শকদের ওপর কিছু চাপান না। নিজস্ব রুচি, সংস্কৃতির প্রতি অটল থেকেও দর্শকদের অবজ্ঞা না করে সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরি করেন। এটা ক'জন পারেন? তিনি তো বারবারই বলেছেন দর্শক ছাড়া ছবি তৈরি করার কোনও অর্থ হয় না। আমিও তাই মনে করি। সিনেমা হলের জন্য যখন ছবি করছি তখন দর্শক ছাড়া তার অস্তিত্ব কোথায়? পাশাপাশি পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চয় হবে, তাই বলে নিজের দর্শককে ছেড়ে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাববো—এসব সত্যজিৎ রায় কদাচিৎ করেছেন। করেননি বললেই হয়। সত্যজিৎবাবু সব সময় ছবি তৈরি করেছেন, করেন নিজের দেশের দর্শকদের দেশের কথা মাথায় রেখে, সর্বোপরি বিদেশের দর্শকের কাছেও পৌঁছোবার জন্যও অর্থাৎ সার্বজনীন আবেদন যাতে থাকে, তেমন ছবিই তিনি তৈরি করতে চেয়েছেন বারবার। তবু তাঁর ছবিগুলির মধ্যে আমার কিন্তু সবচাইতে বেশি ভাল লাগে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। আমার কাছে মনে হয় এটা আশ্চর্য ছবি। কারণ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' যখন তিনি তৈরি করেন তখন পরিবেশ অনুকূল ছিল না। আমি বলবো মাচ অ্যাহেড অফ টাইম। একেবারে অন্য ধরনের ছবি আমরা পাই তাঁর কাছ থেকে। ন্যারেটিভ ভঙ্গি ছেড়ে বা ছবিতে গল্প বলা পুরোপুরি পরিত্যাগ করে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমার সবচাইতে প্রিয় ছবি কেননা এখানে আমি অন্য সত্যজিৎ রায়কে পাই। আলাদাভাবে।

বিদেশের কেউ কেউ হয়ত বলবেন বা এদেশেরও, এতে আন্তনিওনির 'লাভেন্তুরা'-র প্রভাব স্পষ্ট। আমি তা মনে করি না। ছবিটির যে বিশেষত্ব, এতে ছবি করিয়ের যে সেনসিবিলিটি স্পষ্ট, তা হল, একটা ভিক্টোরিয়ানের এজ, যার প্রভাব আমাদের দেশে পড়েছিল, সেই এজ-এর পরবর্তী সময়ে যাঁরা বড় হয়েছেন, আমাদের নাইটিনথ সেঞ্চুরির ব্রিটিশ লিগামি, তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির জানার ইচ্ছে—সবমিলিয়ে যেটা, তার সুচারু প্রকাশ ঘটে, কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য়। তাহলেও সত্যজিৎ রায় কিন্তু আর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-র পথে পা বাড়াননি। কারণ ছবিটি জনপ্রিয় হয়নি। জনপ্রিয় হলে হয়ত এরকম ছবি তিনি আরও তৈরি করতেন। তার অর্থ এই নয় সত্যজিৎ রায় জনপ্রিয়তার জন্য জনপ্রিয় ফরমুলা ব্যবহার করেছেন বা করতে চেয়েছেন। আর তার জন্যই আমি মনে করি, সত্যজিৎ রায় তাঁর জীবদ্দশাতেই হয়ে উঠেছেন ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান।



সহকর্মীদের তিনি সম্মান দিতেন

তারিখটা ঠিক মনে নেই। তবে সময়টা ১৯৫২ সালের শেষের দিক হবে। অতীতের প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক স্বর্গত বংশীদা অর্থাৎ বংশী চন্দ্রগুপ্ত, একদিন বললেন, আমার বন্ধু মানিক ছবি করছে। একেবারে ফিলম লাইনের বাইরের লোক। কিন্তু তার ইচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন মানুষদের নিয়ে কাজ করা। তুই তার সঙ্গে কাজ করবি ?

আমি একটু সঙ্কোচবোধ করছিলুম। সত্যি বলতে কী, মানিকদার কাছে যেতে প্রথমটা আমার খুব ভয়ই করছিল। কারণ বিনোদবিহারীর সার্থক শিষ্য, শান্তিনিকেতনের গর্ব এমন একজন ব্যক্তিত্বের সামনে আমার মত একজন অতি সাধারণ যুবকের দাঁড়ানোর সাহস অন্তত আমার ছিল না।

কিন্তু বংশীদা বললেন, মানিক এমন একজন মানুষই চাইছেন। চল্, তোর কোন সংকোচ নেই। গেলেই বুঝবি কেমন মানুষ।

তখন সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এলো' ছবির শুটিং চলছিল। বংশীদা তার আর্ট ডিরেকটার আর আমি নবীন এডিটর। দু'একদিনের মধ্যেই বংশীদা আমায় নিয়ে গেলেন মানিকদার ৩১এ লেক অ্যাভিনিউর বাড়িতে।

বংশীদা সাহস দিলেও আমার মনে একটা সঙ্কোচ থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু কী জানি কেন, প্রথম দর্শনেই আমাকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। মনে হল যেন মনে মনে তিনি তৈরিই ছিলেন তাঁর 'পথের পাঁচালী' সম্পাদনার মত একটি গুরুদায়িত্ব আমার মত একজনের ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য। এর জন্য অবশ্যই বংশীদার কাছে আমি চির ঋণী। তিনি আমার সম্বন্ধে মানিকদাকে না বললে নিশ্চয়ই এমন একটি দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যেত না।

সেই থেকে আজ অবধি আমি এক অমোঘ আকর্ষণে তাঁর শিল্পসৃষ্টি, কর্মকান্ডর সঙ্গে জড়িয়ে আছি। গত ৪০ বছর কত মানুষ তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরেছেন, আবার চলেও গেছেন। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আমি তাঁকে ছাড়িনি। তিনি যত ছবি করেছেন, ফিচার কিংবা ডকুমেন্টারী সব ছবিতেই আমি সম্পাদক হিসেবে ছিলাম। এর চেয়ে বড় সম্মান আমার কাছে আর কী হতে পারে। জীবনে অনেক অফার এসেছে, প্রলোভন এসেছে। ইচ্ছে করলেই আমি বাড়ি-গাড়ি করে বড়লোক হতে পারতুম। কিন্তু এই যে মানিকদার ছবির সঙ্গে সঙ্গে চিত্র সম্পাদক হিসেবে আমার

• 'হীরক রাজার দেশে' : সম্পাদনার টেবিলে দুলাল দত্ত, সত্যজিৎ ও সহ-সম্পাদক কাশীনাথ বোস



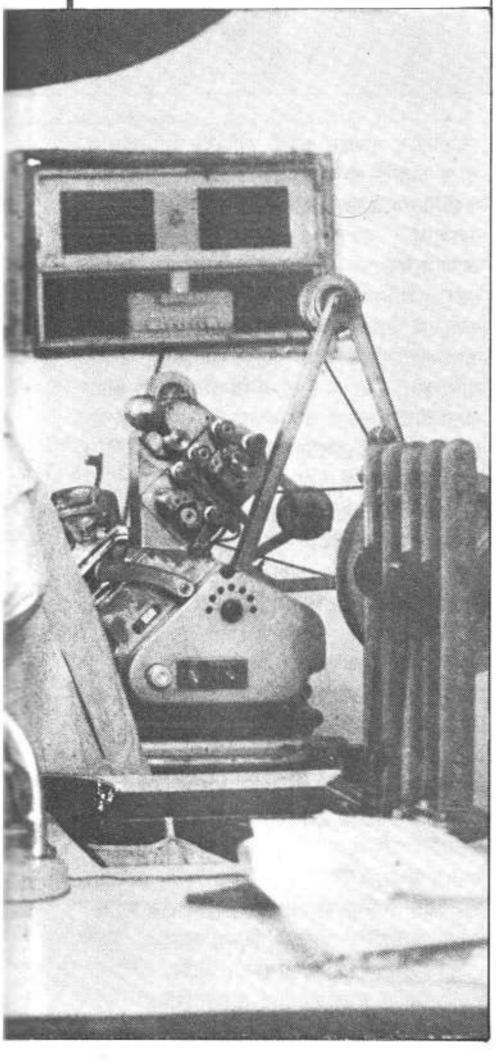
নিমাই ঘোষ

সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' থেকে তাঁর শেষতম ছবি 'আগন্তুক' পর্যন্ত চিত্রসম্পাদক হিসাবে যিনি ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী সেই **দুলাল দত্ত** বলছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা।



নিমাই ঘোষ

● **কাজই ছিল সত্যজিতের ধ্যানজ্ঞান**



বিশ্ব খ্যাতি, মানিকদার আমাকে এতকাল আঁকড়ে রাখা, এই সম্মান কি অন্য কিছু দিয়ে মাপা যায় ?

: এই দীর্ঘ বছরে সত্যজিৎবাবুকে কি সেই একই মানুষ দেখে আসছেন ?

: এক। সময় পালটেছে, পৃথিবীর কত পরিবর্তন ঘটেছে, ধাপে ধাপে মানিকদা সমস্ত বিশ্বের চোখের মণি হয়েছেন, কিন্তু মানুষটি সেই একই রয়ে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে। একটুও পালটাননি। এত খ্যাতির মধ্যেও আমাদের মানিকদা সেই ১৯৫২ সালের মানিকদাই। প্রথম দিনের মতই সেই স্নেহের পরশ, সেই সহজ সরল প্রাণখোলা। আমার কাছে তিনি এখনও 'পথের পাঁচালি'র মানিকদা।

: আপনার সম্পাদনার কাজে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি ?

: কোনদিন না। কতদিন ঘন্টার পর ঘন্টা পাশাপাশি বসে কাজ করেছি। কোনদিন তিনি কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। আলোচনা হয়েছে প্রচুর, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তই বজায় থেকেছে। বরং এমন ঘটনাও আছে, তাঁর ওপর আমার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছি এবং তিনি তা সানন্দে মেনেও নিয়েছেন। একটা ঘটনার কথা বলি।

'নায়ক' ছবিতে সেই দৃশ্যটি শর্মিলা দেবী উত্তমকুমারের সঙ্গে চলতি ট্রেনের ডাইনিং কারে বসে ইন্টারভিউ নেবার পরে, সেই লিখিত অংশটি (কাগজগুলি) শর্মিলার ছিঁড়ে ফেলার দৃশ্যে ছোট্ট একটা ইনসার্ট-এর খুব প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম আমি। মানিকদাকে সেকথা বলতেই তিনি বললেন, এখন কি করে সম্ভব ফাইনাল প্রিন্ট হয়ে গেছে। তবুও আমি অনেক কসরত করে সেই ছোট্ট ইনসার্টটা সেই দৃশ্যে জুড়ে দিতেই তিনি খুশি হয়ে বলে উঠলেন, বাঃ। একজাকটলি আমি এমন একটা ব্যাপারই চাইছিলাম।

আসলে নিজে শিল্পী ছিলেন বলেই তিনি তাঁর ইউনিটের প্রতিটি কর্মীর কাজকে, সাজেশানসকে, সেই সঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আর আমার চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি প্রায়শই এক হওয়ার কারণ দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার ফলে উভয়ের মধ্যে একটা মানসিক বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল।

: আবার এটাওতো হয়েছে, ফিলমের সম্পাদনার প্রাথমিক শিক্ষাটাই তিনি পেয়েছেন আপনার কাছ থেকে, সম্পাদনার সময় আপনার পাশে থেকে ?

: সেকথা তো তিনি মুক্তকণ্ঠে শ্যাম বেনেগালের সাক্ষাৎকারেই কবুল করেছেন। এই স্বীকৃতি থেকেই প্রমাণ, তিনি মানুষ হিসেবে কত বড় মাপের। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এমন পরিচালক প্রায় দুর্লভ। একটি ছবিকে গতিময় এবং ঘনবদ্ধ করার ক্ষেত্রে একজন সম্পাদকের কী ভূমিকা সে সম্পর্কে বোধহয় সত্যজিৎবাবুর মত আর কেউই তেমন করে ভাবেননি। ক্যামেরাম্যান, আর্ট ডিরেকটার থেকে সবাইকেই তিনি সেই সম্মান এবং গুরুত্ব দিয়েছেন

বিশ্ববিখ্যাত আলিয়া কাজান এসেছেন, জাপানের বিখ্যাত মাদাম কাওয়াকিতা এসেছেন, ইংলন্ডের মহারানী মার্গারেটের বোনের স্বামী বিখ্যাত স্টিল ফটোগ্রাফার লর্ড স্নোডন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গেও মানিকদা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন, হি ইজ মাই এডিটর।
এর চেয়ে আর বড় সম্মান কী থাকতে পারে। এবং সারা বিশ্বে ছবির টাইটেল কার্ডে আলাদা করে আমার নাম ? আমার এডিটিং দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জেমস আইভরি তো আমাকে আমেরিকায়ই নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।
: শুনেছি ছবি এডিটিং-এর সময় উনি নিজে পাশে বসে আপনার কাজ দেখতেন।
: সে সব অনেক অভিজ্ঞতা। এমনও দিন গিয়েছে যখন উনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে এডিটিং টেবিলে কাটিয়েছেন। হয়তো রাতভোর কাজ হচ্ছে, অনিলবাবুর আনা মাংস রুটি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন। একবার সামান্য খাবার এসেছে। সেই এক পাত্রের মধ্যেই সবাই রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমরা খাওয়া সেরেছি। আবার এমনও হয়েছে, সারাদিন কাজ চলছে, মানিকদা সকালে এসে ঘুরে গেছেন, আবার বিকেলে এসেছেন। এতটা বিশ্বাস আর নির্ভরতা ছিল আমার ওপর।
সেই প্রারম্ভ যুগের, 'পথের পাঁচালি'র প্রিমিয়ার শো'র সময়কার ঘটনাটা বলি। তাহলেই বুঝতে পারবেন কাজ সম্পর্কে তিনি কত সিরিয়াস ছিলেন।
হঠাৎ আমেরিকা থেকে চিঠি এল, সেখানকার মডার্ন আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে সেই মাসের (জুলাই) ৩০ তারিখে 'পথের পাঁচালি' দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তখনও ফাইনাল প্রিন্ট রেডি নেই, এডিটিংও শেষ হয়নি। অথচ চিঠি পাওয়ার পর থেকে হাতে মাত্র ১৫ দিন। ফলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। উনি অফিস থেকে ছুটি নিলেন। সারাদিন রাত এডিটিং চলল। শেষে ওঁর পায়ে ধরার মত অবস্থা হল আমার। বললাম, এত অল্প সময়ে এত কাজ সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব নয় মানিকদা।
কিন্তু তিনি তখন অন্যমানুষ। তিনি জানেন কী করে কাজ আদায় করে বা করিয়ে নিতে হয়।
শেষ পর্যন্ত সেই কাজ সম্পূর্ণ হল। কিন্তু একেবারে শেষ দিন। এবং সেই দিনই দু'টোর ফ্লাইট ধরিয়েও দেওয়া হল। ছবি আমেরিকায় গেল। কি করে জানেন ? এক রিল করে কাজ হচ্ছে আর তা সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবে চলে যাচ্ছে এবং মেহতাজীর



• অন্যান্যদের সঙ্গে দুলাল দত্ত ও সত্যজিৎ রায়

হাতের যাদুস্পর্শে তা দ্রুত ফাইনাল প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে। এমনি করেই সেদিনের বেলা দুটোর ফ্লাইট ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল 'পথের পাঁচালি' ছবিকে।
এই উদ্যমের সঙ্গে মানিকদার আর একটা দিকের কথা বলি। ছবি এডিট করার আগেই তিনি পুরো ছবিটার চিত্রনাট্যর একটা কপি করিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তাতে আমারও কাজের খুব সুবিধা হত। সিন-টু-সিন আগে থেকে পড়ে নিতাম। ফলে ছবি এডিট করার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত।

এমন দৃষ্টান্ত এই ফিল্ম লাইনে শুধু বিরল নয়, অভাবনীয়। কোন পরিচালক ছবি সম্পাদনার পূর্বে পুরো স্ক্রিপ্টটাই কোন ফিল্ম এডিটরকে দিয়েছে, এমন ঘটনা আমার অন্তত জানা নেই। বরং এমন অভিজ্ঞতাও আছে, স্ক্রিপ্ট দূরে থাক, ছবির গল্পটা কি তাই ভাল করে জানি না, ছবি এডিট করে গেলাম। শেষ পর্যন্ত ছবি না উৎরোলে তখন এডিটরের দোষ।
এবার মানিকদা মানুষটি কেমন ছিলেন, সহকর্মীদের প্রতি তাঁর কতটা রেসপেক্ট ছিল, তার একটা ঘটনা বলি।
একবার এক নামকরা স্টিল ফটোগ্রাফার এলেন ছবি তুলতে এডিটিং রুমে। তখন মানিকদার ছবির এডিটিং চলছিল। মেশিনের সামনে আমি দাঁড়িয়ে মানিকদার সঙ্গে জরুরী কথা বলছি। হঠাৎ সেই ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক (নামটা আর নাইবা বললাম। বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না) আমায় বললেন, আপনি একটু সরে যান তো ? মানিকদা নিজে তাঁর ছবি এডিট করছেন, এমন একটা ছবি তুলবো।
তারপর মানিকদাকে হেসে বললেন, মানিকদা, মেশিন থেকে কিছুটা ফিল্ম বের করে এমন ভাবে ধরুন যাতে বোঝা যাচ্ছে যেন আপনিই সেটা এডিট করছেন। আমি তার ছবি তুলে নেবো।
আমাকে ঐভাবে সরিয়ে দেওয়ায় আমার তখন এমন অপমান বোধ হল যে মুহূর্তে চোখে জল এসে গেল।
কিন্তু মানিকদা প্রথমটা বিস্মিত দৃষ্টিতে চোখ তুললেন, পরক্ষণে সেই ফটোগ্রাফারকে চমকে দিয়ে একটু কড়া সুরেই বলে উঠলেন, কেন, আমি কি ফিল্ম এডিটর যে ঐভাবে ছবি তুলতে দেবো ? এডিটর তো দুলাল।
মানিকদার সেই কথা শুনে সেদিন আমি আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলাম।
ঘটনাটা ঘটেছিল 'সীমাবদ্ধ' ছবি এডিট করার সময়।
শুধু এই ? বিদেশী জ্ঞানীগুণীরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ফিল্ম সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। উনি বলতেন, এর অনেকটাই প্রাপ্য ফিল্ম



নিমাই ঘোষ

এডিটরের। বলেই তিনি তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতেন মাই এডিটর দুলাল দত্ত।

এমন মানুষকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাবার কথা কল্পনাই করতে পারি না। মানিকদার ঋণও আমি কখনও শেষ করতে পারব না। আমার বাড়ি গাড়ি খাওয়া পড়া সব উনি।

কখনও উনি 'আপনি' ছাড়া সম্বোধন করেননি। আমি অসুস্থ থাকলে উনি কাজ বন্ধ রেখেছেন।

আমার মা মারা যাবার সময় উনি খবর পেয়েই লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ওই কাজ বন্ধ রাখার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি।

আমি তখন বোম্বেতে। একরকম জোর করেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সত্যেনদার একটা ছবির কাজের জন্য। মাস দেড়েকের মাথায় খবরের পর খবর, চলে আসুন, ছবি রেডি।

তবু সেই কাজ শেষ করতে করতে সামান্য দেরী হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পয়লা মে সেই কাজ শেষ হল। পরের দিনই সকালের ফ্লাইট ধরে কলকাতা চলে এলুম। তারপর সোজা মানিকদার বাড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, হঠাৎ মানিকদার মা রান্নাঘর থেকে আমায় দেখেই খুশীতে বলে উঠলেন, দুলাল কবে আইছ।

আমি বললাম, আজ সকালেই।

উনি খুশি হয়ে বললেন, ভাল দিনেই আইছ।

হঠাৎ খেয়াল হল আজ মানিকদার জন্মদিন। উত্তেজনায় সেটা ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম।

তখনই জানলাম, ওপরের ঘরে তাকে ঘিরে বিদেশীদের ভীড়। এই সময় মানিকদাকে ডিস্টার্ব করা ঠিক নয় ভেবে ফিরে আসছি, মা বললেন, খোকার জন্মদিন, আর তুমি কিছু মুখে না দিয়া ফিরা যাইবা ?

বলতে না বলতেই মণিদি আমার হাতে দু'টো গরম চপ গুঁজে দিলেন।

পরদিন মানিকদার সঙ্গে দেখা হতেই উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আপনি এসে গ্যাছেন ? যাক, ধড়ে প্রাণ এল।

ছবিটা ছিল 'জলসাঘর'। সেটা ১৯৫৮ সালের কথা।

: 'পথের পাঁচালি' ছবির শুরুটা আপনার মনে আছে ?

: ওইতো, সেই অপু-দুর্গার আখ খেতে খেতে কাশফুলে ছাওয়া খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে রেল গাড়ি দেখতে যাবার সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি দিয়েই তো উনি ছবির কাজ শুরু করেন। চারশো ফুট ছবি তোলা হয়েছিল। সেই টুকুর প্রজেকশন দেখেই মানিকদার সে কী খুশীর উত্তেজনা।

আর পুরো ছবিটা এডিট করার সময় আমার কী অবস্থা হয়েছিল, তা আর মুখে কী বলব। আমার কাছে যেন সেদিন ছবির জগৎটাই আমূল পাল্টে গিয়েছিল।

: ওঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা !

: অনেক। আমি বিপরীতটাই বলি।

একবার এক নাম করা দম্পতির ছবিতে কাজ করছি, এমন সময় মানিকদার একটু প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমায়। আমি সেকথা বলতেই সেই পরিচালক ভদ্রলোক রূঢ় স্বরে আমায় বললেন, ঐ সত্যজিৎ-ফত্যজিৎ আমি বুঝি না। আমার কাজ শেষ করে তবে যাবেন। অন্য এক তখনকার পপুলার ডিরেকটরের ছবির দশ ভাগ করে তো আমি সেই কাজ ছেড়েই দিলুম মানিকদার সম্পর্কে কটু মন্তব্য করার জন্য।

এমন ঘটনা কত বলব ! আজ আর আমার কিছুই হারাবার নেই। তাই বলি। কত প্রডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটার, ডিরেকটার যে বলেছেন, 'ও মশাই, রাখুন আপনাদের সত্যজিৎ রায়। আপনারাই তাকে মাথায় করে রাখুন', তার হিসেব নেই। তাদের মধ্যেই অনেকে আবার মানিকদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন পরবর্তীকালে পরিস্থিতি পালটাতে।

আর একটা কথাও বলি। মানিকদাকে টেক্কা দিতে গিয়ে ছবি নষ্ট করেছেন, এমন মানুষের ঘটনাই কি কম আছে ? ফিলম সোসাইটি মুভমেন্ট যদি না হত, তা হলে কি এমন টেক্কা দেবার প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটত ?

একটা ঘটনা বলি। সিকিমের ওপর যে ডকুমেন্টারী ছবি তোলা হয়েছিল, সেটা সম্পাদনার সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। তখন গরমকাল। তাই গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মানিকদার সহকারী পুনু অর্থাৎ রমেশ সেন ঘরের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, উঃ কি গরম। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না।

মানিকদা আমার পাশের চেয়ার থেকে কখন উঠে গেছেন খেয়াল করিনি। যখন খেয়াল হল, দেখি মানিকদা পুনুর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও উঠে একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম পুনুর কাছে।

দেখলাম পুনু জানালার সোজাসুজি এক বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো কয়েকটি উচ্ছ্বল কিশোরীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

আর মানিকদা তাই দেখে বলছেন, কি পুনু, গাছের পাতা নড়ছে না, তাই না ? আর এই কথা শুনে পেছন ফিরে মানিকদাকে দেখেই মুহূর্তে লজ্জায় লাল হয়ে গেল পুনুর মুখ।

এই প্রসঙ্গে মানিকদার স্মরণশক্তির একটা ঘটনা বলি।

বহু বছর আগে দার্জিলিং মেল-এ এক বৈরাগীর গান শুনেছিলেন মানিকদা। 'তিনকন্যা' ছবি তৈরি করার সময় তাঁর হঠাৎ মনে হল সেই বৈরাগীকেই এই ছবির একটি চরিত্রের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। ঠিক সেই মানুষটি : অনেক সময় দেখা গেছে মানিকদার অতি স্নেহভাজন শক্তিমান কোন শিল্পীকে সুযোগ না দিয়ে তিনি একেবারে নতুন বা অল্পখ্যাত কোন শিল্পীকে এনে সেই চরিত্রটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই অরিজিনালিটির প্রতি চিরকালের ঝোঁক।

সত্যজিৎবাবু যে আর একটা ছবি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সে সম্পর্কে তো আপনি সবই জানেন।

হ্যাঁ। অবশ্যই। গত জানুয়ারীতেই সে সম্পর্কে কথাবার্তা হল। উনি বললেন, সব রেডি। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুটিং শুরু করার কথা ছিল। তার জন্যে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোর বুক করাও হয়ে গিয়েছিল।

বলতে বলতে ছোটখাটো মানুষটির চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল।

সত্যজিৎ ঃ তথ্যপঞ্জী



সত্যজিৎ রায় সম্ভবত সেই বিরল ভারতীয় যিনি স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁর কৃতিত্বের জন্য একাধিকবার সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। এই তথ্যপঞ্জীতে যেমন রয়েছে তাঁর কর্মময় জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনই রয়েছে তাঁর পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্তির তালিকা। এই তথ্যপঞ্জীর সংকলক **কমলেন্দু সরকার।**



নিমাই ঘোষ

১৯২১ : উত্তর কলকাতার ১০০ গড়পার রোডে জন্মগ্রহণ করেন সত্যজিৎ রায়। তখন নাম ছিল প্রসাদ। বাবা—সুকুমার রায়, মা—সুপ্রভা রায়।

১৯২৩ : ২ মে (বাংলা ১৯ বৈশাখ, ১৩৩০) বুধবার এক শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রসাদ নামের পরিবর্তে সত্যজিৎ নাম রাখা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর কালাজ্বরে মৃত্যু হয় সুকুমার রায়ের।

১৯২৫ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয়। এই কোম্পানির গুডউইল কিনে নেন করুণাবিন্দু বিশ্বাস।

১৯২৬ : গড়পার রোড থেকে সুপ্রভা দেবী পুত্র সত্যজিৎকে নিয়ে চলে আসেন বেলতলা রোডে ভাই প্রশান্তকুমার দাসের বাড়িতে।

১৯৩০ : সত্যজিৎ রায় আট বছর ছ'মাস বয়সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে।

১৯৩৬ : ফোটোগ্রাফির জন্য 'বয়েজ ওন পত্রিকা'র প্রথম পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিষয়—অর্থনীতি। এই সময় থেকেই সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়।

১৯৪০ : গ্রাজুয়েট হবার পর ১৩ জুলাই চলে যান শান্তিনিকেতনে। ভর্তি হন কলাভবনে।

১৯৪১ : সহপাঠীদের সঙ্গে সাঁচী, খাজুরাহো, অজন্তা ইলোরায় যান শিক্ষামূলক ভ্রমণে। প্রথম গল্প 'অ্যাবস্ট্রাকশন' (ইংরেজি) প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ : কলাভবনের পড়াশুনো শেষ না করেই ফিরে আসেন কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে!

১৯৪৩ : এপ্রিল মাসে ডি জে কীমার বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভিসুয়ালাইজারের পদে যোগ দেন। সিগনেট প্রেসের ডি কে গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় হয়। বইয়ের মলাট আঁকা শুরু করেন। 'মৌচাক' পত্রিকায় সত্যজিতের আঁকা ছবি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ : চিত্রনাট্য লেখা শুরু করেন। এই সময় 'ঝিন্দের বন্দী' সহ কয়েকটি চিত্রনাট্য তৈরি করেন।

১৯৪৫ : 'আম আঁটির ভেঁপু' বইটির ছবি আঁকেন সত্যজিৎ।

১৯৪৬ : 'ঘরে বাইরে'-এর চিত্রনাট্য তৈরি করেন। হরিসাধন দাশগুপ্তর ছবিটি পরিচালনা করবার কথা ছিল।

১৯৪৭ : ৫ অক্টোবর হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, রাম হালদার এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত মিলে

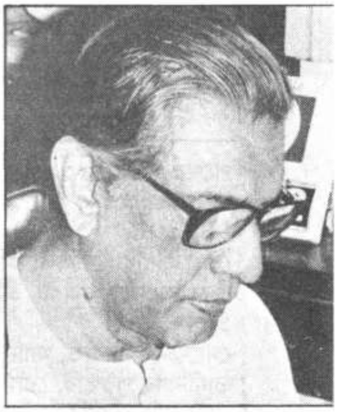
গঠন করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি।
১৯৪৮ : মা সুপ্রভা দেবীকে নিয়ে চলে যান লেক অ্যাভেনিউয়ের এক বাড়িতে। এই সময় থেকেই চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখার শুরু। প্রথম লেখা 'হোয়াট ইজ রং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস' প্রকাশিত হয় স্টেটসম্যান দৈনিকে। হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত একটি বিজ্ঞাপনের ছবির চিত্রনাট্য করেন তিনি। ছবির নাম—অ্যা পারফেক্ট ডে।
১৯৫০ : জাঁ রেনোয়া কলকাতায় আসেন 'দ্য রিভার' ছবির জন্য। রেনোয়ার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং সত্যজিৎ রায় কাজ দেখেন এই ফরাসি পরিচালকের। 'রেনোয়া ইন ক্যালকাটা' লেখাটি প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ পত্রিকা 'সিকোয়েন্স'-এ। ডি জে কীমার-এর আর্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন তিনি। বিদেশ যাত্রা। এই সময় বিলেতে গিয়ে প্রায় একশোটির মতো ছবি দেখেন। প্যারিস ও ভেনিসেও যান। ডি জে কীমার থেকে পদত্যাগ করেন। বেনসন্স এজেন্সিতে যোগ দেন। আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রদর্শনীতে 'খাইখাই' আর 'অনন্যা' গ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্য পুরস্কার পান সত্যজিৎ রায়।
১৯৫১ : কলকাতায় আসেন রুশ পরিচালক পুদভকিন এবং অভিনেতা চেরকাসভ। সত্যজিতের অনুরোধে 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে ওঁরা বক্তৃতা দেন। 'পথের পাঁচালী' ছবি করার জন্য ঠিক করেন তিনি।
১৯৫২ : 'পথের পাঁচালী' ছবির শুটিং শুরু করেন অক্টোবর মাসে। মার্কিন চিত্রপরিচালক জন হিউস্টন কলকাতায় আসেন। তিনি তখন 'পথের পাঁচালী'র রাশ প্রিন্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।
১৯৫৩ : পুত্র সন্দীপ-এর জন্ম হয় ৮ সেপ্টেম্বর।
১৯৫৫ : নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ 'পথের পাঁচালী' প্রথম দেখানো হয়। কলকাতায় মুক্তি পায় ২৬ আগস্ট। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে তরুণ সাহিত্যিকরা সত্যজিৎ এবং তাঁর শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জানান।
১৯৫৬ : কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ মানবিক আবেগসম্পন্ন চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মানলাভ করে। ১১ অক্টোবর দ্বিতীয় ছবি 'অপরাজিত' মুক্তি পায়।
১৯৫৭ : ভেনিস যান। ২৩ সেপ্টেম্বর রনজি স্টেডিয়ামে সত্যজিৎকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
১৯৫৮ : নিউ ইয়র্ক যান। ব্রাসেলস-এ বিশ্বের সেরা সাতজন পরিচালকের দশটি সেরা ছবি নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বিচারক।
১৯৫৯ : সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী পান সত্যজিৎ।
১৯৬০ : ভিয়েনা ফিল্মোৎসবে বিচারক। নভেম্বর মাসে মৃত্যু হয় মা সুপ্রভা দেবীর।
১৯৬১ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু করেন। লিয়রের ছড়া অবলম্বনে প্রথম লেখা 'পাপাঙ্গুল'। প্রথম শঙ্কুর গল্প প্রকাশিত হয়। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হন।
১৯৬৩ : 'টাইম' পত্রিকার মতে বিশ্বের সেরা এগারোজন চিত্রপরিচালকের মধ্যে অন্যতম।
১৯৬৪ : বার্লিন এবং মস্কো যাত্রা।
১৯৬৫ : নভেম্বর মাসে প্রথম বাংলা বই 'প্রোফেসর শঙ্কু' প্রকাশিত হয়। দিল্লিতে ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। পদ্মভূষণ হন। প্রথম ফেলুদা সিরিজের গল্প প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকায়।
১৯৬৬ : বার্লিন ও টোকিও যাত্রা।
১৯৬৭ : নিউ ইয়র্ক, প্যারিস এবং লন্ডন যাত্রা। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য হিসেবে 'প্রোফেসর শঙ্কু' গ্রন্থটি পুরস্কার পায়।
১৯৬৮ : ম্যানিলা যাত্রা। মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি।
১৯৬৯ : বার্লিন ও টিউনেসিয়া যাত্রা। সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ফেলুদার বই 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত হয়।
১৯৭০ : বার্লিন যাত্রা।
১৯৭১ : তেহরান চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক।
১৯৭২ : টরেন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক।

১৯৭৫ : ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।
১৯৭৭ : ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি।
১৯৮০ : 'পথের পাঁচালী'র পঁচিশ বছর উপলক্ষে ডি এ ভি পি-র উদ্যোগে সারা বছরব্যাপী ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় বাঙ্গালোরে।
১৯৮১ : নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অব মর্ডার্ন আর্ট-এ ফিল্ম ইন্ডিয়া উৎসবের প্রথম পর্যায়ে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী।

১৯৮২ : ২৫ এপ্রিল 'সদগতি' ছবিটি দিয়ে ভারতীয় দূরদর্শনে রঙিন ছবি সম্প্রচার শুরু হয়। ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যতম বিচারক।
১৯৮৩ : ১ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হন।
১৯৮৪ : ১২ জুন চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯ জুন হিউস্টনে বিশ্ববিখ্যাত সেন্ট লিউকস হাসপাতালে বাইপাস হার্ট অপারেশন হয়। ২১ জুলাই প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন হয়। কলকাতায় ফেরেন ১৪ আগস্ট।

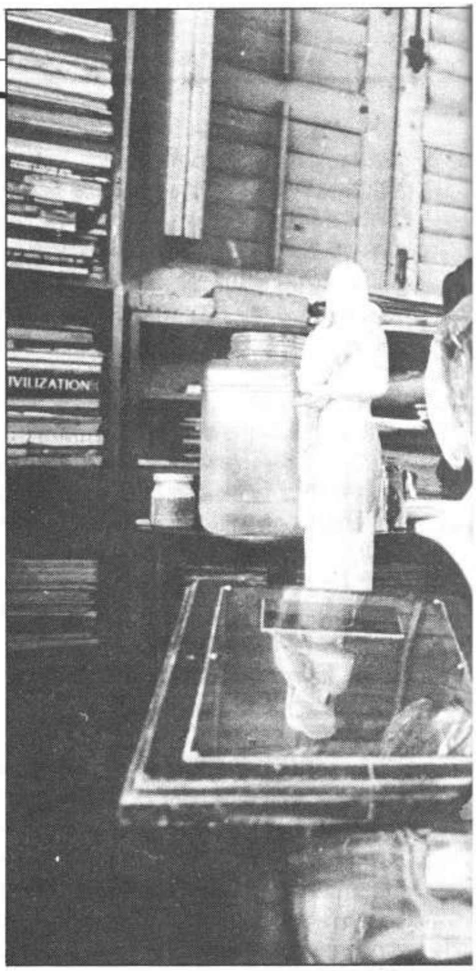
১৯৮৯ : ডিসেম্বর মাসে পুত্র সন্দীপের বিবাহ।
১৯৯০ : ২২ নভেম্বর নাতি সৌরদীপের জন্ম।
১৯৯১ : বেলজিয়াম থেকে 'সত্যজিৎ রায় অ্যাট সেভেন্টি' শ্রদ্ধার্ঘ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। নতুন ছবির চিত্রনাট্য শেষ করেন।

১৯৯২ : ২৭ জানুয়ারি, সোমবার, অসুস্থতার জন্য ভর্তি করা হয় বেলভিউ নার্সিংহোমে। ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ৫-৪৫ মিনিটে মৃত্যু হয়।







পুরস্কার ও সম্মান

সত্যজিৎ রায় : ছবির জন্য পুরস্কার
কাহিনী চিত্র

পথের পাঁচালী (১৯৫৫)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক, ভারত, ১৯৫৫।
শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল, কান, ১৯৫৬।
ডিপ্লোমা অফ মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৫৬।
গোল্ডেন কারবাও, ম্যানিলা, ১৯৫৬।
ভ্যাটিকান পুরস্কার, রোম, ১৯৫৬।
শ্রেষ্ঠ ছবি ও পরিচালনা, সান ফ্রান্সিসকো ১৯৫৭।
সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৫৭।
শ্রেষ্ঠ ছবি, ভ্যাঙ্কুবার, কানাডা, ১৯৫৮।
সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি, স্টাটফোর্ড, কানাডা ১৯৫৮।
শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, আফ্রো আর্টস থিয়েটার, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯।
শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপিয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৬।
শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, কিনিমা জামপো পুরস্কার, টোকিও, ১৯৬৬।
অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

অপরাজিত (১৯৫৬)
গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্মোৎসব, ১৯৫৭।
সিনেমা ন্যুভো, ভেনিস, ১৯৫৭।
সমালোচকদের পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৫৭।
সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি ও পরিচালনা, সানফ্রান্সিসকো, ১৯৫৮।
১৯৫৮-১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবির জন্য গোল্ডেন লরেল, আমেরিকা, ১৯৫৮।
সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬০।
শ্রেষ্ঠ অ-ইউরোপিয় ছবি হিসেবে বদিল পুরস্কার, ডেনমার্ক, ১৯৬৭।
অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

জলসাঘর (১৯৫৮)
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৫৮।
সঙ্গীতের জন্য রৌপ্যপদক, মস্কো, ১৯৫৯।

অপুর সংসার (১৯৫৯)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৫৯।
শ্রেষ্ঠ মৌলিক এবং আবেগপ্রবণ ছবি হিসেবে সাদারল্যান্ড পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।
ডিপ্লোমা অফ মেরিট, এডিনবার্গ, ১৯৬০।
১৯৬০-র শ্রেষ্ঠ বিদেশি ছবি, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ অফ মোশন পিকচারস, আমেরিকা, ১৯৬০।
অপু-ত্রয়ীর প্রতিটির জন্য উইংটন পুরস্কার, লন্ডন, ১৯৬০।

দেবী (১৯৬০)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬০।

তিনকন্যা (১৯৬১)
সমাপ্তি-র জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত ১৯৬১।
সমাপ্তি ও পোস্টমাস্টারের জন্য মেলবোর্ন ট্রফি : গোল্ডেন বুমেরাং (গ্রাঁ পি), মেলবোর্ন, ১৯৬২।
সেলজনিক গোল্ডেন লরেল, বার্লিন, ১৯৬৩।

অভিযান (১৯৬২)
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬২।

মহানগর (১৯৬৩)
সার্টিফিকেট অফ মেরিট, ভারত, ১৯৬৩।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৪।

চারুলতা (১৯৬৪)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৪।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে রৌপ্য ভালুক, বার্লিন, ১৯৬৫।
ক্যাথলিক পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৫।
শ্রেষ্ঠ ছবি, আকাপুলকো, মেক্সিকো, ১৯৬৫।

নায়ক (১৯৬৬)
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৬৬।
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য ও কাহিনী, ভারত, ১৯৬৬।
বিশেষ জুরি পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬।
ইউনিক্রিট সমালোচকদের প্রদত্ত পুরস্কার, বার্লিন, ১৯৬৬।

চিড়িয়াখানা (১৯৬৭)
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৭।

গুপী গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৯)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬৯।
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৬৯।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সিলভার ক্রস পুরস্কার, অ্যাডিলেড, ১৯৬৯।
শ্রেষ্ঠ মৌলিক ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অকল্যান্ড, ১৯৬৯। মেরিট অ্যাওয়ার্ড, টোকিও, ১৯৭০।
শ্রেষ্ঠ ছবি, মেলবোর্ন, ১৯৭০।

প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০)
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭০।
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি, ভারত, ১৯৭০।
বিশেষ পুরস্কার, ভারত, ১৯৭০।

সীমাবদ্ধ (১৯৭১)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপ্রদক, ভারত, ১৯৭২।
এফ আই পি আর ই এস সি আই (চলচ্চিত্র সমালোচকদের) পুরস্কার, ভেনিস, ১৯৭২।

অশনি সংকেত (১৯৭৩)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭৩।
শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, ভারত, ১৯৭৩।
গোল্ডেন হুগো, শিকাগো, ১৯৭৩।
শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য স্বর্ণ ভালুক, বার্লিন, ১৯৭৪।

সোনার কেল্লা (১৯৭৪)
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, ভারত, ১৯৭৪।
শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, ভারত, ১৯৭৪।
শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৪।
শিশু ও কিশোরদের জন্য শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র, গোল্ডেন স্ট্যাচু পুরস্কার, তেহরান, ১৯৭৫।

জন অরণ্য (১৯৭৫)
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, ভারত, ১৯৭৫।
শ্রেষ্ঠ ছবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫।
শ্রেষ্ঠ পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫।
শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৫।
কার্লোভি ভ্যারি পুরস্কার, ১৯৭৬।

শতরঞ্জ কে খিলাড়ি (১৯৭৭)
শ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি, ভারত, ১৯৭৭।

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮)



শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র, ভারত; ১৯৭৮
বিশেষ পুরস্কার, সাইপ্রাস ফিল্মোৎসব ১৯৮০, গোল্ডেন হুগো, শিকাগো ১৯৭৯।

হীরক রাজার দেশে (১৯৮০)
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, ভারত, ১৯৮০।

ঘরে বাইরে (১৯৮৪)
বিশেষ স্বর্ণপদক, দামাস্কাস চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৮৫ জাতীয় পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, শ্রেষ্ঠ পোশাক পরিকল্পনা ও শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতার পুরস্কার, ১৯৮৪।

গণশত্রু (১৯৮৯)
শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি, ভারত, ১৯৮৯।

আগন্তুক (১৯৯১)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, সেরা ছবি, ভারত, ১৯৯২।
রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, সেরা পরিচালক, ভারত, ১৯৯২।

তথ্যচিত্র

রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৬১।
শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে গোল্ডেন শীল, লোকার্নো, ১৯৬১।

দ্য ইনার আই (১৯৭২)
রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, ভারত, ১৯৭২

সত্যজিৎ রায় : ব্যক্তিগত পুরস্কার ও সম্মান

১৯৫৭ রঞ্জি স্টেডিয়ামে নাগরিক সংবর্ধনা।
১৯৫৮ পদ্মশ্রী।
১৯৫৯ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার।
১৯৬০ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকা শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
১৯৬১ বার্লিন ফিল্মোৎসবে বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান।
১৯৬৩ 'টাইম' পত্রিকার মতে বিশ্বের সেরা এগারোজন পরিচালকের অন্যতম।
১৯৬৫ পদ্মভূষণ।
১৯৬৬ স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ড অফ অনার, বার্লিন ফিল্মোৎসব।
১৯৬৭ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ম্যানিলা।
১৯৭১ স্টার অফ যুগোস্লাভিয়া।
আনন্দ পুরস্কার (সাহিত্য)
১৯৭৩ ডি লিট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৭৪ ডি লিট, রয়াল কলেজ অফ আর্টস, লন্ডন।
এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থে নাম নথীভুক্ত।
১৯৭৬ পদ্মবিভূষণ, ভারত।
দেশিকোত্তম, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন (এটি দেওয়া হয় ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)।
১৯৭৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নর্টন লেকচারস' দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত।
১৯৭৮ ডি লিট, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশেষ পুরস্কার, বার্লিন ফিল্মোৎসব।
১৯৭৯ বিশেষ পুরস্কার, মস্কো ফিল্মোৎসব।
১৯৮০ ডি লিট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
ডি লিট, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৮১ শিশিরকুমার পুরস্কার (শিশু সাহিত্য)।
ডি লিট, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।
ডি লিট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯৮২ হোমেজ অফ সত্যজিৎ রে, কান ফিল্মোৎসব।
স্পেশ্যাল গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক, ভেনিস ফিল্মোৎসব।
বিদ্যাসাগর পুরস্কার (শিশু সাহিত্য)।
১৯৮৩ ফেলোশিপ অফ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট।
১৯৮৫ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ভারত।
ডি লিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার।
১৯৮৬ সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলোশিপ।
কলকাতা পুরসভা কর্তৃক নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৮৭ লেজিয়ঁ দ'নর, ফ্রান্স।
দাদাভাই নওরজি মেমোরিয়াল পুরস্কার।
'টিনটোরেটোর যীশু' গ্রন্থটির জন্য শিশু সাহিত্য পুরস্কার, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ ট্রেনিং, ভারত।
১৯৮৯ সেরা বিদেশি ছোটগল্পের জন্য পুরস্কার, এফ এন এ সি এস, ফ্রান্স।
শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পুরস্কার, অসম সরকার।
১৯৯০ শিরোমণি পুরস্কার, এশিয়ান পেন্টস।
১৯৯১ ৭০তম জন্মদিনে নিউইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এর চলচ্চিত্র বিভাগ একটি ফলক উপহার দেন।
বিশেষ সম্মান, টোকিও চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি, সত্যজিৎ রায় রেট্রোসপেকটিভ এবং সত্যজিৎ বিষয়ক আলোকচিত্রের প্রদর্শনী, কান চলচ্চিত্র উৎসব।
১৯৯২ সাম্মানিক অস্কার পুরস্কার।
জাতীয় অধ্যাপক। কুরোসাওয়া পুরস্কার।
কলকাতা প্রেস ক্লাব কর্তৃক আজীবন সদস্য পদ দান।
ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন'।

চলচ্চিত্র পঞ্জী

কাহিনীচিত্র

পথের পাঁচালী (১৯৫৫)। সাদা-কালো

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : রবিশংকর
অভিনয় : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চুণীবালা দেবী, রুনকি বন্দ্যোপাধ্যায়, উমা দাশগুপ্ত, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২৬ আগস্ট ১৯৫৫
প্রেক্ষাগৃহ : বসুশ্রী, বীণা, ছায়া, শ্রী
পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস করপোরেশন

অপরাজিত (১৯৫৬), সাদা-কালো

প্রযোজনা : এপিক ফিল্মস কলকাতা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : রবিশংকর
অভিনয় : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত, সমীরণ ঘোষাল, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ
মুক্তির তারিখ : ১১ অক্টোবর ১৯৫৬
প্রেক্ষাগৃহ : বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী
পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস করপোরেশন

পরশ পাথর (১৯৫৭), সাদা-কালো

প্রযোজনা : এল বি ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : পরশুরাম
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : রবিশংকর
অভিনয় : তুলসী চক্রবর্তী, রানিবালা দেবী, কালি ব্যানার্জি, গঙ্গাপদ বসু, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ
মুক্তির তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৮
প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, প্রাচী, পূর্ণ
পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস করপোরেশন

জলসাঘর (১৯৫৮), সাদা-কালো

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : ওস্তাদ বিলায়েৎ খান
অভিনয় : ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী লাহিড়ী, রোশন কুমারী, বেগম আখতার, ওস্তাদ ওয়াহিদ খান প্রমুখ
মুক্তির তারিখ : ১০ অক্টোবর, ১৯৫৮
প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, পূর্ণ, প্রাচী
পরিবেশক : অরোরা ফিল্মস করপোরেশন

অপুর সংসার (১৯৫৯), সাদা-কালো

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : রবিশংকর
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, স্বপন মুখোপাধ্যায়, অলোক চক্রবর্তী প্রমুখ
মুক্তির তারিখ : ১ মে ১৯৫৯
প্রেক্ষাগৃহ : রূপবাণী, অরুণা, ভারতী
পরিবেশক : ছায়াবাণী।

তিনকন্যা (১৯৬১), সাদা-কালো

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ছোটগল্প : মণিহারা, পোস্টমাস্টার ও সমাপ্তি
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : কালি ব্যানার্জি, কণিকা মজুমদার (মণিহারা), অনিল চট্টোপাধ্যায়, চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় (পোস্টমাস্টার), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দাশগুপ্ত, সীতা দেবী, গীতা দে (সমাপ্তি) প্রমুখ
মুক্তির তারিখ : ৫ মে ১৯৬১
প্রেক্ষাগৃহ : রূপবাণী, অরুণা, ভারতী। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবর্ষ উপলক্ষে ভারতের অন্যান্য স্থানে একসেলসিয়ার থিয়েটার (বম্বে), মিনার্ভা টকিজ (মাদ্রাজ), লিবার্টি (বাঙ্গালোর), চৌধুরী টকিজ (গৌহাটি) এবং লন্ডনের ন্যাশনাল থিয়েটারে মুক্তি পায়।
পরিবেশক : ছায়াবাণী



• কাঞ্চনজঙ্ঘা

দেবী (১৯৬০), সাদা-কালো

প্রযোজনা : সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
সঙ্গীত : আলি আকবর খান
অভিনয় : ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর
মুক্তির তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০
পরিবেশক : জনতা পিকচার্স অ্যান্ড থিয়েটার্স

কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), রঙিন

প্রযোজনা : এন সি এ প্রোডাকশন, কলকাতা
কাহিনী, চিত্রনাট্যকার, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : ছবি বিশ্বাস, অলকানন্দা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, এন বিশ্বনাথন প্রমুখ।

মুক্তির তারিখ : ১১ মে ১৯৬২
প্রেক্ষাগৃহ : রূপবাণী, অরুণা, ভারতী
পরিবেশক : শ্রীজগন্নাথ পিকচার্স

অভিযান (১৯৬২), সাদা-কালো

প্রযোজনা : অভিযাত্রিক
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ওয়াহিদা রহমান, রুমা গুহঠাকুরতা, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬২
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা
পরিবেশক : ছায়ালোক

মহানগর (১৯৬৩), সাদা-কালো

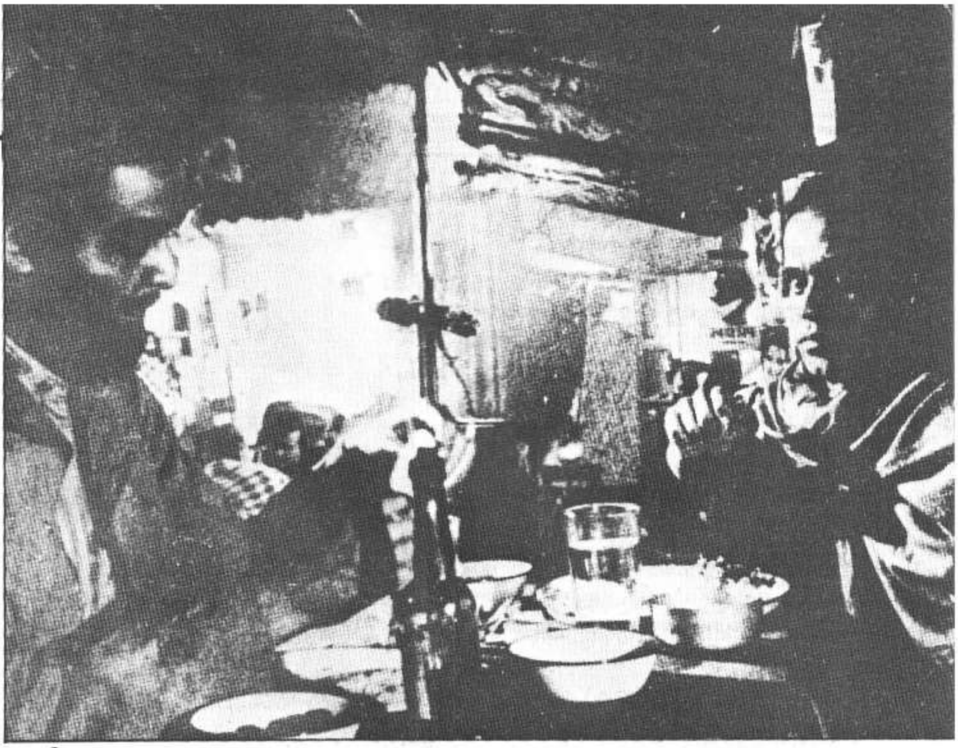
প্রযোজনা : আর ডি বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, জয়া ভাদুড়ি, ভিকি রেডউড হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা
পরিবেশক : আর ডি বনশল

চারুলতা (১৯৬৪), সাদা-কালো

প্রযোজনা : আর ডি বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নষ্টনীড় অবলম্বনে)
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতালি প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ১৭ এপ্রিল ১৯৬৪
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা, অশোকা
পরিবেশক : আর ডি বনশল

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ (১৯৬৫), সাদা-কালো

প্রযোজনা : আর ডি বনশল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র (কাপুরুষ) ও পরশুরাম (মহাপুরুষ)
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী



• অভিযান

মুখোপাধ্যায় (কাপুরুষ), চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ (মহাপুরুষ) প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ৭ মে ১৯৬৫
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা
পরিবেশক : আর ডি বনশল

নায়ক (১৯৬৬), সাদা-কালো

প্রযোজনা : আর ডি বনশল
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সুব্রত মিত্র
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, সুমিতা সান্যাল, কামু মুখার্জি, রঞ্জিত বোস প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ৬ মে ১৯৬৬
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা
পরিবেশক : আর ডি বনশল

চিড়িয়াখানা (১৯৬৭), সাদা-কালো

প্রযোজনা : স্টার প্রোডাকশন
চিত্রনাট্য, গীতিকার, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : উত্তমকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, গীতালি রায়, শ্যামল ঘোষাল প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭
প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, পূর্ণ, অরুণা
পরিবেশক : বলাকা পিকচার্স

গুপী গাইন বাঘা বাইন (১৯৬৯), আংশিক রঙিন

প্রযোজনা : পূর্ণিমা পিকচার্স
চিত্রনাট্য, গীতিকার, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, জহর রায়, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ৮ মে ১৯৬৯ (বৃহস্পতিবার)
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর, গ্লোব (ইংরেজি সাবটাইটেল)
পরিবেশক : পিয়ালী ফিল্মস

অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০), সাদা-কালো

প্রযোজনা : নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জ, শর্মিলা ঠাকুর, কাবেরী বসু, পাহাড়ী সান্যাল, সিমি প্রমুখ ।
মুক্তির তারিখ : ১৬ জানুয়ারি ১৯৭০
প্রেক্ষাগৃহ : দর্পণা, ইন্দিরা
পরিবেশক : পিয়ালী

প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০), সাদা-কালো

প্রযোজনা : নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়, কৃষ্ণা বসু, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ।

মুক্তির তারিখ : ২৯ অক্টোবর ১৯৭০ (বৃহস্পতিবার)
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর
পরিবেশক : পিয়ালী

সীমাবদ্ধ (১৯৭১), সাদা-কালো

প্রযোজনা : ভরত শমসের রাণা
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : শংকর
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : বরুণ চন্দ, পারমিতা চৌধুরী, শর্মিলা ঠাকুর
মুক্তির তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা, নবীনা
পরিবেশক : পিয়ালী

অশনি সংকেত (১৯৭৩), রঙিন

প্রযোজনা : সর্বাণী ভট্টাচার্য
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ববিতা, সন্ধ্যা রায়, ননী গাঙ্গুলী প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ১৫ আগস্ট, ১৯৭৩ (বুধবার/ করমুক্ত)
প্রেক্ষাগৃহ : সুচিত্রা, শ্যামশ্রী, অলকা। ১৬ আগস্ট থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর
পরিবেশক : বলাকা মুভিজ

সোনার কেল্লা (১৯৭৪), রঙিন

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কুশল চক্রবর্তী প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪ (করমুক্ত)
প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, মিনার্ভা, বীণা, বসুশ্রী
পরিবেশক : ছায়াবাণী

জন অরণ্য (১৯৭৫), সাদা-কালো

প্রযোজনা : সুবীর গুহ
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : শংকর
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়, পূর্ণেন্দু বসু
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, গৌতম চক্রবর্তী, আরতি ভট্টাচার্য প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর
পরিবেশক : ইন্দাস ফিল্মস



• শতরঞ্জ কে খিলাড়ী

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী (১৯৭৭), রঙিন

প্রযোজনা : সুরেশ জিন্দাল
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : প্রেমচন্দ
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সঞ্জীব কুমার, আমজাদ খান, শাবানা আজমী, সৈয়দ জাফরি, রিচার্ড অ্যাটেনবরো প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
প্রেক্ষাগৃহ : লাইটহাউস, বাণ্টি
পরিবেশক : ডি কে ফিল্মস এন্টারপ্রাইজ

জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৯), রঙিন

প্রযোজনা : আর ডি বনশল
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয়ে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, উৎপল দত্ত, জিৎ বসু প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ৫ জানুয়ারি ১৯৭৯
প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা
পরিবেশক : আর ডি বনশল

হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), রঙিন

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত, সন্তোষ দত্ত প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০ (করমুক্ত)
প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, পূর্ণ, প্রাচী
পরিবেশক : পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম ডেভালপমেন্ট করপোরেশন

ঘরে বাইরে (১৯৮৪), রঙিন

প্রযোজনা : এন এফ ডি সি
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, ভিক্টর ব্যানার্জি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, জেনিফার কাপুর, গোপা আইচ, ইন্দ্রপ্রমিত রায় প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ (লন্ডন) ৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ (কলকাতা)
প্রেক্ষাগৃহ : পূর্ণ, প্রাচী, টকিশো হাউস, গ্লোব (ইংরেজি সাবটাইটেল)
পরিবেশক : ছায়াবাণী

গণশত্রু (১৯৮৯), রঙিন

প্রযোজনা : এন এফ ডি সি
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : হেনরিক ইবসেন
চিত্রগ্রহণ : বরুণ রাহা
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, মমতাশঙ্কর প্রমুখ।

মুক্তির তারিখ : ২৮ জুন ১৯৮৯, প্যারিস ; ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯, লন্ডন ; ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০, কলকাতা। (করমুক্ত এবং সঙ্গে তথ্যচিত্র 'সুকুমার রায়' দেখানো হয়)।
প্রেক্ষাগৃহ : মিত্রা, বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী
পরিবেশক : জগৎ সিংহ দুগার

শাখা প্রশাখা (১৯৯০), রঙিন

প্রযোজনা : জেরার্ড দেপার্দ্যু ও ড্যানিয়েল টোসক্যান দ্য প্ল্যানটিয়ের
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : বরুণ রাহা
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় , হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় , সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, মমতাশঙ্কর, লিলি চক্রবর্তী প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২১ আগস্ট ১৯৯১, প্যারিস। এবং ভারতীয় দূরদর্শনে দেখানো হয় ৫ মে ১৯৯১, দুপুর ১-৩০ মিনিটে।

আগন্তুক (১৯৯১) রঙিন

প্রযোজনা : এন এফ ডি সি
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : বরুণ রাহা
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : দীপঙ্কর দে, মমতাশঙ্কর, উৎপল দত্ত, ধৃতিমান চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, অজিত ব্যানার্জি, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রতা চ্যাটার্জি প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২০ ডিসেম্বর ১৯৯১।
প্রেক্ষাগৃহ : এরোস, বোম্বাই (কেবল দুপুরের শো)

তথ্যচিত্র

রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), সাদা-কালো

প্রযোজনা : ফিল্মস ডিভিশন, ভারত সরকার
চিত্রনাট্য, ধারাভাষ্য ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
সঙ্গীত : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : রায়া চ্যাটার্জি, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। ৩-১১ মে ১৯৬১ এই তথ্যচিত্র (বাংলা) প্রদর্শিত হয়েছিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। আর ইংরেজি ভার্সানিটি দেখানো হয় লাইটহাউস প্রেক্ষাগৃহে ৫ মে ১৯৬১।

সিকিম (১৯৭১), রঙিন

প্রযোজনা : রয়াল সিকিম সরকার
ধারাভাষ্য, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

ইনার আই (১৯৭২), রঙিন

প্রযোজনা : ফিল্মস ডিভিশন, ভারত সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত

বালা (১৯৭৬), রঙিন

প্রযোজনা : ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টস, বোম্বাই ও তামিলনাড়ু সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
থিয়েটার

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : রবি কিরণ ও একটি রাস্তার শিশু

পিকু (১৯৮২), রঙিন

প্রযোজনা : আঁরা ফ্রেজ
কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : অর্জুন গুহঠাকুরতা, অপর্ণা সেন, ভিক্টর ব্যানার্জি, শোভেন লাহিড়ি, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।
মুক্তির তারিখ : ২৪ এপ্রিল ১৯৮৩, সন্দীপ রায়ের 'ফটিকচাঁদ' ছবিটির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দেখানো হয়।



● জয়বাবা ফেলুনাথ

সুকুমার রায় (১৯৮৭), রঙিন

প্রযোজনা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
ধারাভাষ্য : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণ : বরুণ রাহা
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, সন্তোষ দত্ত, তপেন চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই তথ্যচিত্রটি 'গণশত্রু' ছবিটির সঙ্গে দেখানো হয়।

দূরদর্শন চিত্র

টু (১৯৬৪), সাদা-কালো

প্রযোজনা : এসো, চিলড্রেন'স ওয়ার্ল্ড

সদ্‌গতি (১৯৮১), রঙিন

প্রযোজনা : ভারতীয় দূরদর্শন
চিত্রনাট্য, সঙ্গীত ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়
কাহিনী : প্রেমচন্দ
চিত্রগ্রহণ : সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা : অশোক বসু
সম্পাদনা : দুলাল দত্ত
অভিনয় : ওম পুরী, স্মিতা পাটিল, মোহন আগাসে, গীতা সিদ্ধার্থ, রিচা মিশ্র প্রমুখ। ২৫ এপ্রিল ১৯৮২, রবিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে দূরদর্শনে প্রথম প্রদর্শিত হয়।



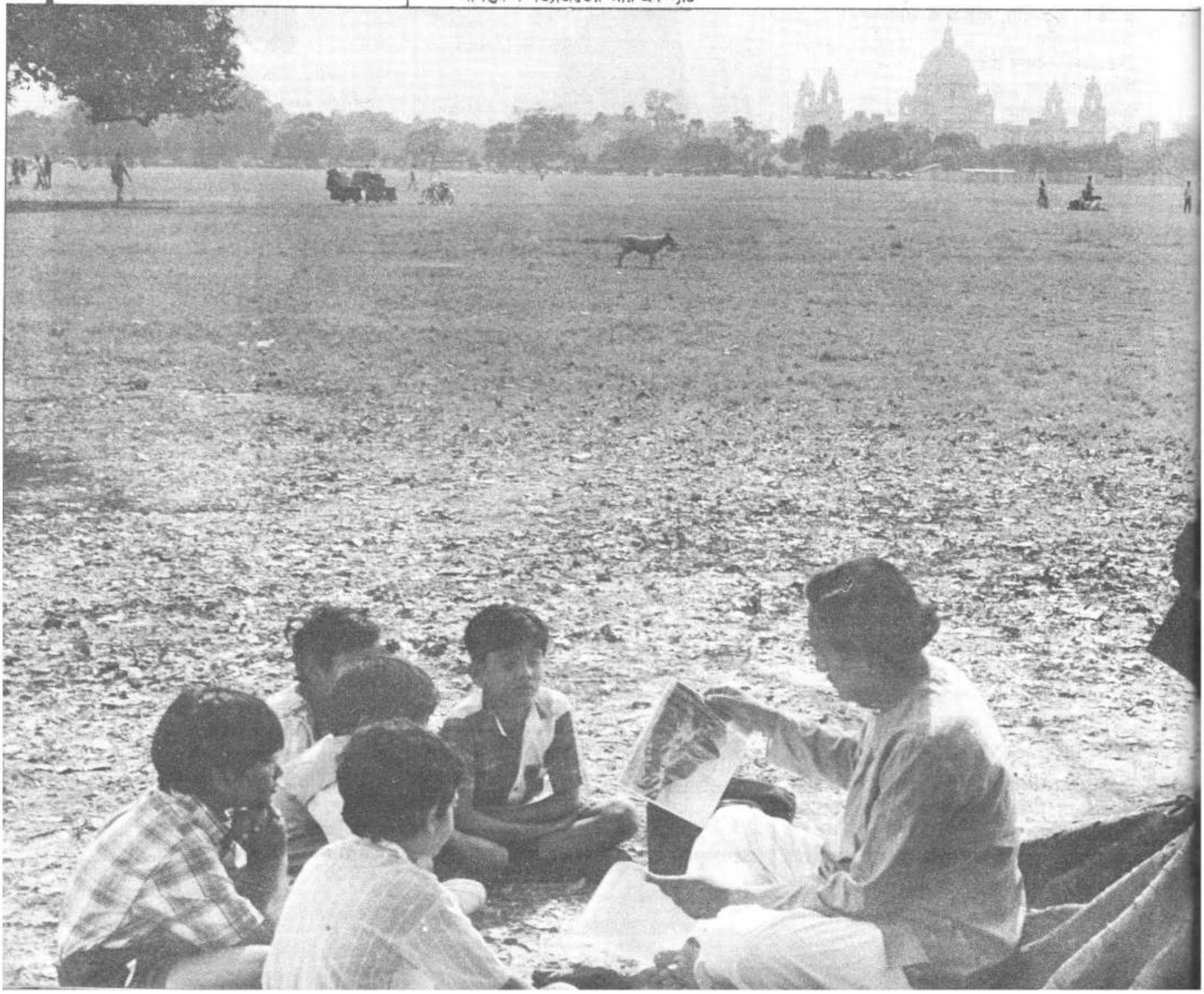
মানিকদা

সত্যজিৎ রায়ের জীবনীকার হিসেবে **অ্যানড্রু রবিনসন** বিখ্যাত। এখানে তিনি লিখেছেন তাঁর প্রিয় মানিকদা সম্পর্কে।

১৯৯০-এর শেষদিকের কথা। সত্যজিৎ রায়ের ৭০তম জন্মদিনের কয়েক মাস আগে সত্যজিতের সম্পর্কে নানা মানুষের প্রবন্ধের সংকলন তৈরি করছিলাম। অনেকে বাণী পাঠিয়েছিলেন। যেমন, আকিরা কুরোসাওয়া, মার্টিন স্কোরসেস হেনরি কার্টিয়ার ব্রেঁসো এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চেলোবাদক মাস্তিস্লাভ রস্ট্রোপভিচ্ ইত্যাদি। কিন্তু দুটি মানুষের লেখা আমাকে নাড়া দিয়েছিল। একটি লিখেছিলেন জাপানের এক সম্মানীয়া মহিলা, অন্যটি আমার ঘনিষ্ঠতম বাঙালী বন্ধু। কুরোসাওয়ার বন্ধু ও গত অর্ধশতাব্দী ধরে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র বোদ্ধা কাশিকো কাওয়াকিতা জাপানি হাইকু কবিতার ঢঙে লিখেছিলেন, ১৯৫৮ সাল থেকে সত্যজিতের চলচ্চিত্র ও বন্ধুত্ব তাঁকে শিখিয়েছে কেমন করে বাঁচতে হয়, কেমন করে ভালবাসতে হয়। আর, বাঙালি বন্ধুটি লিখেছিলেন, তাঁর সাত বছরের মেয়ের কাছে যখন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিতে হয়েছিল, 'পথের পাঁচালী'তে দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়ার বুক ফাটা আর্তনাদের কথা মনে পড়েছিল ওঁর এথেকেই নিজের জীবনটাকে এরপরও টেনে নিয়ে যাবার শক্তি পেয়েছিলেন।

গত ১৫ বছর ধরে সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখছি। ব্যক্তিগত পরিচয় এক যুগের। পরিচয়ের পর থেকে একটা দিনও কাটেনি যখন ওঁর কথা, ওঁর ছবির কথা মনে

● আগন্তুক : সত্যজিতের আর এক সৃষ্টি



মূল্যবান মাণিক্য

পড়েনি । ওঁর নাম সার্থক । মানিকদা তাঁর প্রতিভাধর পারিবারিক পরিমণ্ডল পশ্চিমবাংলা, এবং গোটা পৃথিবীরই মূল্যবান মাণিক্য । ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ব্যতিরেকে আর যে মানুষটি আমার জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, তিনি সত্যজিৎ রায় ।

১৯৮৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৪০তম বর্ষে লিখতে গিয়ে ওঁকে বর্ণনা করেছিলাম ভারতবর্ষের 'আত্মা'ও বিবেক বলে । লেখবার পর নিজেরই কথাটা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়েছিল । তারপর ওঁর আরও তিনটে ছবি দেখলাম । 'আগন্তুক'ও দেখেছি । তারপর মনে হয়েছে, বোধহয় কমই বলেছি । জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে সত্যজিৎ তাঁর চরিত্রের ইস্পাত কঠিন দিকটা প্রকাশ করেছেন । আগে ওঁর কাছে যে বাক্য ছিল, ভদ্রতা ছিল, সূক্ষ্ম ছিল এ তার বিপরীত । সোজাসুজিই বলেছেন, দুর্নীতি ভারতবর্ষকে ধ্বংস করছে । দেশের মানুষ যদি এসব দেখেও চোখ বুজে থাকে, দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, গোটা সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । বিবেককে নির্বাক করে দিলে আমরা আমাদের হারাব ।



সত্যজিতের ছবির চরিত্ররা সবাই সাধারণ মানুষ । হলিউডে বা বোম্বাইয়ের ছবির অতি নায়ক বা অতি শয়তান নয় । ওঁর ছবির বৈচিত্র্যের ব্যক্তিত্বে সত্যজিৎ সিনেমার ইতিহাসের যেকোন শিল্পীকেই ছাড়িয়ে গেছেন । ওঁর চরিত্ররা ভারতীয়, প্রায় সকলেই বাঙালী । 'অসকার' বিজয়ের পর 'টাইম' ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ নিজেও বলেছিলেন এই বৈশিষ্ট্যের কথা । মানুষের স্বভাবের, ব্যবহারের সব বৈচিত্র্যই ধরা আছে ওঁর ছবির চরিত্রদের মধ্যে । অন্য সব পরিচালকদের ছবিতে সবই যেন স্থূল প্রত্যাশিত । সত্যজিতের নতুন ছবির জন্য অপেক্ষা করি নতুন চমকের আশায় । সব সময় সব প্রত্যাশা মেলে না । তবু বলি, ছবির দর্শক হিসেবে আমার সব সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন উনি । ইতিহাসের সেরা শিল্পীদের মধ্যে অবশ্যই স্থান পাবেন সত্যজিৎ । ওঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি আমাদের মনকে তাজা করে দেয়, প্রেরণা দেয় । আমি ওঁকে কিভাবে মনে রাখব ? মানুষ সত্যজিৎকে ভুলব না আমি । আমার বয়স যখন ২৫ বছর উনি তো আমাকে উপেক্ষা করতে পারতেন । করেননি । উৎসাহ দিয়েছেন । নিজের কাজের ব্যাপারে ওঁর গর্ব আছে, অগাধ আস্থা আছে । এই মনোভাবকে ভারতে ও পশ্চিমে অনেকেই অহংকার বলে মনে করেছেন । মানুষ হিসেবে উনি কিন্তু আসলে সরল ও বিনয়ী । নইলে কি কেউ প্রায় ৪০ বছর ধরে এইরকম উঁচুমানের ছবি করে যেতে পারেন ? খ্যাতি ওঁকে টলায় না । দর্শকের মন ও হৃদয়কে জয় করাই ওঁর লক্ষ্য । একবার আমাকে লিখেছিলেন, প্রশংসা ওঁর বড় একঘেয়ে লাগে । সমালোচনা বিরক্ত করে । আমি ওঁর ছবির সমালোচক ও জীবনীকার । তাই ওঁর এই মন্তব্যে স্বভাবতই আহত হয়েছিলাম । তবু ওঁর সরল সত্যকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি । ওঁর মত বড় শিল্পীরা বোধহয় এইভাবেই ভাবেন । আমার তো তাই ধারণা ।

ভারতীয় সমালোচকদের সঙ্গে সত্যজিতের সম্পর্কটা বোধহয় যুগপৎ ভালবাসা ও ঘৃণার । বাঙালীরা তো ওঁর প্রতি অনেকেই ঈর্ষাপরায়ণ । ভারতীয়ই বা ক'জন ওঁকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন ? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ সত্যজিৎ সম্পর্কে আমার মনোভাবের খবরটা না জেনে মন্তব্য করেছিলেন, 'সত্যজিৎ রায় নেহাৎই মাঝারি গোছের পরিচালক' । খুব খেটেছেন বলেই এত সাফল্য পেয়েছেন । সত্যজিৎ তাঁর মহান পূর্বসুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতই স্বদেশে কখনও কখনও পূজিত, কখনও সমালোচিত । আমার কেবল আশা, ভবিষ্যতে ওঁর ছবি দর্শক মন দিয়ে দেখবেন, অন্ধভাবে প্রশংসিত হবে না । ওঁর ছবি দেখে দর্শক আরও মানবিক, স্পর্শকাতর ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে উঠতে পারবেন । ছবিগুলির স্রষ্টা ঠিক যেমন তেমনই ।

একবার জানতে চেয়েছিলাম, সমসাময়িক ঘটনাবলীতে উনি নিজে জড়িয়ে পড়তে চান না কেন ? একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, ওঁর ছবিগুলো তো প্রথম থেকেই একধরনের 'সমাজসেবা' মূলক কাজ । তা হবে কিন্তু এই সত্যজিৎই অনেকবার বলেছেন, কোন চলচ্চিত্র কি কোনদিন সমাজকে বদলাতে পেরেছে ? নিঃসন্দেহে আমার বোধবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করেছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি । আমার জীবন পূর্ণতর করেছে । সারা পৃথিবীর কত প্রতিভাবান মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে । ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের কথা জেনেছি । কত বই পড়েছি, শিল্পকর্ম দেখেছি, সঙ্গীত শুনেছি । ভালবাসা নিয়ে, কিন্তু ওঁর ছবিগুলো থেকে এর চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছি । ওঁর অনেক ভালবাসার সৃষ্টি । সেই সৃষ্টিকর্তা এমনই একজন ভারতীয়, যাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয় । মাণিকদা, চলচ্চিত্রের 'কোহিনূর' মানিকদা, আমি আপনাকে প্রণাম জানাই ।



সত্যজিৎ সমীপে



বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে সত্যজিৎ রায়ের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন অ্যানড্রু রবিনসন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সালের নানা সময়ে তিনি সত্যজিৎ রায়ের জীবনী রচনার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। সেই জীবনী 'দ্য ইনার আই' ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাক্ষাৎকার থেকেই কিছু-কিছু অংশ অ্যানড্রু রবিনসন নিজে তুলে দিয়েছেন 'আনন্দলোক'-এর হাতে। যেটি এই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

অ্যানড্রু : প্রেসিডেন্সি কলেজের শুরুটা কি খুবই লেখাপড়া বিরোধী অনুভূতি নিয়ে।

সত্যজিৎ : প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত হয়েছিলাম ; ওটাই ছিল সেরা কলেজ।

অ্যানড্রু : কিন্তু অর্থনীতি আপনার খুব একটা পছন্দের বিষয় নয়।

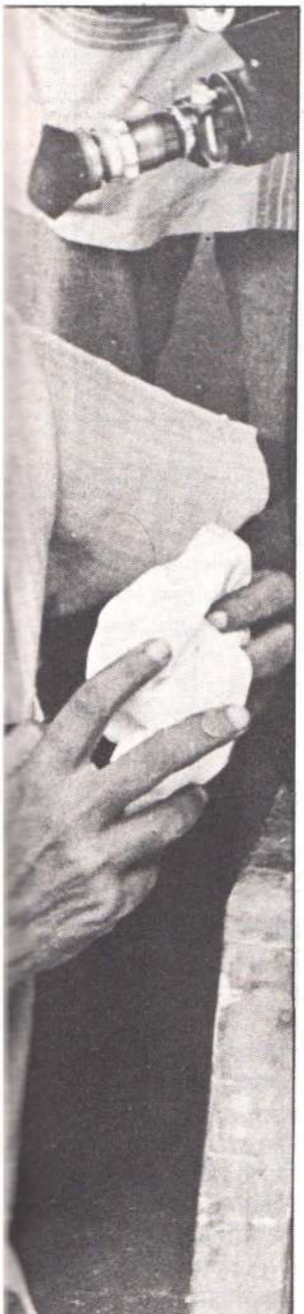
সত্যজিৎ : না। ওটা অবশ্য তৃতীয় বর্ষের ব্যাপার। প্রথম দু-বছরে, ইন্টারমিডিয়েট করার সময়ে, বিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু বি-এ করার সময়ে আমার বাবার বন্ধু প্রফেসর মহলানবিশ-এর ইচ্ছেয় অর্থনীতি নিতে হয়েছিল। আমার একেবারেই পছন্দ ছিল না। অ্যাস্ট্রনমিও নিয়েছিলাম। একই সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা এবং অন্যান্য বিষয় পড়তে হচ্ছিল।

অ্যানড্রু : কোনও বিষয় নিয়ে পরে আরও গভীর ভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছা হয়নি আপনার ?

সত্যজিৎ : না। চাকরি পাওয়ার জন্য একটা ডিগ্রির প্রয়োজনটাই কেবল আমার ছিল। নামের পেছনে বি-এ লেখাটাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখাপড়াটা শেষ করাই ছিল আমার লক্ষ্য। তারপর গ্রাফিক আর্টস, অ্যাডভার্টাইজিং, বা অন্য যে-কোনও কাজে জড়িয়ে পড়া। আমার নিজের পছন্দের বিষয় যদি কিছু থেকে থাকত, তবে সেটা হল ইংরেজি সাহিত্য, বা ওইরকম একটা কিচ্ছু... না, আমার মনে হয় না তা হলেও আমি আর লেখাপড়া করতাম না। আমি মনে করি শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত প্রয়োজন, তার বেশি নয়। বিদগ্ধ মানুষ হওয়ার প্রতি আমার কোনও আসক্তি ছিল না, অন্য আরও অনেক ব্যাপারে বরং উৎসাহী ছিলাম। আমার কাছে সিনেমা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ-ছাড়া ছিল পেন্টিং-এর ব্যাপার। ড্রইং-ও ছিল— কোনও ট্রেনিং ছাড়াই আমি ভাল আঁকতে পারতাম। অ্যাডভার্টাইজিং আর্ট, পোস্টার, টাইপোগ্রাফি ইত্যাদি আরও অনেক ব্যাপারে আমি উৎসাহী হয়ে পড়ছিলাম। কলেজ, লেখাপড়া ইত্যাদি নিয়ে আরও চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে আমার মনে হয় নেহাতই সময় নষ্ট।

অ্যানড্রু : কোনও বিশেষ দিকে কি আপনার মা




সোমা চৌধুরী

আপনাকে উৎসাহ দিতেন ?
সত্যজিৎ : আমার একটা ডিগ্রির প্রয়োজন এটা তিনি মনে করতেন। তার বেশি কিছু করে আরও পড়া চালিয়ে যাও বা এম-এ করো এমন কোনও কথা আমাকে কখনও বলেননি। তিনি করেননি তার কারণ যে-কোনও একটা চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে আমি ভয়ংকর উদ্বিগ্ন ছিলাম যাতে নিজের জন্যে কিছু রোজগার করতে পারি, এ-ছাড়া মা তখনও কাজ করছেন। আমার কাজ পাওয়া মানে সংসারে কিছু টাকা দেওয়া।
অ্যানড্রু : কোনও সৃজনশীল কাজে তিনি কখনও উৎসাহ দিতেন ?
সত্যজিৎ : তিনি জানতেন শিল্পী হিসেবে আমার একটা সহজাত প্রতিভা আছে। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে থেকেই আমি ভাল পোর্ট্রেট আঁকতে পারতাম। তাই তিনি খুশিও হয়েছিলেন। আমার মনে হয় না আমি কী করতে চলেছি সে-সম্পর্কে পরিষ্কার আভাস তাঁর ছিল। ততদিনে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার মনে কী ছিল সেটা শুধু তাঁকে বলার অপেক্ষা।
অ্যানড্রু : শান্তিনিকেতনে আপনার দৈনন্দিন রুটিন কী ছিল ?
সত্যজিৎ : খুব সকালে উঠতে হত। তারপর ঠাণ্ডা জলে স্নান, এমনকি শীতেও। কোনও গরম জলের ব্যবস্থা ছিল না।
অ্যানড্রু : আপনি কি ডরমিটরিতে থাকতেন ?
সত্যজিৎ : হ্যাঁ। সঙ্গে অবশ্য বসা এবং কাজ করার লাগোয়া ঘর ছিল। মাস্টারমশাই (নন্দলাল বসু) প্রতিটি ডরমিটরিতে আসতেন, ছাত্রদের কাজ দেখতেন, তাদের উপদেশ দিতেন।
অ্যানড্রু : কিন্তু দিনের অনেকটা সময়ই বাইরে কাটাতে হত, তাই না ?
সত্যজিৎ : বাইরে যাবার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। বিকেল বেলায় সবাই আউটডোরে গিয়ে স্কেচ-টেচ করত। আমি রুটিনটা ঠিক মনে করতে পারছি না, ব্যাপারটা নিয়ে কতটা কড়াকড়ি ছিল মনে নেই। মনে হয় ততটা কড়াকড়ি ছিল না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম, কিন্তু দিনের শেষে মাস্টারমশাইকে দেখাতেই হত সারাদিনে কী কাজ করেছি।
অ্যানড্রু : কোনও লেকচারের ব্যবস্থা ছিল না ?
সত্যজিৎ : কোনও লেকচারই ছিল না। আমি কেবল বিকেলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। মনে আছে, চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যেই আমরা কাজ শেষ করে ফেলতাম, স্কেচ করা, শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা, সব কিছু। তারপরে যেতাম অ্যালেক্স অ্যারনসন (ইংরেজির শিক্ষক এবং পাশ্চাত্য মার্গ সঙ্গীতের প্রেমিক)-এর কাছে। হত গ্রামোফোন রেকর্ড নিয়ে সঙ্গীতের চর্চা।
অ্যানড্রু : তিনি পিয়ানো বাজাতেন ?
সত্যজিৎ : সেটা আরও পরের ব্যাপার, যখন আমরা উত্তরায়ণ-এ একটা পিয়ানো আবিষ্কার করলাম।
অ্যানড্রু : ততদিনে অ্যালেক্স শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটালেও, আপনারা এই ব্যাপারটা কেউই জানতেন না ?
সত্যজিৎ : জানলেও, উত্তরায়ণে রোজ যাওয়া যেত না, কেননা তখন রবীন্দ্রনাথ সেখানেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে তো রোজ দেখা করা যায় না।
অ্যানড্রু : কতবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে ?
সত্যজিৎ : আড়াই বছরে তিন কি চারবার। প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে যোগ দিই তখন। তখন অবশ্য বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল। আমার মা তখন সেখানে। তিনি যে তিনদিন ছিলেন রোজ সকালে আমরা যেতাম। তিনি বসে থাকতেন, আর কে যেন মাটি দিয়ে ক্লে মডেলিং করছিলেন। ললিত কলার প্রদোষ দাশগুপ্ত, তিনি রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি মাটি দিয়ে তৈরি করছিলেন। খুব খারাপ। রবীন্দ্রনাথকে স্থিরভাবে বসতে হত না। তিনি বসতেন, পড়তেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন। কী কারণে যেন একদিন সেখানে একটা গ্রামোফোন ছিল, আমরা তাঁর উপস্থিতিতেই উনবিংশ শতকের শেষ দিকের এক সোপ্রানোর গান শুনছিলাম। আগেকার দিনের কলম্বিয়া রেকর্ড। তিনি মন্তব্য করলেন এমন গান তিনি আগে কখনও শোনেননি, যা অবশ্যই সত্যি নয়, কারণ তিনি নিজেই গান গাইতেন। তাঁর ছিল টেনর ভয়েস।
অ্যানড্রু : তাঁর মন্তব্য কি কণ্ঠস্বর নিয়ে, না কি সঙ্গীত নিয়ে ?
সত্যজিৎ : সঙ্গীত নিয়ে। ততদিনে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মোহের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন। তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই তখন খুবই অচেনা।
অ্যানড্রু : অ্যালেক্স-এর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি ততটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না।
সত্যজিৎ : আমি মনে করি, আমিও ততটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম না। একটা সময় ছিল গোড়ার দিকে, যখন শালীকে দেখতে তিনি প্রথম ইংলন্ডে যান। তখন তিনি অনেকটাই গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি দেশে ফেরার সময়ে জাহাজে নিজেই গাইতে-গাইতে এসেছিলেন।
অ্যানড্রু : হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব কৌতূহলের। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের ব্যাপারটা, তাই না ?
সত্যজিৎ : হ্যাঁ, খুবই কৌতূহলের।
অ্যানড্রু : এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটা বছর ছিল।
সত্যজিৎ : হ্যাঁ। এই সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর কোনও সঠিক যোগাযোগ ছিলই না। তাঁর হান্ডেল-উৎসব যাওয়ার একটা বর্ণনা আছে। প্রায় দু-হাজার লোক একসঙ্গে মেসায়া গাইছে, আর এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর কাছে খুব একটা সুখকর হয়নি। তিনি বলেছিলেন, এরা শুধু চিৎকার আর চেঁচামেচি করতে পারে। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গীত কিন্তু অনেক বেশি কাছের, ঘনিষ্ঠ।
অ্যানড্রু : তাঁর এই ধরনের মন্তব্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক সরলকরণ।
সত্যজিৎ : হ্যাঁ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো



• সত্যজিৎ



• অ্যান্ড্রু রবিনসন

বিদগ্ধ মানুষ হওয়ার প্রতি আমার কোনও আসক্তি ছিল না, অন্য আরও অনেক ব্যাপারে বরং উৎসাহী ছিলাম। আমার কাছে সিনেমা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ছিল পেন্টিং-এর ব্যাপার। ড্রইং-ও ছিল—কোনও ট্রেনিং ছাড়াই আমি ভাল আঁকতে পারতাম।

বাজানোর অভ্যেস ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতটা তিনি বেশি ভাল বুঝতেন। ইন্দিরা দেবীও খুব ভালভাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের পরের প্রজন্মের অবশ্য বেশ কয়েকজন ভাল জানতেন। সমাজের বিশেষ অংশের যুবতী মেয়েদের কাছে সঙ্গীত এবং অঙ্কন শিক্ষা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। পরেশবাবু বলে একজন তেলরঙের শিক্ষক হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যুবতী ব্রাহ্ম মেয়েদের ছবি আঁকা শেখাতেন।

অ্যানড্রু : রবি বর্মার মত ?

সত্যজিৎ : তিনি ছিলেন আসলে স্টিল লাইফ বিশেষজ্ঞ।

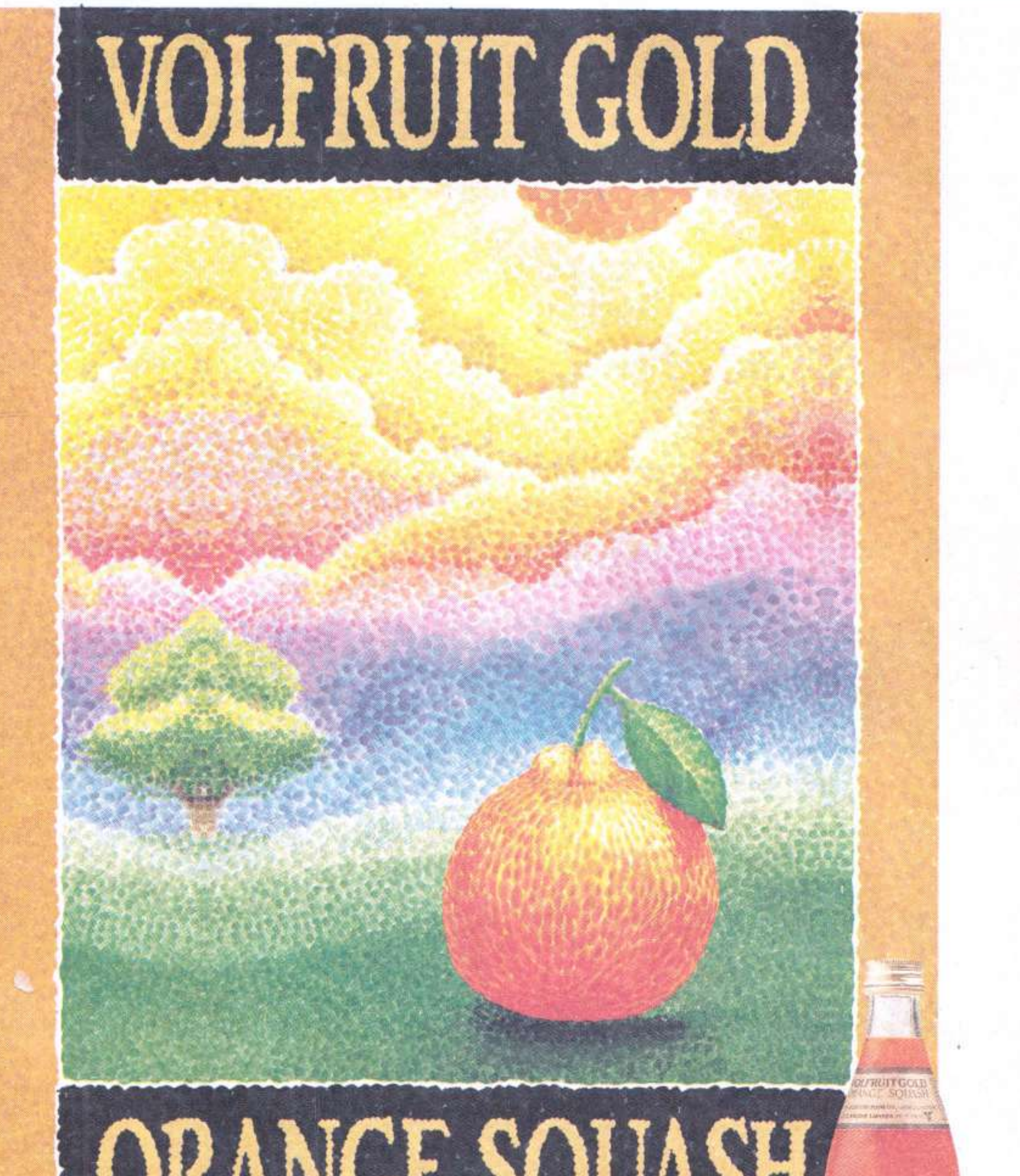
অ্যানড্রু : এতে আমার মনে পড়ে গেল আপনার মায়ের 'লং, লং আগো' শেখার ব্যাপারটা। এই গানটা 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলা গেয়েছিল।

সত্যজিৎ : হ্যাঁ। ভিক্টোরিয়ান গানের একটা বই আমার আছে, যে গান আমার মা তাঁর ঢাকার শিক্ষকের কাছে শিখেছিলেন।

অ্যানড্রু : শান্তিনিকেতনে সন্ধেটা কাটাতেন কী করে ? বেশ অন্ধকার হয়ে যেতনা চারপাশ ?

সত্যজিৎ : আমরা বসে থাকতাম, আড্ডা মারতাম। একটা দল তৈরি করে নিয়েছিলাম আমরা। পৃথ্বীশ নিয়োগি, দীনকর কৌশিক এবং অন্যান্যেরা। প্রায় রোজই একটা-না একটা অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। গান, অর্কেস্ট্রা, কবিতা-পাঠ, নাটক, এটা-ওটা। আমরা হয় সেখানে যেতাম, নয় স্রেফ আড্ডা মারতাম।

[চলবে]





শুধু উত্তম ফল থেকেই তৈরী হতে পারে দারুণ স্বাদের স্কোয়াশ।

সোনার মতই মূল্যবান! ভোলফ্রুট গোল্ড! এতে যে রয়েছে শুধু টাটকা-তাজা ফল, অন্য কিছুই নয়। এ স্কোয়াশ আপনার সবচেয়ে প্রিয় ও আপন জনের জন্যে!

VOLFRUIT GOLD
ORANGE SQUASH

ভোলফ্রুট গোল্ড। প্রাকৃতিক ফল-বোতলে ধরা!

A **VOLTAS** Product

আরও পাওয়া যায়: ভোলফ্রুট গোল্ড-লেমন স্কোয়াশ

SPEER 04 176 91 BEN

সত্যজিৎ রায় অন্তিম যাত্রা







১৯২১-এর ২ মে বাংলার মাটিতে যে মহীরুহের অঙ্কুর প্রথম মাথা তুলেছিল, ভবিষ্যতে সেই কিশলয় বৃহৎ বৃক্ষের মতো আমাদের ছায়া দিয়েছে, ভরিয়ে দিয়েছে আমাদের প্রাপ্তির করপুট। ১৯৯২-এর ২৩ এপ্রিল তিনি চিরদিনের মতো চলে গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর বিপুল কীর্তি, জগৎ জোড়া খ্যাতির দীপ্তি আর সান্ত্বনাহীন শোক। মহানগরীর শোকার্ত মানুষ সজল চোখে তাঁকে দেখেছেন আর দুরন্ত শোক বুকে নিয়ে হেঁটে গেছেন তাঁরই নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে।

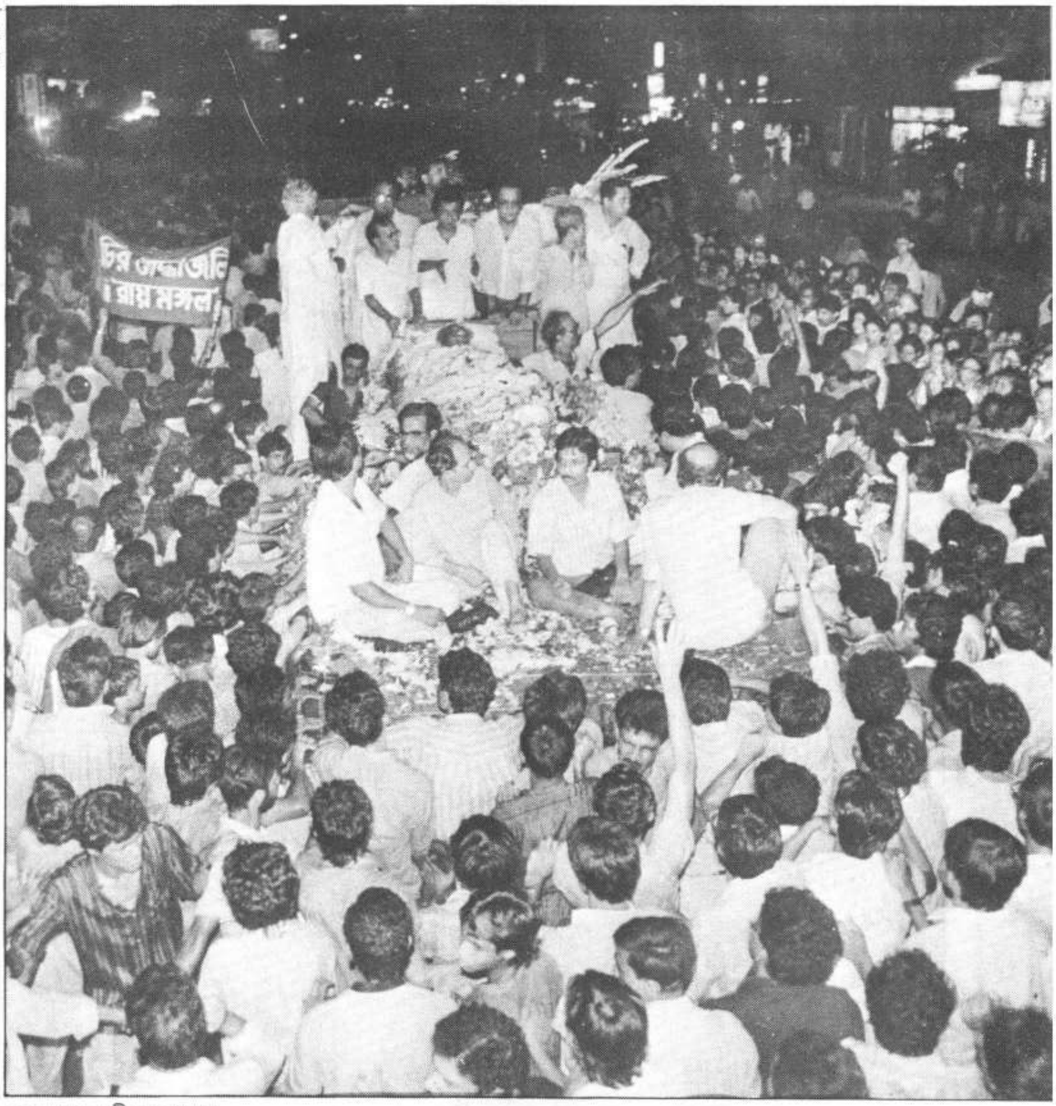

আজকের তারকা, আজকের সাবান
Divya Bharti
Godrej
LIMELITE
THE BEAUTY-FRESH SOAP
LIMELITE
গোদরেজ
লাইমলাইট
সাদা
TSMcCANN-B/GSL/38692-Bn

২৩ এপ্রিল, বেলভিউ

দুঃসংবাদ যখন এল

বিরানব্বইয়ের তেইশ এপ্রিল সন্ধে ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে খবর পেয়ে ছ'টা পঁয়তাল্লিশে বেলভিউ নার্সিংহোমের লবিতে যখন পৌঁছোনো গেল, তখনও তত ভিড় জমেনি। কাগজের কোনো লোক তখনও আসেনি। শুধু বেলভিউ নার্সিংহোমের সামনের রাস্তায় জনা ছয়েক পুলিশ সামনের রাস্তা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মেট্রনের ঘরে যেতেই ওখানে কর্তব্যরত মেট্রন জানালেন, সন্ধে পাঁচটা বত্রিশ থেকে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেছে ব্যাপারটা! এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়া খবর থেকে একে একে আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন কাগজের লোক। নার্সিংহোমের গ্রাউন্ডফ্লোরেই মিটিং রুমে তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সত্যজিৎ রায়ের পারিবারিক বন্ধু নির্মাল্য আচার্য ও আরও দু-একজনকে নিয়ে বসে আছেন।
এর মধ্যেই সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘদিনের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ কান্তি বক্সি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পাঁচটা বত্রিশ থেকে সন্ধে ছ'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়টাকেই নির্দিষ্ট করলেন।
নার্সিংহোমের প্রথম দরজার পাল্লায় ঠেস দিয়ে কাঁদছিলেন প্যারিস থেকে কলকাতায় আসা 'শাখা প্রশাখা' ছবির প্রযোজিকা মার্টিনি আরমেন্ড। পরনে সাদা জমির ওপর লাল ডোরাকাটা তাঁতের শাড়ি আর কালো রংয়ের ব্লাউজ। পায়ে পায়ে ভেতরে এলেন তিনি।
সাতটা বেজে কুড়ি মিনিটে এলেন মৃণাল সেন, গীতা সেন-কে সঙ্গে নিয়ে। এসেই লিফটে গেলেন ওপরে সত্যজিৎ রায়কে শেষবারের মতো দেখতে। ফিরে এসে বললেন, 'দীর্ঘদিন সংগ্রাম

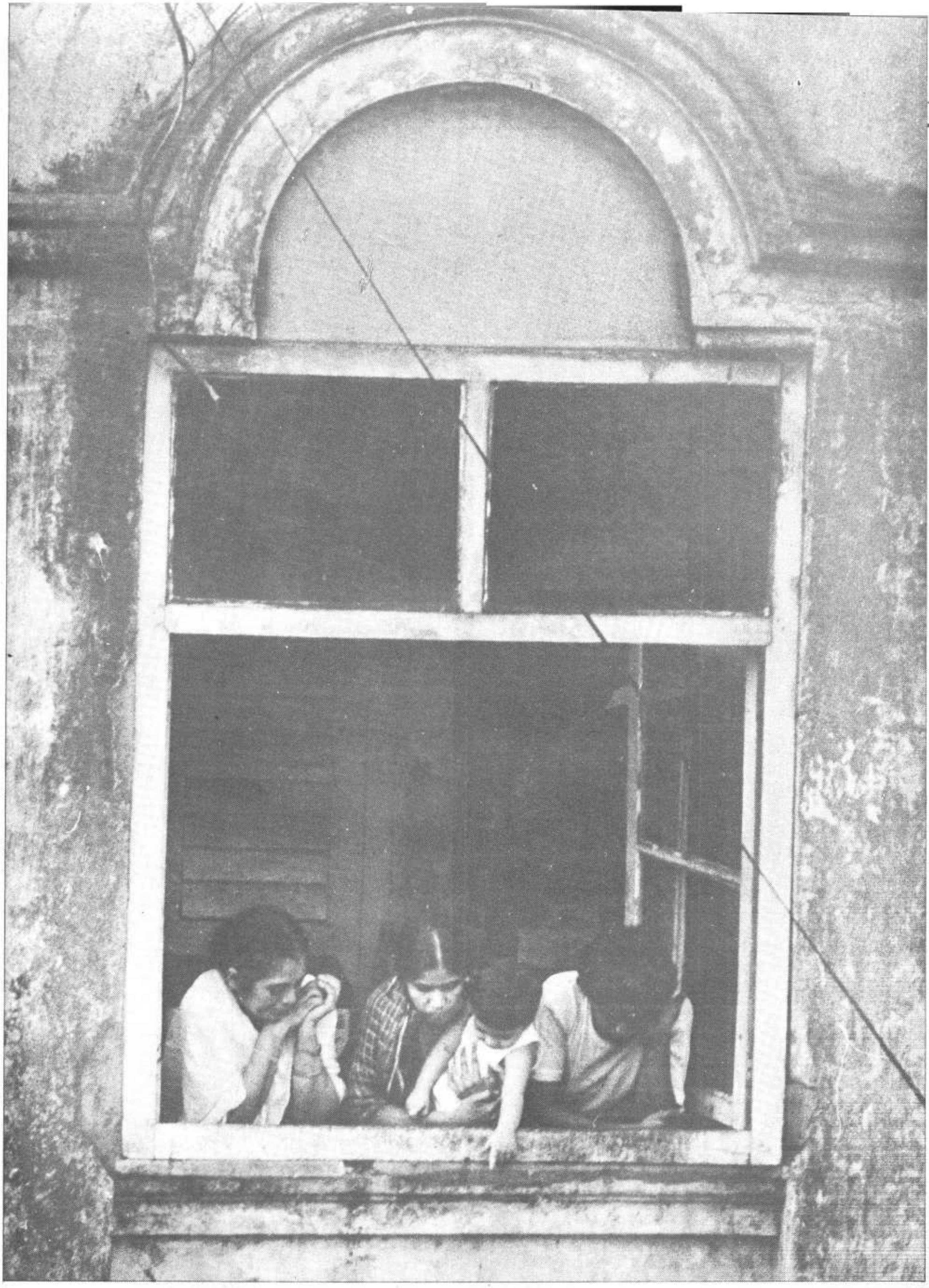
রাজীব বসু



• জনসমুদ্রের নীরব নমস্কার

করেছেন, বাংলাকে, ভারতকে পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর কাছে। সংগ্রাম করেছেন, জিতেছেন। আজই শুধু হেরে গেলেন।' গম্ভীর মুখে এলেন তরুণ মজুমদার অল্প পরেই। তনুবাবু এসেই গেলেন সত্যজিৎবাবুকে দেখতে। পরে বললেন, 'সত্যিকথা বলতে কি, ঠিক কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। যা কিছু বলব, সেটা আমার মতো পরিচালকের পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যাঁর সম্পর্কে বলব, তিনি আমার চেয়ে অনেক, অনেক বড় পরিচালক।' করিডোরেই উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
এর মধ্যেই এসেছিলেন পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। বুদ্ধদেব বললেন, 'তিয়াত্তর সালে কন্টিনেন্টাল ফিল্ম বলে একটা ডকুমেন্টারি করেছিলাম। উনি সেটা দেখে বেশ মজা পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ওঁর কাছেও গিয়েছি অনেকবার। দারুণ মানুষ। অনেক কিছু শিখেছি। জানতে পেরেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলে। ভীষণ আপসোস হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছুদিন, আরও অনেকদিন আমাদের মধ্যে চেয়েছিলাম।' গৌতম ঘোষ এসেছিলেন। সংক্ষেপে জানালেন, 'একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। ইটস দ্য এন্ড অফ অ্যান এরা।'
মিটিং রুমে এর মধ্যেই নির্মাল্য আচার্য সাংবাদিকদের জানিয়ে দিয়েছেন 'মেডিক্যাল বুলেটিন।' বুদ্ধদেববাবু পরদিন ২৪ এপ্রিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।
বুদ্ধদেববাবু জানালেন, 'পরদিন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত নন্দন-এ রাখা হবে শ্রীরায়ের শরীর। সেখান থেকে সন্ধ্যা ছ'টার পর নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে কেওড়াতলা শ্মশানের

রঙিন ছবিগুলি তুলেছেন শ্যামল চক্রবর্তী



● 'আমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সুতরাং আত্মীয়তা সূত্রে একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজনের যে-পরিচয় হয়, আমার সঙ্গে আমার বাবার সে রকম পরিচয় হবার কোনো সুযোগ হয়নি। আমি তাঁকে চিনেছি তাঁর লেখা ও আঁকার মধ্য দিয়ে।' সত্যজিৎ রায়, ভূমিকা, সুকুমার সাহিত্য সমগ্র। তিনতলার জানালা দিয়ে দেড় বছরের পৌত্র সৌরদীপ দেখছে তার প্রিয় ঠাকুর্দার শেষযাত্রা। ঠাকুর্দার সঙ্গে তারও পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ হল না, যেমন হয়নি সুকুমার রায়ের সঙ্গে সত্যজিতের। সৌরদীপও ঠাকুর্দাকে ভবিষ্যতে চিনবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

দিকে। ছুটি থাকবে সেদিন সমস্ত রাজ্য সরকারি অফিস। স্কুল-কলেজ। অর্ধনমিত রাখা হবে জাতীয় পতাকা। আর সত্যজিৎবাবুর শেষকৃত্যসম্পন্ন হবে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। ক্রমশ ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে বেলভিউয়ের লবিতে।

তার মধ্যেই সত্যজিৎবাবুকে শেষ দেখা দেখতে আসেন সত্যজিতের বাল্যবন্ধু দিলীপ রায়। দিলীপবাবু কাঁদছিলেন অঝোরে। কথা বলতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। বললেন, 'মনে পড়ছে স্টার থিয়েটারে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আছি, মানিক দৌড়ে দৌড়ে আসছে শো শুরু হয়ে যাবে বলে।'... এর পর আর কিছু বলতে গিয়ে ভেঙে পড়েন তিনি।

ততক্ষণে সত্যজিৎবাবুর ইউনিটের অনেকেই সেখানে হাজির হয়েছেন। এসেছেন সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘদিনের সুহৃদ, ইউনিটের অন্যতম কর্ণধার অনিল চৌধুরি তার সঙ্গে স্থির-চিত্রশিল্পী নিমাই ঘোষ। চিত্রশিল্পী হীরক সেনকেও দেখা গেল মিটিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। সবার চোখে জল। সস্ত্রীক এলেন সত্যজিৎবাবুর ইউনিট সদস্য মেক-আপম্যান অনন্ত দাশ। এসেছেন নাট্য ও সিরিয়াল পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে।
মুখে নাটকের প্রসাধন নিয়েই এক সময় এলেন মাধবী চক্রবর্তী। অশ্রুভারাক্রান্ত গলায় বললেন, 'শো ছিল ঘটক বিদায়ের। শো-এর মাঝখানেই শুনতে পেয়ে শো বন্ধ রেখেই চলে এলাম। ওঁর অনেক ছবিতেই কাজ

সত্যব্রত ঘোষ



• মহাকরণে অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা : সত্যজিতের প্রতি রাজ্য সরকারের শ্রদ্ধা



অভিজিৎ দত্ত

• সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, —১৯৫৫ সালের সেই অপু। তাঁর স্রষ্টাকে শেষ প্রণাম জানাতে নন্দনে

করেছি। বিরাট মাপের মানুষ। ওঁকে নিয়ে অনেক কিছুই করা উচিত। ওঁর স্মৃতিতে অনেক কিছু করার আছে। শুধু চলচ্চিত্র-পুরস্কার বা রাস্তার নামকরণ নয়, আরও আরও অনেক কিছু।' একসময় এলেন আনন্দশঙ্কর। সঙ্গে তনুশ্রীশঙ্কর। তাঁদের সঙ্গেই এলেন হালকা রংয়ের সালোয়ার-কামিজ পরে মমতাশঙ্কর, স্বামী চন্দ্রোদয় ঘোষকে নিয়ে। এসেই কেঁদে ফেললেন মমতা। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'মানিকদা নেই। আমি বুঝতেই পারছি না এর পর কি হবে। আমার পক্ষে এর চেয়ে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।' আনন্দশঙ্কর বললেন, 'আমাদের গোটা পরিবারের সঙ্গেই ওঁর সম্পর্ক ছিল খুবই নিকট ও গভীর। শুধু রবিকাকার সঙ্গীতের কাজেই নয়, বিভিন্ন সময়ে বাবা এবং কাকাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছি ওঁকে। কি আর বলব, ভারত তার শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে হারাল। বাংলা তো বটেই। আমরা হারালাম আমাদের পরিবারেরই একজনকে।'

এভাবেই সময় বেড়ে চলেছিল আরও রাতের দিকে। সময়ের মতো বাড়ছিল মানুষের সংখ্যা! ঘড়িতে যখন প্রায় ন'টা। তখনই শোনা গেল আর অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরদেহ আনা হবে নীচে। নার্সিংহোমের বাইরে। এর মধ্যেই ডাঃ কান্তি বক্সিকে আর এক দফা ঘিরে ধরলেন উপস্থিত সাংবাদিকরা। সত্যজিৎবাবু শেষ কি কথা বলেছেন, তা জানার জন্য। তাঁর সঠিক মৃত্যুর সময় জানার জন্য। প্রায় শ' তিনেক লোক তখন নার্সিংহোমের ওই লবিতে। তাঁদের ভিড়ের চাপে বর্ষীয়াণ চিকিৎসককে অসহায় আর ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর সেদিন তাঁর যেন যাবতীয় জবাব দেওয়ার পালা। ভুল করে বসলেন মৃত্যুর সঠিক সময় জানাতে গিয়ে। পাঁচটা বত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের জায়গায় ছ'টা বত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ' বলে ফেললেন। এর মধ্যেই এসেছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রণেন আয়ান দত্ত সুরজিৎ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে। এসব চলার মাঝখানেই রাত নটা বেজে দশ মিনিটে একটা ম্যাটাডর এসে দাঁড়াল বেলভিউ নার্সিংহোমের প্রধান দরজার বাইরে। ন'টা বেজে যখন পঁয়ত্রিশ, ঠিক তখনই সাততলার বিশেষ কেয়ার ইউনিট থেকে সত্যজিতের নিথর, নিঃস্পন্দ, দীর্ঘাকৃতি শরীর স্ট্রেচারে করে নামিয়ে আনলেন পরিবারের ঘনিষ্ঠেরা। পিছনে পিছনে নামলেন পুত্র সন্দীপ, পুত্রবধূ ললিতা, নির্মাল্য আচার্য, নিমাই ঘোষ, অনিল চৌধুরি প্রমুখ। তথ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই হন্তদন্ত কাজ করছিলেন পুলিশ কমিশনার বীরেন সাহা। যুগ্ম কমিশনার সফি প্রমুখ। বস্তুত প্রশাসন আর মন্ত্রীকে হার মানিয়ে দিয়ে অসংখ্য ফোটোগ্রাফার-সাংবাদিকের জনঅরণ্যে বেসামাল ঘনিষ্ঠ জনেরা সত্যজিৎবাবুর মরদেহ নিয়ে এগিয়ে এলেন বাইরের দরজার দিকে। ম্যাটাডরের ওপর তোলাও হল সত্যজিৎবাবুর শরীর। ধীরে ধীরে লাল সিমেন্টের বাঁধানো


• নন্দন-এ এসে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন

• মার্তিনী আরমেন্ট দুঃসংবাদে হতবাক



• নন্দন-এর পথে শোকাহত পুত্রবধূ ললিতা, সন্দীপ ও নির্মাল্য আচার্য





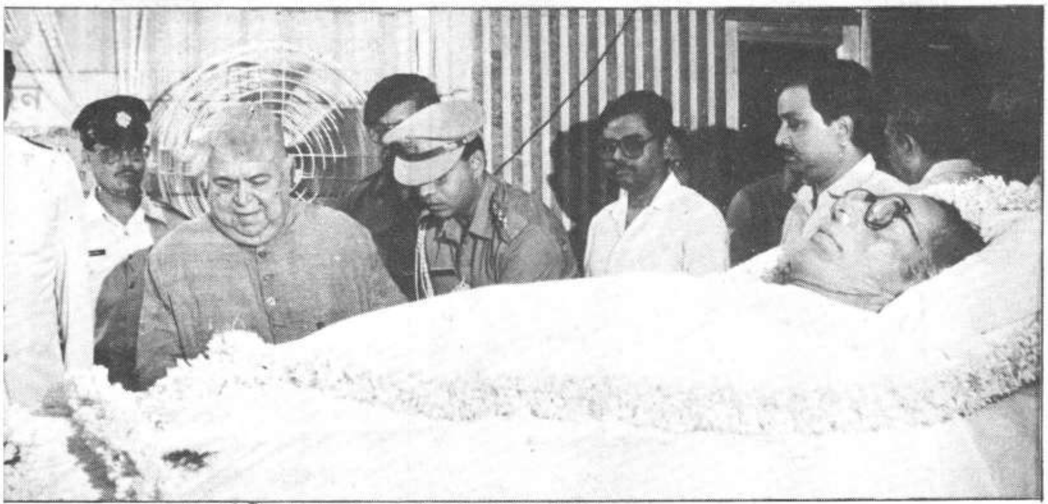
বিজয়াদেবী। অন্যান্যদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সৌমিত্র চ্যাটার্জি, রুমা গুহঠাকুরতাকে

ঢালপথে ম্যাটাডর এগিয়ে চলল নার্সিংহোম ছেড়ে রাস্তার দিকে। প্রায় তিন মাস পর ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের গন্তব্যে। শেষবারের মতো। গৃহকর্তার নিথর শরীর নিয়ে।

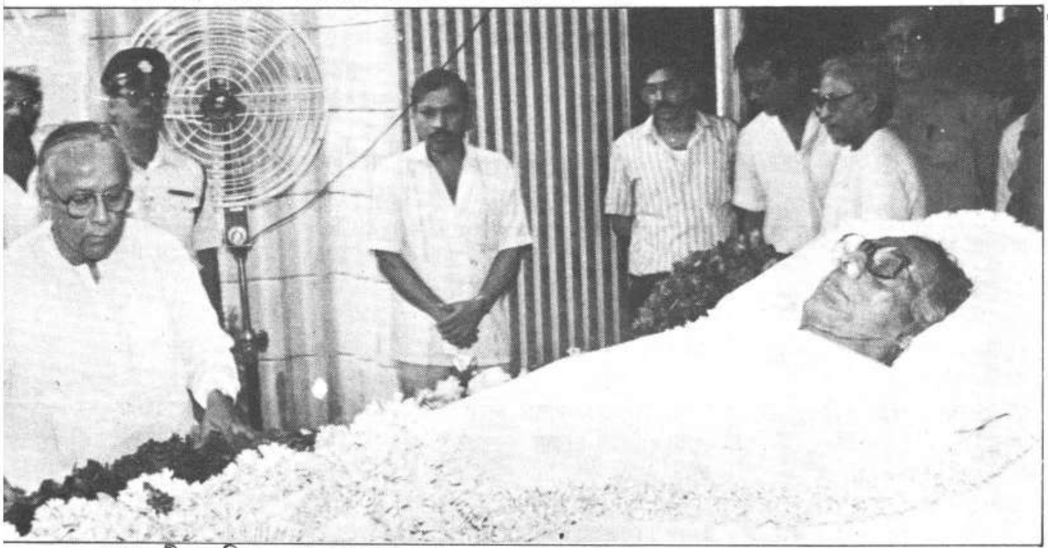
২৪ এপ্রিল, সকাল সাতটা

'কেবল বাড়ি ফিরে আসতে চেয়েছিল... বিজয়া রায়

বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে সত্যজিৎ রায় তাঁর শয়নকক্ষে চিরনিদ্রায় শায়িত। নিজের শয্যায়। পাশাপাশি দুটি খাট। ঘরটি তখন চারদিক থেকে বন্ধ। ঘরের ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার যে দরজাটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রায় পরিবারের নিকট আত্মীয়া রুমা গুহঠাকুরতা। ওই ঘরে সে সময় এক কোণে একটি চেয়ারে বসেছিলেন ডঃ কে বি. বক্সি। পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজন ততক্ষণে মরদেহ নন্দনে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের একে একে ঘরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন রুমাদেবী। দরজা খুলে দরজা আবার বন্ধ করে দিচ্ছিলেন তিনি। বারান্দা থেকে ঘরে এলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরনে সাদা পা-জামা, গায়ে হালকা সবুজ রঙের পাঞ্জাবি। চোখ দু'টি তার জলে ভরা। এসে হাজির হলেন চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন। আলতো করে সৌমিত্র'র ঘাড়ে হাত রেখে দাঁড়ালেন। সামনেই ছিলেন পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মাল্য আচার্য। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন, মরদেহ কীভাবে নন্দনে নিয়ে যাওয়া হবে পরামর্শ করছিলেন। সত্যজিতের শরীরটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। মনে হচ্ছিল, যেমন তিনি রোজ ঘুমিয়ে থাকেন, তেমনি ঘুমিয়ে আছেন। মৃণালবাবু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। চশমাটা খুলে আবার পরে বাইরে চলে এলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর্টারির ভিতরে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে (এমবাস করে) সত্যজিতের মরদেহকে চব্বিশ ঘণ্টা রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই ঠিক সময়ে নন্দনে পৌঁছোবার এবং নন্দন থেকে শেষযাত্রা শুরু করার সবরকম ব্যবস্থা করেছিলেন রাজ্য সরকার। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ফুল দিয়ে ম্যাটাডোর ভ্যানটি সাজানো সম্পন্ন হয়ে যায়। এদিকে বিজয়া রায়, পুত্র সন্দীপ এবং পুত্রবধূ ললিতা তৈরি হয়ে নেন। বাড়ির তিনতলায় বারান্দায় দেখি এক কোণে দাঁড়িয়ে কামু মুখোপাধ্যায় কাঁদছেন। সন্দীপ বারান্দার দিকের দরজাটা খুলে দিলেন। খাট থেকে স্ট্রেচারে নামানো হবে সত্যজিতের মরদেহ, যাতে ক'রে তিনি গত রাতে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। রুমাদেবীর পুত্র অয়ন, আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ, হীরক সেন, ইউনিটের অন্যান্য সদস্যরা অনিল ঘোষ, অনন্ত দাশ, পিতু পাণ্ডা, আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু, নির্মাল্যবাবু প্রমুখ সকলে এসে জড়ো হলেন ঘরে। অন্য দরজা দিয়ে তখন ললিতা প্লেটে টোস্ট এবং এক কাপ চা নিয়ে বিজয়াদেবীর কাছে আসেন। তিনি খেতে চান না। ললিতা বুঝিয়ে বলেন। বিজয়াদেবী তখন চায়ের কাপটা হাতে নেন। তাঁর চোখ দিয়ে গড়াতে থাকে অশ্রুধারা। সন্দীপ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন একপাশে। বাবার দিকে তাকিয়ে। তাঁর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। শোকে পাথর হয়ে যাওয়ার মতো সন্দীপের চেহারা। মনেহচ্ছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বয়স বেড়ে গিয়েছে। মরদেহ নামানো হল স্ট্রেচারে। ব্রাহ্ম সমাজের রীতি অনুযায়ী মরদেহ নিঃশব্দে নিয়ে যেতে হয়। ঠিক সেইভাবে মরদেহ নিয়ে সন্দীপ এবং তাঁর অনুগামীরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন ধীরে ধীরে। ম্যাটাডোরে তোলা হল মরদেহ। বাড়ির বাইরে ভোর ছ'টা থেকে আসতে শুরু করেছেন শোকাহত মানুষেরা। ফোটোগ্রাফাররা লোহার গেটের ওপরে উঠে বসে আছেন। পুলিশ ভিড়কে দু'পাশে সরিয়ে দিল। এবার ম্যাটাডোর ভ্যানটি বের হবে। যাত্রা শুরু করবে নন্দনের পথে। তখনও বিজয়া রায় বসে আছেন তাঁর খাটের পাশে। একা। পাশের খাটটির ওপর থেকে তোষক-জাজিম সব তুলে নেওয়া হয়েছে। একেবারে ন্যাড়া খাট। শূন্য। পরিত্যক্ত। পড়ে আছে ঘরের এক পাশে। অন্য খাটটি থেকে বিচ্ছিন্ন। ডুকরে কেঁদে উঠলেন বিজয়াদেবী। অস্ফুটে তাঁর ভিতর থেকে



● নন্দন : পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাজ্যপাল ডঃ নুরুল হাসান



● মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন



● নন্দন-এ শায়িত প্রয়াত চলচ্চিত্রস্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়

বেরিয়ে এল, শুধু এই কথাটাই, বললেন তিনি রুমার দিকে তাকিয়ে, রুমার বুকে মাথাটা গুঁজে দিয়ে, 'কেবল বাড়িতে ফিরে আসতে চেয়েছিল, ফিরে তো এলও, কিন্তু... ।' তারপর তাঁর কথা হারিয়ে গেল, মিশে গেল কান্নার সঙ্গে !

২৪ এপ্রিল, নন্দনে,সকাল আটটা :

আমার আর কী রইল ! সৌমিত্র

সকাল ছ'টা থেকে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ, মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায়কে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য । নন্দনের প্রবেশ পথের ফাঁকা জায়গাটাতে প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে । দর্শক একে একে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে কীভাবে বাইরে বেরিয়ে যাবেন, তার ব্যবস্থা চমৎকার । অন্য একটি প্রবেশ পথ দিয়ে শিল্পী, লেখক এবং সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজনের প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয় । শান্ত এবং সংযতভাবে সর্বস্তরের মানুষ অপেক্ষা করছিলেন । নন্দন অধিকর্তা প্রবোধ মৈত্র, মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন লবিতে । মরদেহ এসে প্রবেশ করল ঘটনাস্থলে । সাধারণ মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠলেন না । অধৈর্য হয়ে উঠলেন শতাধিক ফোটোগ্রাফার । হৈ-হৈ করে তাঁরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন যেখানে সত্যজিতের মরদেহ রাখা হবে সেই জায়গাটিতে । পাশে প্রেস লাউঞ্জে একে একে এসে বসেন সত্যজিতের ইউনিটের অনিল চৌধুরী, সুজিত সরকার, কামু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । এ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকেন মৃণাল সেন ও গৌতম ঘোষ । বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় ভিড় সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । সুজিত ফোটোগ্রাফারদের সামলাতে

গিয়ে ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে নেমে পড়েন। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, এত ফোটোগ্রাফার এল কোত্থেকে।
ভি আই পি-দের নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করেন বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। ভিতরের লবিতে টেলিভিশন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর কর্মীরা কাজ করে যান। সৌমিত্র কোনও কথা বলতে চান না, তবু তাঁকে প্রায় জোর করে টিভি-ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল সৌমিত্রকে। তিনি ঘুরে ফিরে একটা কথাই বার বার বলতে থাকেন, 'আমার আর কী রইল। আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহারা হলাম।' শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন, 'আমার আর প্রণাম করার কেউ রইল না। দুজন ছিলেন। হেমন্তদা আর মাণিকদা। দুজনেই চলে গেলেন।' অনিল চট্টোপাধ্যায় মাণিকদার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলছিলেন। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল দীপঙ্কর দে'র।

'পথের পাঁচালি'-র 'অপু' সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল 'কিউ'-তে। একটি গাড়িতে করে নন্দনের পিছনের গেটে এসে নামলেন সন্দীপ, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী ও রুমাদেবী। রুমা ধরে ধরে বিজয়াদেবীকে নিয়ে এসে প্রেস লাউঞ্জে বসালেন। ততক্ষণে সেখানে সত্যজিতের ছবির শিল্প নির্দেশক অশোক বসু ছাড়া উৎপল দত্ত এবং শোভা সেন প্রমুখ এসে পড়েছেন। দুজনেই কোনও কথা বললেন না। তারপর একসময় বেরিয়ে চলে গেলেন ভি আই পি-দের বসবার ঘরে—নন্দনের মিটিং রুমে। ফোটোগ্রাফাররা দলে দলে ঢুকে পড়লেন বিজয়াদেবীর ছবি তোলার জন্য। ললিতা সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের থামিয়ে দিলেন। সন্দীপ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে বললেন, 'প্লিজ, ছবি তুলবেন না।' কে কার কথা শোনে? তখন বাধ্য হয়ে রুমা এবং ললিতা বিজয়াদেবীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন ভি আই পি লাউঞ্জে। পৌনে দশটা নাগাদ রাজ্যপাল নুরুল হাসান আসেন। তারপর মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী সহ আরও একাধিক মন্ত্রী আসেন সত্যজিৎকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আসেন দশটার পরে। সত্যজিতের মরদেহ প্রণাম করে তিনিটিভি ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, লিফটের কাছে গিয়েও ফিরে যান। ভি আই পি লাউঞ্জে।

বিজয়াদেবীর সঙ্গে দেখা করেন। সান্ত্বনা দেন। বিজয়াদেবী কোনও কথা বলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। দলে দলে আসতে শুরু করেন টালিগঞ্জের শিল্পী ও কলাকুশলীরা। আসেন শৈলেন দাশগুপ্ত, বিমান বসু, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, প্রদীপ



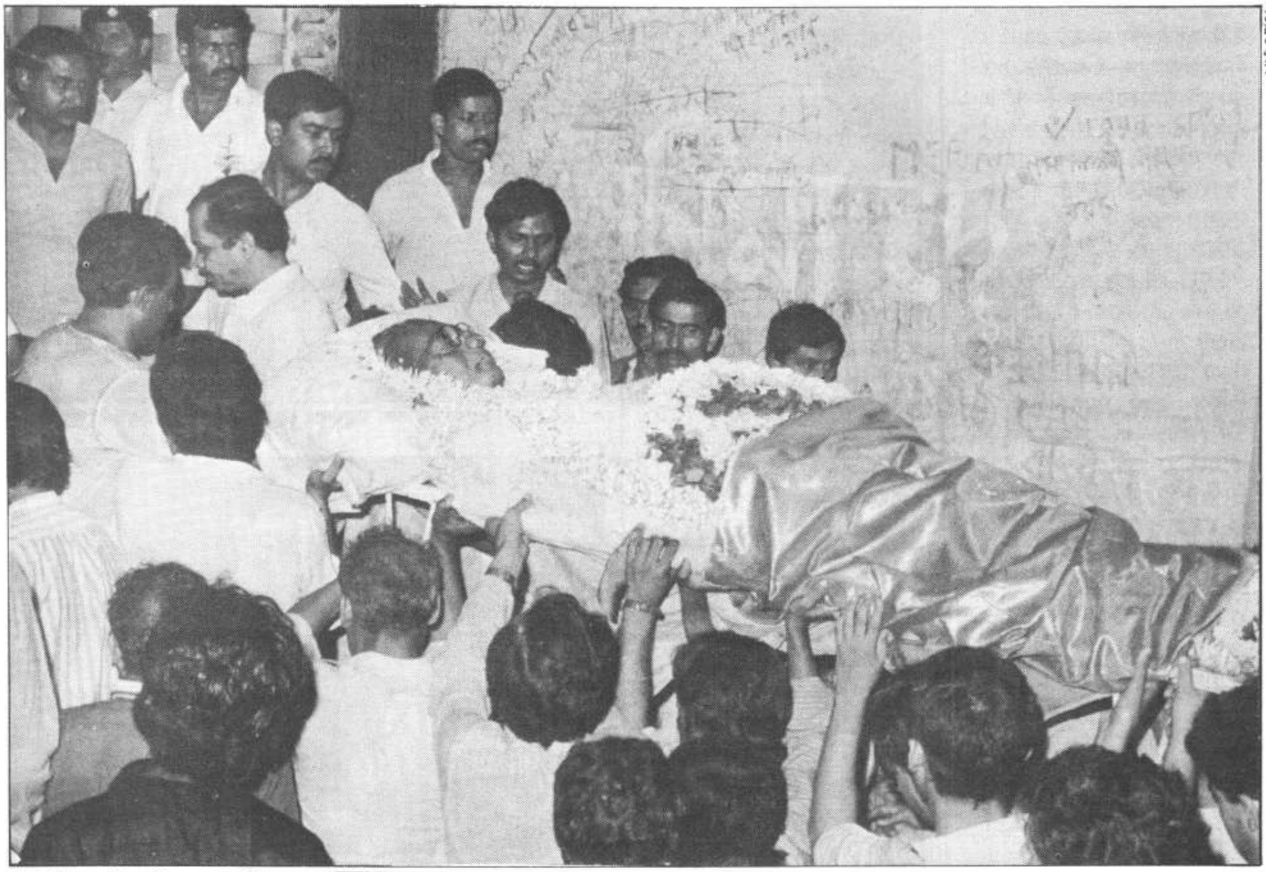
● শেষ প্রণাম জানাতে কণিকা মজুমদার চলেছেন বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে



● বেলভিউ থেকে বিশপ লেফ্রয় রোডের দিকে চলেছেন মাধবী চক্রবর্তী

● কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গান-সেলুট জানাচ্ছেন রাজ্য পুলিশবাহিনী





● বৈদ্যুতিক চুল্লীতে নিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে

ভট্টাচার্য, সৌগত রায় এবং রাজনৈতিক মহলের আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শোকস্তব্ধ সন্ধ্যা রায় টিভি ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন।

দেবশ্রী চুপ করে বসে থাকেন। অপর্ণা সেন, রূপা গাঙ্গুলি, পাপিয়া অধিকারী, ইন্দ্রাণী হালদার, কৌশিক ব্যানার্জী প্রমুখ শেষ দেখা দেখে চলে যান। থেকে যান অনুপ ঘোষাল। এগারোটা নাগাদ সন্দীপ রায় মাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। ওঁদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। একটু দূরে একা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন আরেক পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। গৌতম ঘোষ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন।

২৪ এপ্রিল, নন্দনে বিকাল চারটে :

লক্ষাধিক শোকার্ত মানুষ

নন্দন এবং রবীন্দ্রসদন ঘিরে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সাধারণ মানুষ সাপের মতো আঁকাবাঁকা 'কিউ'-তে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ডি সি সাউথ জয়দেব চক্রবর্তী বললেন, 'এক লক্ষের বেশি মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ৬টার মধ্যে কিভাবে সকলের ঢোকা সম্ভব জানি না।' নন্দন থেকে কেওড়াতলায় সত্যজিৎ রায়কে শেষ দেখা দেখার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো মানুষ এসেছিলেন শহর ও শহরতলী থেকে। তরুণ মজুমদার ভি আই পি গেট দিয়ে ঢুকতে পারছিলেন না। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্যামেরাম্যান পান্তু নাগ। তাঁকে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিলেন এক পুলিশ অফিসার। সময় গড়িয়ে চলে। ভিড় আরও বাড়তে থাকে। বুদ্ধদেববাবু পুলিশ কমিশনার বি. কে. সাহা, সন্দীপ রায়, মৃণাল সেন প্রমুখকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। ততক্ষণে এসে পড়েন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং বলরাম জাখর। ঠিক হয় ঠিক ছ'টায় গেট বন্ধ হবে। তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। তার বেশি সময় মরদেহ রাখা যাবে না। বাড়ি থেকে ভি আই পি লাউঞ্জে আনা হয় বিজয়াদেবীকে। তিনি শশ্মানে যেতে পারবেন না স্বামীকে শেষ দেখা, চোখের দেখা, দেখতে এসেছেন বিজয়া রায়। এর পরেই শুরু হবে শেষ যাত্রা। সন্দীপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিজয়াদেবীকে দু'দিক থেকে ধরে মরদেহ'র সামনে নিয়ে গেলেন ললিতা এবং রুমাদেবী। সত্যজিতের মরদেহের ওপর মাথা রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিজয়াদেবী। টিভির ক্যামেরা সক্রিয়।

স্বামীকে শেষ দেখা, চোখের দেখা দেখতে এসেছেন বিজয়া রায়। এর পরেই শুরু হবে শেষ যাত্রা। সন্দীপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিজয়াদেবীকে দু'দিক থেকে ধরে মরদেহ'র সামনে নিয়ে গেলেন ললিতা এবং রুমাদেবী।



• সত্যজিতের আবাস বিশপ লেফ্রয় রোড থেকে মরদেহ নন্দন-এ নিয়ে যাবার প্রস্তুতি

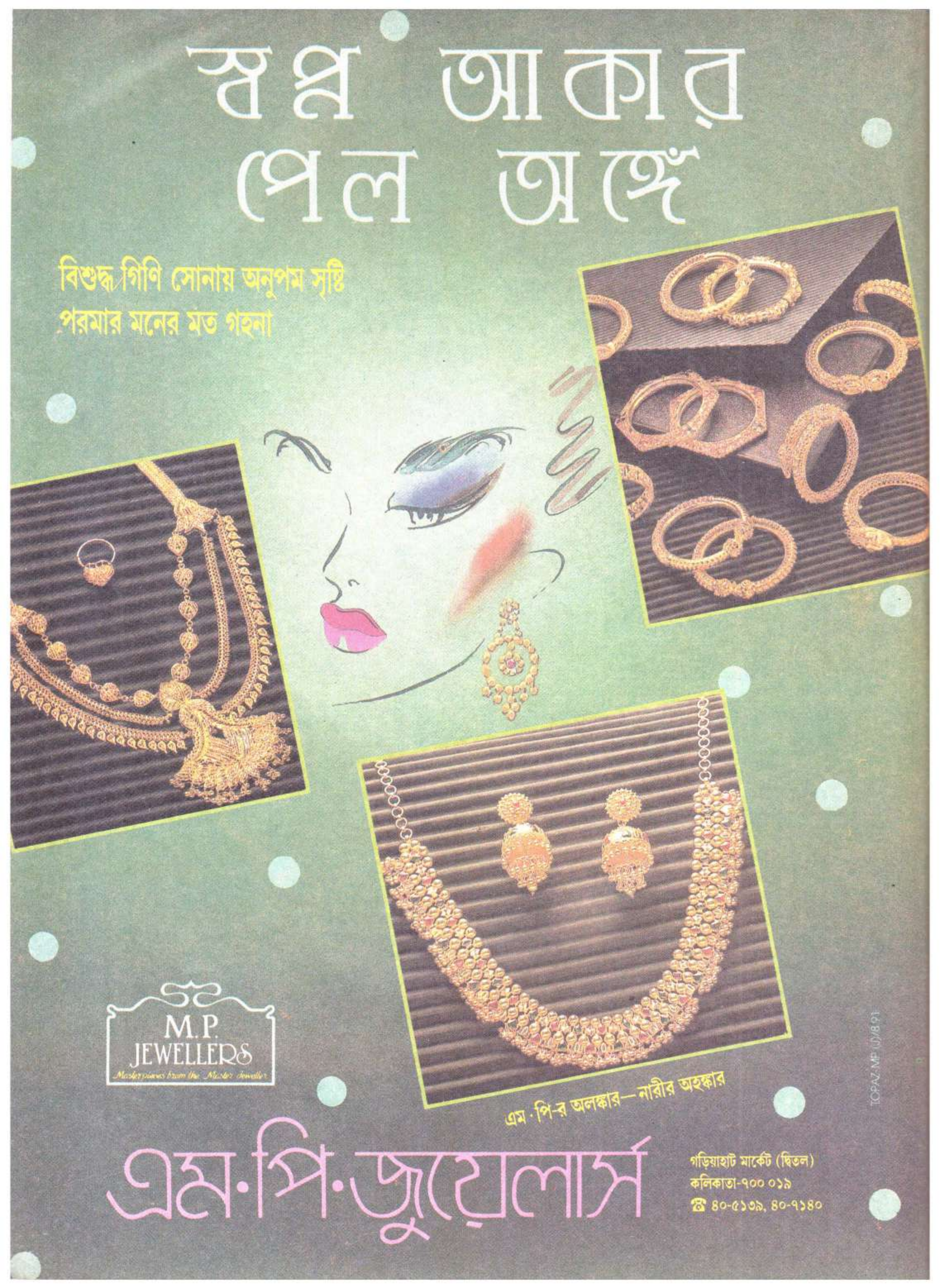
ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ ঘন ঘন জ্বলে উঠছিল।

২৪ এপ্রিল, নন্দন, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা, শেষ যাত্রা :

রাজপথে জনসমুদ্রের নীরব নমস্কার

মরদেহ তোলা হল নতুন করে ফুল দিয়ে সাজানো লরিতে। দীপঙ্কর দে, নিমাই ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দাঁড়ালেন পিছনের দিকে। সামনে পায়ের কাছে বসে পড়লেন গৌতম ঘোষ। ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও অনেকে। প্রথমে পাইলট ভ্যান। তারপর চলল লরি, মরদেহ নিয়ে। তার পরে পুলিশের কনভয়, যে গাড়িতে বসলেন বাড়ির কিছু লোকজন এবং ফিল্মের। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়কেও সেখানে দেখা গেল। ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় দাঁড়িয়ে রইলেন যাত্রা পথের দিকে তাকিয়ে। নন্দনের পিছনের প্রবেশ পথ, রবীন্দ্রসদনের পিছন দিক দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি বের হল। মাঝে দুটি অ্যামব্যাসেডর। একটিতে মন্ত্রী বুদ্ধদেব এবং সৌমিত্র। অন্যটিতে সন্দীপ, ললিতা এবং কয়েকজন। পিছনে একটি অ্যামব্যাসেডর-এ চললেন রঞ্জিৎ মল্লিক এবং আরও কয়েকজন। মরদেহ বাঁক নিয়ে সার্কুলার রোডে পড়তে সময় নিল মিনিট ত্রিশেক। জনসমুদ্র। মরদেহ চলছে। দু'পাশে চলেছে মানুষের স্রোত। 'পথের পাঁচালি' নামে একটি সংস্থার জন্ম হয়েছে। তার প্রধান হলেন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর স্ত্রী রমলাদেবী। সংস্থার সদস্যরা রমলাদেবীর নেতৃত্বে 'পথের পাঁচালি' ফেস্টুন নিয়ে চলেছেন। ওই মিছিলেও সুভাষবাবুকে দেখা গেল। আশুতোষ মুখার্জি রোডের দিকে এগোতে এগোতে ধ্বনি ওঠে, 'সত্যজিৎ রায় অমর রহে।' ডি ওয়াই এফ-এর সদস্যরা স্লোগান দেন, 'সত্যজিৎ রায় লাল সেলাম'। কোথাও শোনা যায়, 'সত্যজিৎ, মহান শিল্পী তুমি, তোমাকে ভুলিনি, ভুলছি না।' মরদেহ এগোতে থাকে ধীরে ধীরে। পাশাপাশি জনস্রোতও এগিয়ে চলে। দু'পাশের বাড়িগুলি থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। পুষ্পস্তবক দেওয়া হয় মরদেহর ওপর। অভিনব কায়দায় সত্যজিতের গলায় মালা এসে পড়ে যদুবাবুর বাজারের সামনে। ওপরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত দড়ি খাটিয়ে মাঝখানে মালাটি ঝুলিয়ে সেটা ঠিক সময়মতো নামিয়ে আনা হয় সত্যজিতের গলায়। হাততালি পড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তে জনতা শান্ত, ধীর পায়ে এগোতে থাকে। শোকস্তব্ধ নির্বাক সকলে। কেবল গাড়ির শব্দ শোনা

মরদেহ এগোতে থাকে ধীরে ধীরে। পাশাপাশি জনস্রোতও এগিয়ে চলে। দু'পাশের বাড়িগুলি থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। পুষ্পস্তবক দেওয়া হয় মরদেহর ওপর।

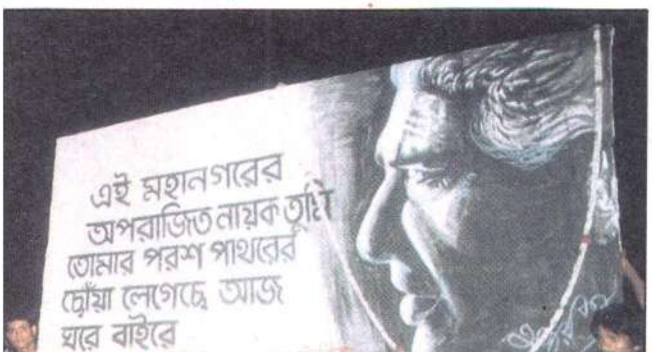


স্বপ্ন আকার
পেল অঙ্গে
বিশুদ্ধ গিণি সোনায় অনুপম সৃষ্টি
পরমার মনের মত গহনা
M.P.
JEWELLERS
Masterpieces from the Master Jeweller
এম·পি-র অলঙ্কার—নারীর অহঙ্কার
এম·পি·জুয়েলার্স
গড়িয়াহাট মার্কেট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
☎ ৪০-৫১৩৯, ৪০-৭১৪০



রাজীব বসু

● শেষযাত্রা : নন্দন থেকে মহাশ্মশানের পথে



রাজীব বসু

● স্রষ্টার ছবির নামগুলিই একদল তরুণের কাছে হয়ে উঠেছে শোকপ্রকাশের ভাষা

যায়। হাজরা মোড়ে জনসমুদ্রের মাঝখানে মরদেহ দাঁড়িয়ে পড়ে। কংগ্রেস আই-এর কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান ফুল দিয়ে। রাসবিহারি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত আসতে রাত ন'টা বেজে যায়। বাঁক নেয় কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। তখনও চারদিকে মানুষ আর মানুষ। যতদূর চোখ যায় ততদূর মানুষ আর মানুষের মাথা।

২৪ এপ্রিল, কেওড়াতলা
রাত ন'টা :

সব শেষ : সন্দীপ

মরদেহ নামানো হল মাটিতে। এগিয়ে এলেন তপেন চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, নিমাই ঘোষ, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, হীরক সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক প্রমুখ। এক পাশে

দাঁড়িয়ে রইলেন রবি ঘোষ। রবিবাবু শিলিগুড়িতে একটি ছবির আউটডোর শুটিং-এ গিয়েছিলেন। গাড়িতে সরাসরি নন্দনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে সোজা শশ্মানে। বাঘার চোখে তখন জল। গুপী এসে তাঁর পিঠে হাত রাখে। গুপীর চোখও ছলছল করে ওঠে। সন্দীপের ডাক পড়ে। এগিয়ে আসেন তিনি। ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টির কোনও ক্রিয়াকর্ম হয় না। তাই এবার মরদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লির দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক তার আগে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সত্যজিৎ রায়কে শেষ অভিবাদন জানাবার পালা। সন্দীপ এসে দাঁড়ালেন মরদেহের সামনে, মাথা নিচু করে। পাশে মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিন তিন বার আকাশের দিকে মুখ করে গর্জে উঠল পুলিশের বন্দুক।

রবি ঘোষকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে সৌমিত্র কেঁদে ফেললেন, নিঃশব্দে। ললিতার চোখে জল। মরদেহ এবার উঠল কয়েকজনের কাঁধে। সামনে সন্দীপ। এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল মরদেহ, স্ট্রেচারে, বৈদ্যুতিক চুল্লীর দিকে।

• শুধু একবার দেখার জন্য নন্দনের সামনে ভিড়



বেজে উঠল বিউগল। প্রতিধ্বনি করে উঠল যেন করুণ কান্নার সুর। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন সেখানে একমাত্র ললিতাদেবী। রবি ঘোষকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে সৌমিত্র কেঁদে ফেললেন, নিঃশব্দে। ললিতার চোখে জল। মরদেহ এবার উঠল কয়েকজনের কাঁধে। সামনে সন্দীপ। এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল মরদেহ, স্ট্রেচারে, বৈদ্যুতিক চুল্লির দিকে। সেখানে ফোটোগ্রাফাররা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চুল্লিতে প্রবেশের ছবি ওঁদের চাই। সন্দীপ আপত্তি জানালেন। বুদ্ধদেববাবু সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। বললেন, 'এটা শোকের মুহূর্ত। দয়া করে আপনারা চেঁচামেচি করবেন না।' হাত জোড় করে এগিয়ে গেলেন তিনি। টিভি-র দল এবং ফোটোগ্রাফাররা সরে গেলেন। মরদেহ নিয়ে বাহকরা কোলাপসিবল গেটের ভিতরে চলে গেলেন। গেট বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে শুধু এটুকুই দেখা গেল, চুল্লির ভিতরে চলে যাচ্ছে মরদেহটি। গোল হয়ে পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন সকলে। সকলেই নতজানু, নির্বাক। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাপসিবল গেটটি খুলল। একে একে সকলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এলেন সন্দীপ। বাইরে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ললিতা। সন্দীপ তাকালেন এদিক-ওদিক। তাঁকে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে তিনি ভেঙে চুরচুর। পাশে এসে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেববাবু। সন্দীপ শুধু এটুকুই বললেন তাঁর দিকে তাকিয়ে। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর। তবু সন্দীপ উচ্চারণ করলেন, 'সব শেষ!'

তপন বকসি
স্বপনকুমার ঘোষ


নানান রঙের ব্যান্ড এলো
বাজাজ ফ্যানের সঙ্গী হল...
bajaj
শেষ পর্যন্ত এসেই গেল এমন এক ফ্যান যা আপনার ঘর ও দেয়ালের রঙের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, বাজাজ ফ্যান।
এর অনন্য বিশেষত্ব হল এটির প্লাস্টিকের রঙিন ব্যাণ্ড – যা ঘরের চার দেয়ালের রঙ ও ঘর সাজানোর মানানসই করে বদলানো যায়, যখন খুশি।
তাহলে বলুন ! এ এক নতুন জিনিষ নয়কি, বাজাজের নতুন ফ্যান ?
বাজাজ স্পেকট্রাম
সি লী ং ফ্যা ন

ANANDALOK (FORTNIGHTLY) 9 MAY 1992
REGD. NO. WB/CC/252 TN/MS(C)710

